

Barcode - 99999990334953
Title - Jatri
Subject - Literature
Author - Thakur, Soumendra Nath
Language - bengali
Pages - 288
Publication Year - 1959
Creator - Fast DLI Downloader
<https://github.com/cancerian0684/dli-downloader>
Barcode EAN.UCC-13

9 999999 033495

যাত্রী

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর



প্রকাশক : শ্রীসুজিৎচন্দ্র দাস
জেনারেল প্রিন্টার্স স্যান্ড পারিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা ৭০০ ০১৩

কার্তিক ১৩৬৬ : নভেম্বর ১৯৫৯

জেনারেল প্রিন্টার্স স্যান্ড পারিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, লেনিন সরণী, কলি-
কাতা ৭০০ ০১৩] শ্রীসুজিৎচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

আমি যে পরিবারে জন্মেছিলুম সেটা আটপোরে পরিবার ছিল না। এই পরিবারের জীবনযাত্রার নিজস্ব একটা সংস্কার ছিল যেটাকে কোনো প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। পূর্ব পশ্চিম নিঃশব্দে অত্যন্ত সহজভাবে মিলে গিয়েছিল আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমার জন্মের এক শতাব্দীরও আগে। প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের কোনো চিন্তা, কোনো অনুভূতিই এই বাড়িতে অপাঙ্ক্তেয় ছিল না। তিলক-কাটা নামাবলী-পরা চিন্তা ছাড়া আর সব বর্জনীয় এই ধরনের উগ্র সংকীর্ণতা এ বাড়ির আবহাওয়াকে যেমন কখনো বিধিয়ে দেয় নি, ঠিক তেমনই সমুদ্রের ওপার থেকে যা-কিছু এসেছে তার মূল্য যাচাই না করে নির্বিচার গ্রহণ, এই মেরুদণ্ডহীন চিন্তার ক্লীবত্ব এ বাড়ির বায়ুমণ্ডলকে কলুষিত করে নি। ভারতবর্ষের বৃহৎ ধারণার সম্বন্ধে যেমন শ্রদ্ধা ছিল, পাশ্চাত্যের বৃহৎ ভাব-সম্ভারের প্রতি তার চেয়ে কম শ্রদ্ধা ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের মালাবদল ঘটে গিয়েছিল জোড়াসাঁকো বাড়ির প্রাঙ্গণে। দ্বারকানাথ ঠাকুর অপরিমিত ধন সঞ্চয় করেছিলেন ধনসঞ্চয়ের মামুলী পন্থা ধরেই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির কাছ থেকে হুনের ইজারা নিয়ে তিনি অগাধ ধনের অধিকারী হন। তারপরে নানান ব্যবসায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় আমরা পাই ইন্সিওরেন্স কম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। ইন্সিওরেন্স কম্পানির কল্পনা ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম করেন। লক্ষ্মীর পদ্মের সোনার পাপড়ি লুট করার নৈপুণ্যের মধ্যেই যদি দ্বারকানাথ ঠাকুরের সব পরিচয় নিঃশেষ হত তা হলে অগ্ন্যধনীর সম্বন্ধেও যেমন সত্যিকারে বলবার কিছু থাকে না তাঁর সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটত। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে ধনসঞ্চয়ের প্রয়াসেই তাঁর জীবনের সব পরিচয় শেষ হয়ে যায় নি।

সমাজের সমস্ত কুসংস্কারের গ্লানি থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করবার কাজে তিনি ছিলেন রামমোহন রায়ের অন্যতম সাথী। সতীদাহের বিরুদ্ধে তিনি রামমোহন রায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। শবচ্ছেদ যখন হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ

ছিল তখন এই কুসংস্কার দূর করবার জন্যে যে হিন্দু শবচ্ছেদ করবে মেডিকেল কলেজে, তাকে অর্থ পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করেন। শিক্ষা-বিস্তারের জন্যে তাঁর অকুণ্ঠিত দানের পরিচয় তখনকার প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে পাওয়া যাবে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে তাঁহার যাতায়াত ছিল। সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে প্রচলিত হিন্দু ধারণা তাঁকে বিচলিত করে নি।

তাঁর যুগের অবসানে যে যুগ শুরু হল, সেই যুগে পারস্য-আরবের ইসলামীয় সংস্কৃতি, ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞান-সম্পদ ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা, এই তিন স্রুগভীর চিন্তাধারার ত্রিবেণী-সঙ্গম হল জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে এই তিন ধারার সমন্বয় আমরা দেখতে পাই। আমি যখন জন্মলাভ করি তখন জোড়াসাঁকো বাড়ির সুর ছিল দেবেন্দ্রনাথের নিজের হাতের বাঁধা সুর। সমস্ত বাড়িটি ঘিরে ছিল এক উদার দীপ্ত প্রশান্তি, তার সুর তখনও নেমে যায় নি। তখন প্রদীপের সলুতেকে উস্কে দিয়ে আলো জালিয়ে রাখবার দরকার ছিল না, প্রদীপের তেল তখনো তলানিতে এসে পৌঁছয় নি।

১৯০১ সালের অক্টোবর মাসে আমার জন্ম। আমার দাদা দিনেন্দ্রনাথের পরে আমি বাড়ির প্রথম ছেলে চার-পাঁচ বোনের পরে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমার নামকরণ করেছিলেন। আমার জীবনের প্রথম স্মৃতি জড়িয়ে আছে বাড়ির তে-তলার ছাদের সঙ্গে। অম্পষ্ট ছায়ার মতো চোখে ভাসছে এক ধব্ধবে মূর্তি, শাদা দাড়ি, বসে আছেন এক বড়ো চৌকিতে, আর মনে পড়ে ছাদের উপর রিক্সয় ঘুরছেন এক বুড়ো, খুব অম্পষ্ট মনে আছে যে মাঝে মাঝে আমিও যেন তাঁর সঙ্গে রিক্সয় ঘুরেছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময় আমার বয়স চার বৎসর। আমার স্মৃতির মঞ্জুষায় তাঁর সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি আর কিছু নেই। বাড়ি তখন লোকজনে ভরা। বৈঠকখানা ঘরে জ্যাঠামশায় দ্বিপেন্দ্রনাথের মজলিস। কত রঙবেরঙের লোক সেখানে আসত। একটি লোককে মনে পড়ে, নাম ছিল বক্সী। কলকাতার কোন্-এক গীর্জের পাদরী ছিল। জ্যাঠামশায় কেমন করে তাকে সংগ্রহ করেছিলেন তা জানি নে। শুনেছিলুম যে একবার গীর্জাতে উপাসনার সময় জ্যাঠামশায় হঠাৎ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। জ্যাঠামশায়কে দেখে বক্সী প্রভু বলে সম্বোধন করে কী জানি বলেছিল। তাতে তার কাজ

যায়। এক থালা লক্ষা খাওয়া, বুনো ওল কাঁচা খাওয়া এই সব ছিল বকসীর খেলা। বৈঠকখানায় প্রসিদ্ধ গায়ক রাধিকা গোস্বামী মশায়, গ্রামসুন্দর মিশ্র প্রভৃতি গায়কদের মজলিস রোজই বসত। তেতলার ঘর যেখানে মহর্ষি থাকতেন সে ঘরে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। একতলার ঘরে আমার পিতা সুধীন্দ্রনাথের বসবার ঘর ছিল। তখনকার কালের যত প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সবাই ছিলেন পিতার বন্ধু। তাঁর ঘরে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, প্রভৃতি বহু সাহিত্যিকদের সমাবেশ হত। ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে আমার পিতা ছিলেন অন্যতম। তাঁর ‘কাশিমের মুর্গা’র মতো অনবদ্য ছোটো গল্প বাংলা সাহিত্যে খুবই কম। গল্প লেখা হলেই তিনি আমাদের ভাইবোনদের পড়ে শোনাতে। এ-বাড়ির ও-বাড়ির সব ছোটো ছেলেমেয়েদের বন্ধু ছিলেন তিনি। অহংকার তাঁর জীবনকে কখনও স্পর্শ করে নি। শাদা কটকি চটি, শাদা চাদর, ধুতি, এই ছিল তাঁর বেশ। কথা ছিল স্নিগ্ধ, সকলের সঙ্গে আচরণ ছিল উদার মাধুর্যে ভরা।

কেউ গরিব বলে তার উপর অন্যায় হবে, অবিচার হবে, এ তিনি কখনও সহ্য করতে পারতেন না। বাড়ির চাকর-দাসীদের উপর আমাদের ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। মনে পড়ে আমার বয়স তখন আট-নয় বৎসর হবে। ঝিল্লু নামে একজন পশ্চিমী লোক বহুকাল থেকে আমাদের বাড়িতে কাজ করত। তার কাজ ছিল সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে লণ্ঠন দিয়ে যাওয়া আর বাবুদের তামাক সেজে দেওয়া। সেকালের দস্তুর-মতো তাকে ঝিল্লু ফরাস বলে ডাকা হত। ঝিল্লুর ছোটো ছেলে ছিল আমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোটো। একদিন দুপুরে দুষ্টমি করে ফেলে দিয়েছিলুম তাকে আমাদের বাগানের ধারের চৌবাচ্চায়। সে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমার পিতার কাছে নালিশ করল, আমাকে এক ঘণ্টা কোণে দাঁড়াতে হল এই দুষ্টমির জন্তে। গরিব বলে তার উপর এই ব্যবহার হয়েছে, পাছে সে এই কথা মনে করে এইজন্তে পিতার সঙ্কোচের অবধি ছিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আমল থেকেই আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে কখনো নকলনবিশী সাহেবিয়ানা ঢুকতে পায় নি। কলকাতার সমাজের উপরের তলার শিক্ষিত পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে তখন

সাহেবিয়ানা আর বিবিয়ানা ঢঙের জোয়ার বইছে। বাঙলা ভাষায় কথা বলা, চিঠি লেখা, বাঙালী বেশভূষা তখন এদের কাছে অচল ছিল। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের এই আত্মমর্যাদাহীন কলুষের ঢেউ আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ির ফটক পার হতে পারে নি। দেবেন্দ্রনাথের এক আত্মীয় তাঁকে ইংরেজীতে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠি তাঁর কাছে ফেরত গিয়েছিল। আমার ছেলেবেলা সেই আবহাওয়াতেই কেটে গেছে। মনে পড়ে তখন আমার বয়েস ছ-সাত হবে, একবার আমার কাকা কৃতীন্দ্রনাথের সঙ্গে ময়দানে বেড়াতে যাই। বাড়ি ফেরবার পথে তিনি হোয়াইটওয়ায়ে লেড্‌ল কম্পানির দোকানে নিয়ে গিয়ে আমাকে কোট প্যান্ট কলার টাই পরিয়ে বাড়ি নিয়ে আসেন। আমি তো মহা খুসি, দৌড়ে গেলুম পিতার কাছে নতুন সাজ দেখাবার জন্যে। তিনি আমার গলা থেকে কলার টাই খুলে ফেলে দিলেন, বললেন—কখনো এ-সব পরবে না। তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, কান্নাকাটি বাদ পড়ে নি সেদিন, কিন্তু সেই আমার জীবনের প্রথম আর শেষ সাহেব সাজ। বাড়িতে আসতেন বৃদ্ধ জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মশাই দালানে প্রাত্যহিক উপাসনার জন্য। পিতার আদেশে রোজ সকালে আমাকে ব্রাহ্মধর্ম আর মহাত্মারত পড়তে হত তাঁর কাছে।

খুব শিশু বয়েস থেকে আমি গান গাইতে পারতুম। আমার মা ভালো গাইতে পারতেন, পিতার গানের গলা ছিল না, কিন্তু খুব স্বরবোধ ছিল আর তাঁর বাজনার হাত ছিল খুব মিষ্টি। বাড়িতে থিয়েটারের সময় গানের সঙ্গে তিনিই বাজাতেন অর্গান কিন্না পিয়ানো। বাড়িতে তখন গানের জোয়ার বইত ভিতরে বাইরে। আমার দাদা দিনেন্দ্রনাথ আর দিদি রমা দুজনেই খুব ভালো গাইতেন। আমি যে কবে গান জানতুম না, বাজাতে জানতুম না সেটা আমার মনে নেই। এক-এক দিন ভোর বেলা ঘুম ভেঙে খাটে উঠে বসতেই মা আমাকে এ-ব্রহ্মসঙ্গীত ও-ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে বলতেন। মশারির মধ্যে বসেই আমাকে গাইতে হত। খুব ছোটোবেলাকার গানের মধ্যে ‘তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে’, ‘অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি’, ‘করো তাঁর নাম গান’, গানগুলি আজো কানে বাজছে।

রাধিকা গোস্বামী মশায় আমার দিদি রমাকে গান শেখাতেন। আমার বয়েস তখন পাঁচ বৎসর হবে। আমি শুনে শুনে গান শিখতুম। তার

কিছুদিন পরে ওস্তাদ শ্যামসুন্দর মিশ্রের কাছে গান শিখতুম আমি আর আমার দিদি।

আমার বয়েস তখন পাঁচ বৎসর হবে, মনে পড়ে বাড়ির উঠোন ভরে গেছে লোকে, আমার দাদা দিনেন্দ্রনাথ মাথায় গেরুয়া পাগড়ী, গায়ে আলখাল্লা, আমাকে তাঁর কাঁধে বসিয়ে তাঁদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গান ধরেছেন—‘সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’, ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’। আমি তাঁর কাঁধের উপর বসে গাইতুম তাঁদের সঙ্গে। স্বদেশী যুগের যে স্মৃতি মনে আছে তার মধ্যে এই গানের স্মৃতিই জ্বল্জ্বলে হয়ে আছে। রাথীবন্ধনের দিনে চিড়ে দইয়ের ফলাব খেতুম আমরা। রাথীবন্ধনের কথায় মনে পড়ে গেল যে ১৯১০ সালে গিরিডিতে থাকবার সময় আমি আর আমাবই সমবয়সী আরো দু-তিন জন মিলে আমরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হাতে বাথী বাঁধতে গিয়েছিলুম। এক মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক তখন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আমরা বাথী বেঁধে বিদেয় হলাম। দিশি কাপড় পরা, দিশি জিনিস ব্যবহার করা, এটা আমাদের বাড়ির বহুদিনের রেওয়াজ। স্বদেশী যুগের অনেক আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ববীন্দ্রনাথ আর আমার এক কাকা বলেদ্রনাথ দিশি জিনিস তৈরী করবার জন্তে অনেকবার চেষ্টা করেছেন। আর্থিক ক্ষতির বোঝা তো তাঁদের বহন করতে হয়েছিলই, দেশের লোকের অবজ্ঞা ও উপহাস সে ক্ষতির বোঝাকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। আমাদের একটা গ্রামোফোন ছিল সেটাকেও বিক্রি করে তার টাকা দিয়ে দেওয়া হল স্বদেশী ফণ্ডে। আমার এক মামা চলে গেলেন আহমেদাবাদে কাপড়ের কলে কাজ শেখবার জন্তে। আমি তখন নেহাৎ শিশু, তবুও শিশুর সব-দেখা সব-ছোঁওয়া মন দিয়ে আমি বাড়ির আবহাওয়া থেকে স্বদেশী যুগের বিদ্যুৎবহির স্পর্শ নিয়েছি। আমাদের পরিবারের সঙ্গে কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। প্রায়ই মায়ের সঙ্গে আমরা কলেজ স্কোয়ারে তাঁদের বাড়িতে যেতুম। সেইখানেই অরবিন্দকে আমি প্রথম দেখি। টেবিলের সামনে চোঁকিতে তিনি বসে ছিলেন, গায়ে কালো কোট। আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতে বললেন, একটা গান গাও তো। আমি গান শোনালুম। আর আমার কিছু মনে নেই। সঞ্জীবনী আপিসেই আমি তাঁকে দু-চারবার দেখেছি। তার পরে আর

একবার মাত্র আমি অরবিন্দকে দেখি, সে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। বিপিন পাল আর অরবিন্দ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমার বয়েস তখন ছ-সাত হবে। বড়োরা বলাবলি করছিলেন যে বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ এসেছেন। তাঁদের আসবার মানে বোঝবার বয়েস তখন আমার হয় নি। মা'র মুখে এঁদের নাম প্রায়ই শুনতেম, তাই বালকের কৌতুহল ছিল এঁদের দেখবার জন্তে। ফটকের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগলুম এঁদের দেখবার জন্তে। সন্দের সময় এরা এসেছিলেন, ফটকের পাশে একতলার উত্তরের ঘরে এঁদের কথাবার্তা চলছিল। রবীন্দ্রনাথ এঁদের নিয়ে যখন বের হয়ে এলেন তখন দেখলুম।

আমাদের বাড়িতে বিলিতি কাঁচের বাসন তখন ভেঙে ফেলা হল। দিশি মুন, দিশি কাপড়, দিশি কাঁয়চি, ছুরি—নানা রকম দিশি জিনিস আমাদের বাড়িতে এসে ঢুকল। মা রোজ খবরের কাগজ পড়তেন, তাঁর মুখ থেকে শুনতুম স্বদেশী আন্দোলনের কথা। মনে পড়ে একদিন সন্কেবেলা আমাদের ঘরের সামনে দক্ষিণের বারাণ্ডায় বসে আছি মা'র সঙ্গে, দূর থেকে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি আসছে। মা বললেন, বিপিন পাল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, তাঁকে নিয়ে শোভাযাত্রা হচ্ছে। কানাই, বারীন, সত্যেন এঁদের কথা মা'র কাছে থেকেই শুনতুম। কানাই, ক্ষুদিরাম আর সত্যেনের ফাঁসীর খবর বের হলে আমাদের অরন্ধন হল ঘরে। বাড়িতে কিছুদিনের মতো অন্য সব গান যেন তলিয়ে গেল। 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'সোনার বাংলা', 'সার্থক জনম আমার', 'ও আমার দেশের মাটি', 'হে ভারত আজি তোমার সভায়', 'বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি', 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে', 'আপনি অবশ হলি', এ-সব গান আমাদের ভাই-বোনদের মুখে মুখে ফিরত। মাও এ-সব গান গাইতেন, আমি তাঁর মুখ থেকে শুনে শিখেছি, শিখব বলে তোড়জোড় করে গান শেখার দুঃখ আমার প্রায় কখনোই পেতে হয় নি। দু-একবার শুনলেই সুর বসে যেত মনে, সে সুর আজ যখন গানের সঙ্গে আড়ি হয়ে গেছে তখনও ভুলি নি। এরি সঙ্গে মনে আছে আরও দুটি গান, আমি আর আমার দিদি রমা খুব গাইতুম; 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে

নে রে ভাই’, আর অন্যটির দু-এক লাইন মনে আছে ; ‘সুদিরাম গেলো হাসিতে হাসিতে ফাঁসিতে করিয়া জীবন শেষ’ ।

এমনি করে সেই স্বদেশী যুগের আবহাওয়ায় আর আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ির একটি বিশেষ ভাবধারার পরিবেষ্টনীর মধ্যে আমার জীবন তার প্রাণরস টেনে নিয়েছিল । একান্ত সহজভাবে দেশের উপর টান আমার সমস্ত হৃদয়বেগকে অনুরঞ্জিত করেছিল, সেটা উপর থেকে আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় নি । বাড়ির আলো-বাতাসে আমার জীবন অত্যন্ত সহজ ভাবে দেশকে ভালোবাসতে শিখেছিল । যখনই খবরের কাগজে খবর বের হতো যে কোথাও বোমা পড়েছে, মনটা খুসি হয়ে উঠত । ইংরেজ-বিশেষ মনে থিতুয়ে বসেছে তখন, ইংরেজ দেখলেই মনটা বিধিয়ে উঠত । ন-দশ বয়সের একটি ঘটনা মনে পড়ে । আমার মাস্টারমশায়ের সঙ্গে চোরঙ্গী দিয়ে বেড়াতে যাচ্ছি । এক ইংরেজ আসছিল, ইচ্ছে করে তার গায়ে ধাক্কা দিলুম । সে হাতের ছড়ি তুলে আমাকে মারতে এল । মাস্টারমশায় তার কাছে কী বললেন ইংরেজীতে বুঝলুম না, বুঝলুম এইটুকু যে ক্ষমা চেয়ে আমাকে মারের হাত থেকে বাঁচালেন । এই অত্যন্ত ছেলেমানুষি ঘটনার উল্লেখ করলুম শুধু এইজন্যে যে আমার ন-দশ বয়সের মনের ধারণাটা কোন দিকে বইছিল তারি আভাস এর থেকে পাওয়া যায় ।

আমাদের বাড়িতে বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল এগারোই মাঘের উৎসব, ৬ই মাঘ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী, ৭ই পৌষ মহর্ষির দীক্ষা গ্রহণের দিন সকালে দালানে উপাসনা আর ১লা বৈশাখের সকালে উপাসনা আর কাঙালী বিদায় । এগারোই মাঘটাই ছিল বাড়ির প্রধান উৎসব । পৌষের শেষাশেষি গানের আসর বসত । তখন ওস্তাদদের দিয়ে গান গাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল । গানের আসর বসতো বৈঠকখানা ঘরে । রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে এসে বসতেন । আমি সঙ্গে থেকে সেই যে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসতুম, গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠতুম না । একবার এগারোই মাঘে আমি অনেকগুলো গান গাইলুম । সে বৎসরের গানগুলোর মধ্যে ছিলো ‘এক মনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা’, আর ‘তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা’ । রবীন্দ্রনাথ আর আমি দুজনে ‘তুমি যত ভার দিয়েছ’ এই কীর্তনটি গাই ।

তখন আমার বয়স সাত-আট বছর হবে। সেবার মাঘোৎসবের গানের ধারা বেয়ে একজন এসে পৌঁছলেন আমার বাল্যজীবনের ঘাটে। মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ আর আমি গান গাইবার কয়েক দিন পরে আমার পিতার কাছে একটি চিঠি এল। পত্রলেখক জানান যে তিনি আমার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন, দেখা করতে আসতে চান। একদিন সন্ধ্যাবেলা এক ভদ্রলোক এলেন, শুনলুম তাঁর নাম নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, কলকাতায় শিক্ষকতা করছেন, বাড়ি তাঁর বহরমপুরে। সেই সন্ধ্যার আলাপ থেকে এমন একটি আত্মীয়তার সৃষ্টি হল যা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। একতলার দক্ষিণের ঘরে তক্তাপোষের উপর ঢালা ফরাসে আমাদের আসর জমত। ঝড়ই হোক আর আমাদের জোড়াসাঁকোর গলি পুকুরই হোক, রোজ সন্ধ্যাবেলা নলিনীবাবু এসে হাজির হতেন। আমার বাল্যের হেফাজৎকরণেওয়ালা রামলাল বেহারা বরাদ্দ চা আর কাটলেট এনে হাজির করত নলিনীবাবুর জন্যে। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে কপালের উপরের একটি চুলের গুচ্ছ অনবরত দুটি আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতেন তিনি। কিছুক্ষণ পড়বার পরেই খেলবার জন্য আবদার ধরতুম। বই খাতা ফেলে দিয়ে তাঁকে টেনে নিয়ে যেতুম বারাণ্ডায়, চোর চোর খেলতুম তাঁর সঙ্গে। গরমের ছুটিতে যখন তিনি বহরমপুরে যেতেন তখন সেখান থেকে তাড়া তাড়া গল্প লিখে পাঠাতেন আমাকে। তিনি ছিলেন বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের বন্ধু। পকেটে ভরা থাকত নানা খামে নানা দেশের ডাক টিকিট আর জলছবি। আমার ভাইরা, ভাগ্নেরা সবাই তাঁর দাক্ষিণ্য লাভ করত। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ— ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী এই ভাষাগুলিতে তিনি এম. এ. পাস করেন। এম. এ. পাস করা তাঁর নেশার মধ্যে ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইংরিজীর অধ্যাপনা করতেন। গত মহাযুদ্ধের সময় আমি যখন ফতেগড় জেলে আটক তখন পেলুম তাঁর মৃত্যুর খবর। এগারোই মাঘের ক’দিন আগে থেকেই আমাদের ভাইবোনেদের উৎসাহের আর অন্ত থাকত না। বাড়ি চুনকাম হচ্ছে তাই দেখছি হাঁ করে দাঁড়িয়ে। মহর্ষির আমলের বুড়ো সদামালীর উপর ভার ছিল উঠোন সাজাবার। দশই মাঘ বিকেল থেকে সদামালী অন্ত মালীদের নিয়ে লেগে পড়ত সাজানোর তোড়জোড় করতে।

আমরা তার পিছনে পিছনে ঘুরতুম। মাঝে মাঝে তার কাছে ধমকও যে
 থেতুম না তা নয়। তখন ইলেকট্রিক আলোর দিন আসে নি। উঠোনে
 গ্যাসের আলো জ্বলত আর দোতলার বারাণ্ডা থেকে ঝাড়ের লণ্ঠন ঝুলত
 প্রত্যেক খিলেনের মধ্যে মধ্যে। বুড়ো শ্রামবাবু কনট্রাক্টর তাঁর আধমরা
 ছোট্ট একটি ঘোড়ায় টানা টম্‌টমে চড়ে আসতেন গ্যাসের লাইন ঠিক আছে
 কিনা দেখবার জন্য। চেহারটা বেশ মনে পড়ছে। বুক থেকে ভুঁড়ি
 নেমে গেছে, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, পাকার ভাগই বেশি, গৌফজোড়া
 বেশ নজরে পড়বার মতো, ভারী গলার আওয়াজ। মহর্ষির আমল থেকেই
 তিনি নিযুক্ত ছিলেন এই কাজে। দালানের পেছনে গোলাবাড়িতে থাকত
 বুড়ো কুঞ্জ, সে পঞ্চাশ বছরেরও উপর আমাদের বাড়িতে কাজ করেছে।
 তার কাজ ছিল এগারোই মাঘের উৎসবের দিনে মেঠাই তৈরী করা।
 মহর্ষির আমলে মেঠাই তৈরী হত এক-একটা ফুটবলের মতো। এগারোই
 মাঘ রাত্রে ঘারা আসতেন সকলকে পাত পেড়ে থাওয়ানো হত। আমাদের
 সময় পাত পেড়ে থাওয়ানো উঠে গিয়েছিল, সকলকে মিষ্টি ও অন্যান্য খাবার
 থাওয়ানো হত। দশই থেকে কুঞ্জ মেঠাই তৈরী করতে শুরু করত গোলা-
 বাড়িতে আর আমরা লেগে থাকতুম তার পিছনে। সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে
 থাকতুম কুঞ্জর দিকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে থাকবার পর একটা
 মেঠাই দিয়ে ভাগিয়ে দিত আমাদের। দশই মাঘ রাত্তিরে আর ঘুমই
 হত না ভালো করে। অন্ধকার থাকতে থাকতে কোন্‌ ভোর থেকে সানাই
 বাজতে শুরু করত এগারোই মাঘ সকালে। সকালের উপাসনা হত আদি
 ব্রাহ্মসমাজে, আমরা দারোয়ানের সঙ্গে যেতুম, মা'রা পাঙ্কী করে যেতেন।
 দুপুরেই উঠোনে সামিয়ানা খাটানো হয়ে যেত, দালানে আর উঠোনে চৌকি
 সাজানো শুরু হত আর আমরা চৌকির মধ্যে দিয়ে দৌড়ে বেড়াতুম।
 এগারোই মাঘের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে লালবিহারী বড়াল মহাশয়ের
 কথা। এগারোই মাঘ সকালেই তিনি এসে উপস্থিত হতেন চুচড়া থেকে,
 হাতে কার্পেটের ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে থেকে গোলাপ ফুল বের করে
 প্রত্যেকের হাতে দিতেন। আমরা ছোট্টের দলও তাঁর দাক্ষিণ্য থেকে
 বাদ পড়তুম না। সন্ধ্যা ছটার সময় উৎসব শুরু হত কিন্তু পাঁচটা থেকেই
 শুরু হত লোক আসতে। এগারোই মাঘের উৎসবে যোগ দেবার জন্তে

তখন অসম্ভব ঔৎসুক্য ছিল সাধারণের মধ্যে। হাজারেরও বেশি লোক জমা হত। উঠোনে দালানে দোতলার বারাণ্ডায় লোক ধরত না, দেউড়ির ভিতরেও চলা যেত না লোকের ভীড়ে। রবীন্দ্রনাথ আচার্যের আসন গ্রহণ করতেন। আগে আমার পিতামহ দ্বিজেন্দ্রনাথ আচার্যের আসন গ্রহণ করতেন, আমার আবছায়া মনে আছে একবার এগারোই মাসের উৎসবে আমি যেন তাঁকে দেখেছিলুম আচার্যের আসনে।

উৎসব ভেঙে যেত, আমাদের উৎসব কিন্তু তখনও শেষ হতো না। ঝাড় লঠন থেকে মোমবাতি সংগ্রহ করা আর উঠোন থেকে ফুল আর পেরেক যোগাড় করা এই ছিল আমাদের খেলা। যতক্ষণ না শোবার ডাক পড়ত আমরা উঠোনেই ঘোরাফেরা করতুম।

বাড়ির দক্ষিণে বাগান ও ছাদ— এই ছিল আমার রাজত্বের এলাকা। বাগানের পশ্চিম দিকে ছিল বিরাট শিশু গাছ, পূর্বের পাঁচিলের কোণে লটুকান গাছ আর দক্ষিণে রেলিংয়ের ধারে কনক টাপার গাছ। তা ছাড়া নানা ফুলের গাছে বাগান ছিল ভরা। ম্যাগ্নোলিয়ার গাছ ছিল অনেক, ম্যাগ্নোলিয়া ফুলের উপর আমাদের খুব লোভ ছিল, কুঁড়ি ধরেছে কিনা দেখতুম আর তার পর সদামালীর আর ঈশ্বরমালীর কাছে অনেক অনুনয় বিনয় করে ফুল যোগাড় করতুম। দুপুর বেলাটাই ছিল আমার বাগানে বেড়াবার সময়। মা খাওয়াদাওয়া সেরে দক্ষিণের ঘরে শুয়ে বই পড়তেন, পিতা তাঁর একতলার দক্ষিণের ঘরে কোঁচে শুয়ে ঘুমতেন। আমি পিতার ঘরের সামনের বারাণ্ডা দিয়ে একদৌড়ে চলে যাবার সময় দেখে নিতুম তাঁর দুটি পা কোঁচের গায়ে তুলে তিনি ঘুমচ্ছেন কিনা! তার পরে আমায় পায় কে! শিশু গাছের তলায় বড়ো বড়ো পাতাওয়ালা কি একটা গাছ ছিল, সেই গাছের পাতা জুড়ে টুনটুনি পাখি বাসা বাঁধত, আমি সেই পাতার দরজা ফাঁক করে বাসার মধ্যে ঊকিঝুকি মারতুম। টুনটুনি পাখিগুলো আপত্তি জানিয়ে গুগুগোল শুরু করত কাছের ঝোপ থেকে, বাচ্চাগুলো দু-একবার মাথা তুলে আবার এলিয়ে পড়ত। কতবার যে ঘুরেফিরে টুনটুনি পাখির বাসায় ঊকি মারতুম তা বলা যায় না। বাগানের ভিতরটা ঝলমল করত রোদে, গাছ থেকে গাছে উড়ে যেতো ফড়িং আর প্রজাপতি। বাগানের দক্ষিণে মদন চাটুয্যের গলি দিয়ে কাঁসারি ঢং ঢং

করে কাঁসা বাজিয়ে ফিরত, চুড়িওয়ালা ‘চুড়ি চাই’ হেঁকে চলত। ও-বাড়ির বাগানে পাঁচিলের ধারে নারকেল গাছগুলোর মাথায় বসে চিলের দল তাদের কড়া ডাকের ছুরি দিয়ে দুপুরের রোদটাকে যেন চিরে ফেলত দু’টুকুরো করে। বাগানটা আর বাগানই থাকত না আমার কাছে। তার পাঁচিল রেলিং কোথায় যেন সব মিলিয়ে যেত। সমস্ত বাগানটা হয়ে উঠত যেন রূপকথার তেপান্তরের মাঠ। সেই মাঠ দিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে চলত মন কত নদনদী পার হয়ে ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমীর দেশে। বিশেষ করে যে কিছু ভাবতুম তা নয়, সমস্ত শরীর-মনকে কে যেন বেঁধে দিত রূপকথার সুরের পর্দায়। আজও সেই বাগানের কথা যখনই মনে পড়ে তখনই দুপুরের রোদের রঙে আঁকা একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। লটকান্ গাছের ফলগুলো পেকে উঠলেই ধূম পড়ে যেত আমাদের কাপড় রঙাবার, হাতের তেলো লটকানের রঙে রঙিন থাকত এই সময়ে। আজও আমার লটকানের উপর পক্ষপাতিত্ব যায় নি, ওর গন্ধ আর রঙ একটা বিশেষ টানে মনকে টানে।

দেউড়িতে বসে বুড়ো তুলসীরাম দরোয়ান রয়েল রীডার নম্বর ফোর পড়ে যেত। আমার বাবা কাকারা যখন ইস্কুলে পড়তেন তখন থেকে তুলসীরাম রয়েল রীডার পড়া শুরু করছিল, আমি যখন স্কুলে পড়ি তখনও তার রয়েল রীডার পড়া শেষ হয় নি। ফুরসৎ পেলেই সে বসত রয়েল রীডার নিয়ে আর খোকাবাবুকে দেখলেই ধরে বসত সে মানে বুঝিয়ে নেবার জন্তে। তার মাথায় একটু ছিট ছিল, আমরা তাকে ক্ষেপিয়ে অস্থির করতুম। হুশালাল দরোয়ান, সেও পুরণো লোক, দুপুর বেলা দেউড়ির রোয়াকে শুয়ে ঘুমতো। লম্বা, রোগা লোক ছিল হুশালাল, গলায় সোনার কণ্ঠী, মাথায় পাগড়ি, লাল আর হলদেতে মেশানো হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো উর্দি গায়ে। তার কথা বলবার একটা বিশেষ ঢঙ ছিল। ডান কানের উপর ডান হাতটা বেঁকিয়ে রেখে ‘জি হজুর’ বলে সে বেকে দাঁড়াত। সেই আগেকার কালের আদব-কায়দার রেশ থেকে গিয়েছিল তার মধ্যে।

দোলের দিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দরোয়ানদের হোলির গানের আসর বসত ফটকে। কত বাড়ির কত দরোয়ান এসে সেই আসরে

জুটত। সকাল থেকে সিদ্ধির সরবৎ তৈরি হতো দেউড়িতে চিটে গুড় দিয়ে, বড়ো বড়ো বালুতিতে থাকত ভরা, যে আসত সেই আধ ঘটি এক ঘটি খেতো। হুগলাল খালায় আবীর নিয়ে ঘরে ঘরে দিয়ে যেত আর পেত হোলির বক্শিশ্।

আমরাও দোল খেলতুম প্রতি বৎসর। ও-বাড়ির বাগানে লতা-ঢাকা চায়ের ঘরে বসত আমাদের ছেলেদের আড্ডা। আমাদের বন্ধুরা এসে জুটত, গাইতুম আমি হোলির গান আর আমার জাঠতুতো ভাই নবেদ্র নাচত। বাড়ির মধ্যে মেয়েরাও দোল খেলতেন। একবার মনে আছে আমার মেজদিদিমা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী, ১৯নং স্টোর রোডের বাড়িতে দোল খেলবার নেমস্তন্ন করেছিলেন সকলকে। সেবার তিন পুরুষের দোলখেলা হয়েছিল ১৯নং স্টোর রোডের বাড়ির বিরাট বাগানে। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ, নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মেজদিদিমা জ্ঞানদানন্দিনী—এঁদের দল, তারপরে বাবা, কাকা, মা, কাকীদের দল আর আমাদের ভাইবোনদের দল। কোথায় গেল সেই ১৯ নম্বরে বাড়ি, পুকুর আর সেই বাঁধানো বকুলতলা! আজ ধনী মারোয়াড়ীর কবলে সেই বাড়ি শেয়ার বাজারের রুচির পেষণে আর্তনাদ করছে!

একতলার দক্ষিণের যে ঘরে বসতেন আমার পিতা সেই ঘরে থাকতেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ষষ্ঠ পুত্র সোমেন্দ্রনাথ, আমাদের সোমদাদা। পুরনো কত গান যে গাইতেন তার অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতার বই ‘বনফুল’ তিনিই ছাপান। রবীন্দ্রনাথের বালোর লেখা অপ্রকাশিত দু-তিনটি কবিতা তাঁর মুখেই শুনেছিলুম। তখন লিখে নেওয়ার কথা মনে হয় নি, তাঁর সঙ্গেই সে কবিতাগুলো লোপ পেয়েছে। আমি ছিলাম তাঁর আদরের নাতি। ঘরের একধারে তাঁর খাট থাকত, প্রায়ই শুয়ে থাকতেন। মাথায় মাখতেন ফুলন তেল, বালিশে সেই মিঠে তেলের গন্ধে পিপড়ে জুটত। আমিও তার পাশে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে তাঁর গল্প শুনতুম। তাঁর গায়ের রঙ ছিল চাঁপা ফুলের মতো, হাতের তেলোয় যেন ডালিম ফুলের রঙ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বহুপূর্বে তিনি হাসির গান রচনা করেন। দু-একটি গানের লাইন কিছু কিছু এখনো মনে আছে। একটি ছিল :

ব্রাদার হে তোমার
যদি উড়তে ইচ্ছে হয় একবার
তবে রঞ্জিকা গঞ্জিকা দিয়ে
তার সঙ্গে ভাঙ মিশায়ে
টেনো একবার, ব্রাদার ছেড়ো একবার ।

আর একটা গান গাইতেন :

ওহে বিধু ভট্ট
রেগো না চট্ট,
তোমার একি ব্যবহার !

এই বিধু ভট্টাচার্য্যটি যে কে তা আমার জানা নেই ।

সন্ধ্যাবেলা তাঁর ঘরের আর এক কোণে তন্ত্রপোষের উপর মোমের বাতি জেলে আমি পড়তুম । আমার পিতা মোমের বাতির আলো ছাড়া অন্য কোনো আলোতে পড়তে দিতেন না । তাঁর ধারণা ছিল অন্য আলোতে পড়লে চোখ খারাপ হয় । সব ঘরে ঘরে সোমদাদার যাওয়া ছিল, বউরা, নাতি নাতনী, নাতবউরা যে যখন ধরত তখনই তিনি গান শোনাতে । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের গানগুলি, রবীন্দ্রনাথের গান, নিধুবাবুর টপ্পা তাঁর বহু জানা ছিল । ১৯২০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়, জোড়াসাঁকোর বাড়ির একতলার সেই দক্ষিণের ঘরের ঝরণাতলা শুকিয়ে গেল ।

মনে পড়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বড়ো মেয়ে আমাদের বড়দিদি সোদামিনীর কথা । ছোট্ট মানুষটি ছিলেন, একেবারে সাদা পাথরের মতো রঙ । একটা পার্টকিলে রঙের কাবুলী বেড়াল ছিল তাঁর বড়ো আদরের, আর ছিল তাঁর বহুদিনের পুরোনো চাকর ব্রজ । ব্রজ ছিল যেমন কাজের তেমনি মেজাজী । রেগে গেলে নিজের মনে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে সে ঘুরত ঘরের মধ্যে । আমরা তো ভয় পেতুমই, এমন-কি, বড়দিদিও তাকে সমীহ করে চলতেন । প্রতিদিন সকালে সাতটার সময় ঘণ্টা বাজত, শাক বাজত, ঠাকুরদালানে উপাসনার সময় হত । বৃদ্ধ জ্ঞান ভট্টাচার্য্য মশায় রোজ উপাসনা করতেন আর তাঁর মৃত্যুর পরে করতেন শিরোমণি মশায় । বড়দিদি রোজ সকালে আমাকে নিয়ে যেতেন উপাসনা করতে । ছ'ই মাঘ মহর্ষির মৃত্যু-বার্ষিকীতে সকাল বেলা দালানে পিতার শ্রাদ্ধ

উদ্‌যাপন করতেন বড়দিদি। চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল ঝরে পড়ত ; চোখের কোণ মুছতে মুছতে আসতেন তিনি। মহর্ষির মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সেবা শুশ্রূষা সবই করেছেন বড়দিদি। সন্ধে বেলা নিয়মিত পায়চারি করতেন উত্তরের বারাণ্ডায়, কোনো কোনো দিন হঠাৎ তাঁকে দুই হাতে উঠিয়ে নিয়ে বারাণ্ডার এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত দৌড়তুম। হাল্কা ছিলেন যেন শোলা। নবান্নের দিনে নবান্ন তৈরী করে ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দিতেন বড়দিদি। ভাইফোঁটার দিন সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ যেতেন বড়দিদির ঘরে ভাইফোঁটা নিতে। বিয়ের পরেও তিনি কখনো স্বস্তুর বাড়ি ঘর করতে যাননি। জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই তার জীবন আরম্ভ হল, শেষও হল।

মহর্ষির পুত্রবধূদের মধ্যে মেজদিদি আর ন'দি প্রফুল্লময়ী থাকতেন জোড়াসাঁকোতে। মেজদিদিমা জ্ঞানদানন্দিনী থাকতেন রাঁচিতে আর কলকাতায় এলে থাকতেন স্টোর রোডের বাড়িতে। মেজদিদিকে কাছে পাইনি, আমার তখন অল্প বয়েস যখন তিনি মারা যান। ন'দিদি তাঁর সমস্ত আদর ঢেলে দিতেন আমার উপর। তাঁর একমাত্র ছেলে বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে তিনি গেরুয়া পরতেন। যেমন ছিলো তাঁর মুখের গড়ন তেমনি ছিলো তাঁর রঙ। এত বয়েসেও মনে হতো স্বর্ণচাঁপার পাঁপড়ির ফিকে সোনা কেউ যেন মাখিয়ে দিয়েছে তাঁর গায়ে। গাইতেও পারতেন চমৎকার। রোজ সকালে যখন পান সাজতে বসতেন তখন আমি গিয়ে জুটতুম। পান সেজেছি অনেক দিন তাঁর কাছে বসে, পান উন্টেপান্টে ভালোমন্দ পান চিনতে শিখেছি তাঁর কাছে। শুনতুম তাঁর কাছে সেকালের গল্প। প্রায়ই তাঁর শাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথের মা আর তাঁর বড় জা আমার ঠাকুরমা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্ত্রী গল্প করতেন। সেকালে ছেলে মেয়েদের রঙ সাফ করতে মা'রা যে কত ষড়্ নিতেন তাও শুনেছি তাঁর কাছে। দুধের সরের সঙ্গে কমলালেবুর খোসা শুকিয়ে বেঁটে, তার সঙ্গে গোলাপের পাঁপড়ি মিশিয়ে যে বস্তুটি তৈরী হোত তার নাম ছিলো রূপটান। এই রূপটান নিয়মিত মাখিয়ে মেয়েরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের লুকোনো রূপ টেনে বের করে আনতেন। প্রায়ই হুঃখ করে বলতেন যে বাড়িতে আজকাল একটা ছেলে কিংবা মেয়ে নেই যার চেহারা কিংবা রঙ দেখলে

তাঁর শ্বশুর বাড়ির লোক বলে কেউ মনে করবে। নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর আক্ষেপ মেনে নেওয়া ছাড়া আমার উপায় ছিলো না। তাঁদের সময় বাড়িতে ছিলেন প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণু। তাঁর কাছ থেকে যে সব গান শুনে শিখেছিলেন তা প্রায়ই গাইতেন। ১৯৪০ সালে আমি যখন জেলে তখন তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষির আমলের শেষ সুরের রেশটুকু মিলিয়ে গেল জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে।

আট বৎসর বয়সে পিতা আমাকে ইন্সকুলে ভর্তি করে দেন। দর্জি-পাড়ায় ‘ফ্রোবেল ইন্সটিটিউশন’ বলে একটি চমৎকার বিদ্যালয় তখন ছিল। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন অবিনাশ বসু মহাশয়। বাড়িতে আমার শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল ম্যাপ, ছবি, নানা রকমের গল্পের বইয়ের মধ্য দিয়ে। এই স্কুলে এসেও সেই একই ধারায় চললো আমার শিক্ষা। সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ে বেহারী দেববর্মণ মহাশয়কে। যেমন বিরাট শরীর তেমনি ছিল তাঁর সরস করে পড়াবার শক্তি। সপ্তাহে একদিন তিনি গল্প বলতেন আর আমাদের উপর ভার পড়তো সেই গল্পটা লিখে নিয়ে আসার। দুপুরে আধঘণ্টা টিফিনের ছুটির সময় তিনিও এক একদিন আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতেন। গ্রীষ্মের ছুটির আগে ইন্সকুলে হোতো চডুইভাতি। আমার উপর ভার পড়তো বাড়ি থেকে যন্ত্রির থালা আর হাঁড়ি নিয়ে যাওয়ার। বেহারী বাবু রাঁধতেন আর আমরা সবাই যোগান দিতেম। সেদিন সন্ধ্যাবেলা যখন বাড়ি ফিরতুম তখন তারপর দিন ইন্সকুলে যাওয়া হবে না বলে মন কেমন করতো। এ’রকম আর একটি ইন্সকুল তখন ছিলো না কলকাতায়। শিশুমনগুলিকে আখমাড়া কলে পিষে সব রসটুকু নিংড়ে নেবার জ্ঞান যে-সব ব্যবস্থা তখন স্হরময় ছিলো তারই নাম ছিলো ইন্সকুল। ‘ফ্রোবেল ইন্সটিটিউশনে’ তিন বৎসর পড়ে যে ইন্সকুলে ভর্তি হই সেটা এই জাতেরই প্রতিষ্ঠান ছিল। দু একজন শিক্ষক ছাড়া সবাইকে আমরা যমের মত ভয় করতুম। হেডমাস্টারকে দেখলে যেমন আতঙ্ক হোতো, স্নন্দরবন থেকে যদি একটা বেঙ্গল টাইগার এসে হাজির হোতো তো তাকে দেখেও আমাদের এতটা আতঙ্ক হোতো কিনা সন্দেহ। এই ‘মিত্র ইন্সটিটিউশন’ থেকেই আমি ম্যাট্রিক পাশ করি। দুজনের কথা মনে পড়ে, পূর্ণচন্দ্র দে উত্তরাগর মহাশয় আর আমাদের হেডপণ্ডিত মহাশয়কে। দীর্ঘকায় সুপুরুষ

পূর্ণবাবু পড়াতেন বাংলা, নানা সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক তিনি আমাদের শোনাতে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও বাংলা লেখবার রীতির প্রতি তাঁর ছিলো সীমাহীন অবজ্ঞা। সমাসবহুল বাঙলার উপর ছিলো তাঁর প্রাণের টান, রচনার শক্ত শব্দ ব্যবহার করতে পারলে তাঁর খুসির অন্ত থাকতো না। একবার সাহিত্য সম্বন্ধে একটি রচনা লিখতে দিয়েছিলেন তিনি। ব্যাকরণের নিয়ম মানলেই যে সাহিত্য হয় না এই মন্তব্য করেছিলেন আমার রচনায়। এই অপরাধ তিনি সহজে ক্ষমা করতে পারেন নি। আমাদের হেডপণ্ডিত-মশায় ছিলেন যেমন তেজী পুরুষ তেমনি স্নিগ্ধ প্রকৃতির মানুষ। তাঁর ভৎসনায় মনে গ্লানির তলানি জমে থাকত না। তিনি আমাদের স্নেহ করতেন, আমরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতুম। ইস্কুলের দরজায় বসে বসে ঝিমতো বুড়ো দারোয়ান ভুটি। কতবার দুপুরে কয়েক জন বন্ধু মিলে ভুটি দারোয়ানকে ধাক্কা মেরে ইস্কুল পালিয়েছি সিনেমা দেখবো বলে। আমার মাথায় ছিলো একমাথা কৌকড়ান চুল আর তার মধ্যে ভরা ছিলো বিশ্বের দুষ্টমি। একবার বাড়ি থেকে ইলিশমাছ ভাজা এনে সেকেণ্ড পণ্ডিত মশায়ের পকেটে ফেলে দিয়েছিলুম। নশির ডিবেটি পকেট থেকে ওঠাবার সময় হাতে যা উঠে এলো তাই দেখে পণ্ডিত মশায়ের চুলুনি থেমে গিয়েছিলো সেদিন।

বাড়িতে আমি ছিলুম ভোলার জিন্মায়। চান করানো, খাওয়ানো সব সেই করতো। খুব ছোট বয়সে সে এসেছিলো আমাদের বাড়িতে। আমার দাদা দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে সে ইস্কুলেও গিয়েছিলো। স্ত্রী চেহারা, ফিটফাট, সে ইংরেজী পড়তে পারতো, গান গাইতো, সেতারও বাজাতো। বাড়ির অন্য চাকরেরা তাকে ভোলাবাবু বলে ডাকতো। ভোলাই ছিলো আমার পিতার চাকর, খাজাঞ্চি, পরামর্শদাতা। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই ভোলার হাতে পড়তে হতো। মুখ ধুয়ে তার সামনে দাঁড়াইতুম। সে চুল ঝাঁচড়ে দিয়ে খাবার থাইয়ে ছুটি দিতো। এক দৌড়ে হাজির হতুম ওবাড়ির বাগানে ফুটবল খেলতে। সন্ধ্যাবেলা পড়া শেষ হলেই যেতুম আমার ছোট কাকীর ঘরে। তাঁকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে গল্প শুন্তে শুন্তে ঘুমিয়ে পড়তুম। তাঁর সম্ভান হয়নি, সমস্ত স্নেহ অজস্র ধারায় বর্ষিত হতো আমার উপরে। বড়ো ভালোবাসতুম তাঁকে। তাঁর মৃত্যুই আমার জীবনে মৃত্যুর দুঃখের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তেতলার ছাদ ছিল আমার আপনার লোক, খেলার সাথী।

হুপুর বেলা বাগানে ঘোরা সারা করে আসতুম চলে ছাদে। শিশু গাছটার একটা ডাল হয়ে এসে ছাদটাকে ছুঁই ছুঁই করত। আমি রোজ হাত বাড়িয়ে সেটাকে ধরতে চেষ্টা করতুম। সামনে দেখা দিত বহু দূর পর্যন্ত বাড়িগুলোর চিলের ঘরের মাথাগুলো। মনে হত নিঝুম হুপুরের রোদে তেপান্তরের মাঠের পক্ষীরাজগুলো যেন দলে দলে ঘাড় বঁকিয়ে ছুটছে। বাগানের দক্ষিণে মদনবাবুর বাড়ির ছাদে আমারি মত পাক খেত আমার ছোটবেলার সাথী দেবু আর গোপাল। বাড়ির উত্তরে গোলাবাড়ির ধারের সেই লাল বাড়ির ছাদে আমারই বয়সী দুটি মেয়ে ঘুর-ঘুর করতো। তারাও ঘুড়ি ওড়াত, আমিও ওড়াতুম। দুটুমি করে ঘুড়ি নামিয়ে আনতুম তাদের হাতের কাছে, যেই ধরতে যেত অমনি স্রুতো টেনে ঘুড়ি উঠিয়ে নিতুম। ঘুড়ি উড়োবার নেশা ছিলো আমার। ছুটির দিন হুপুর থেকে ঘুড়ি ওড়াতুম। রোদ্দুরে ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ হল খারাপ। একবার ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। বিকেল বেলা ছাদে মা, কাকী, বোনেরা সব বেড়াতেন। রবীন্দ্রনাথও বেড়াতেন এক একদিন সন্দের সময়। সন্দের আলো শিশু গাছটার পাতার মধ্যে ঝলমল করত, গলির মোড়ে শিবের মন্দিরে বাজত আরতির ঘণ্টা, চিলের কোঠাগুলো আব্ছা হয়ে আসত অন্ধকারে, আমার পক্ষীরাজ ঘোড়াগুলো তাদের কালো কেশর ফুলিয়ে থামতো এসে বাড়ির ছাদে ছাদে।

মহর্ষির মৃত্যুর কিছুদিন পরে দাদামশায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যাঠামশায় দ্বিপেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর পাট গুটিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে গেলেন। বৈঠকখানা ঘরে তখন থাকতেন আমার দাদা দিনেন্দ্রনাথ। তিনি ছিলেন আমার চেয়ে প্রায় কুড়ি বছরের বড়। বোঁঠাকরুনের মুখে শুনেছি যে তাঁর বাসি বিয়ের দিন দশ মাসের শিশু আমাকে তাঁর কোলে বসিয়ে দেওয়া হয়। আমরা সব ভাইবোনেরা যেমন ভালবাসতুম দাদা দিনেন্দ্রনাথকে, তিনিও আমাদের তেমনি স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে আমাদের আব্দারের অন্ত ছিল না। ছোটদের সঙ্গে যেমন তাদের সমবয়সী হয়ে তিনি মিশতে পারতেন, বড়দের আসরেও তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। অনন্তসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর মনের রসবোধের সূক্ষ্ম শিকড়গুলি দেশবিদেশের সাহিত্যের মধ্যে নিয়তই রসদ সংগ্রহ করত। রসের ওজন

বোধ ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ। যেমন অপূর্ব আবৃত্তি করতে পারতেন তেমনি করতে পারতেন অভিনয়। গলায় ছিল তাঁর যাদু। তাঁর কণ্ঠ থেকে যে সুর ঝরে পড়তো ঝরণার মতো, তার গতি যেমন ছিল অনায়াস, তেমনি ছিলো তার গাঙ্গীর্ষ ও মধুরতা। এমন দরদভরা প্রাণ-উধাও করা কণ্ঠস্বর কমই শুনেছি আমার জীবনে। রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেই শিথিয়ে দিতেন দিনেন্দ্রনাথকে। আর আমরা শিখতুম দাদা দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। বৈঠকখানা ঘরের সে মজলিস একদিন ভেঙ্গে গেল। শেষবার শান্তিনিকেতন থেকে চলে এসে জোড়াসাঁকোয় থাকবার কিছুকাল বাদেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকেই বাড়িতে পাবলিক থিয়েটার কিন্বা বাইজীর নাচ নিষিদ্ধ ছিল। রসসৃষ্টির অবাধ সুযোগ ছিল বাড়িতে কিন্তু রসের নামে সেকালের ধনীদেব জীবনের প্রচলিত কলুষ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে নি। গান, নৃত্য, অভিনয় যা কিছু হত বাড়িতে, তার স্রষ্টা ছিলেন বাড়িরই মেয়েপুরুষেরা। বাড়িতে প্রথম অভিনয় যা আমার মনে আছে সে হচ্ছে ‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা’। আমার বয়স তখন ছ’ বছর হবে। আমরা ভাইবোনেরা তাতে অভিনয় করেছিলুম। নিজের মনে আমরা অভিনয় করতুম ছোটদের দল। কখন দোতলার সিঁড়িটা আমাদের ষ্টেজ হতো, কখনো বা ঘরের তক্তাপোষের উপর মশারি খাটিয়ে ষ্টেজ তৈরী হত আমাদের। বড়োদেরও ডেকে নিয়ে দেখাতুম আমরা। বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের সাহায্যে যখন ‘ফাস্তুনী’ অভিনয় হয় আমাদের উঠোনে আমার বয়স তখন দশ এগার বছর হবে। কবিশেখরের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সাজ আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। ঠিক মনে হল যেন প্রাচীন ভারতের স্বপ্নলোক থেকে এক কবি এসে দাঁড়ালেন, রেবারুতীরে মহাকালের মন্দিরে আরতির সময় শঙ্কর যেখানে নৃত্য করেন সেই উজ্জয়িনীর কবি। রবীন্দ্রনাথ বাড়লের ভূমিকাও গ্রহণ করেন। মনে গেঁথে আছে আজও রাজার ভূমিকায় গগনেন্দ্রনাথের অভিনয়, শ্রুতি-ভূষণ বেশে অবনীন্দ্রনাথ, জগদানন্দ রায় মহাশয়ের অপূর্ব অভিনয় দাদার ভূমিকায় আর শিশু সমরেশের গান। প্রাক্ষণ লোকে লোকারণ্য। শুধু দাঁড়িয়ে দেখবার জগ্রে ছ’শো টাকা দিতে প্রস্তুত ছিল কেউ কেউ। আমি ও আমার এক ভাই নবেদ্র প্রোগ্রামই বিক্রী করেছিলুম কয়েক শ টাকার।

ষ্টেজ সাজালেন অবনীন্দ্রনাথ আর নন্দলাল। সকালে দুপুরে কতবার অবনীন্দ্রনাথ এসে বসছেন উঠোনে আর ষ্টেজের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। মাঝে মাঝে ‘নন্দলাল’ বলে দিচ্ছেন হাঁক, নন্দবাবু এসে দাঁড়াচ্ছেন ব্রহ্ম হয়ে। এটা ওটা করবার জন্যে তাড়া দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে এসে বসতেন। তের চোদ্দ হাজার টাকা উঠেছিল দুদিনের অভিনয়ে। পরের দিন সকালবেলা আমরা ছোটদের দল করলুম ফাল্গুনীর অভিনয়, বড়োরা হলেন দর্শক। আমাদের সেই দক্ষিণের হল ঘরে আর বিচিত্রার ঘরে এমনি করে আমরা বাড়ির ছেলেমেয়েরা ‘গোড়ায় গলদ’, ‘গান্ধারীর আবেদন’, ‘বশীকরণ’, ‘শকুন্তলা’ অভিনয় করেছিলুম। প্রত্যেকটাতে আমার কিছু না কিছু অংশ ছিল। বিদেশী ও স্বদেশী সাহিত্যের বই অফুরন্ত ছিল বাড়িতে, পড়বার নেশাও ছিল সর্বনেশে। ডায়নামিট, মেটারলিক, অস্কার ওয়াইল্ড, ডিকেন্স, মোপাসাঁ, বাল্জাক, সবাইকে সেদিন টেনে নিয়েছি আমার মনের মধ্যে। বয়েস তখন পনের ষোলর বেশি নয়, মন তখন অগস্ত্য মুনির মত এক গণ্ডুষে রস-সমুদ্র পান করবার জন্য ব্যাকুল। রস-বিচারের দিন তখনও ঠিক আসেনি। সন্ধ্যাবেলা কাকা রবীন্দ্রনাথ আমাদের ইয়োরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা পড়ে শোনাতে। এমনি করে নিজের অজানিতে মনের মধুকোষে সঞ্চিত হতে লাগলো রস, রুচির পর্দা বাঁধা হতে লাগলো এমন এক সুরে যা আজ পাত পেড়ে আঙ্গুল চেটে মোটা রস পান করবার প্রগতি-সাহিত্যের যুগেও নামিয়ে আনতে পারে নি।

শরীরের বনেদ আমার ছিলো মজবুৎ। দিশি ও বিদেশী কোনো কশরৎই আমি বাদ দিই নি। কুস্তির সখও কিছুকাল মিটিয়ে নিয়েছিলুম। বেলা পর্যন্ত ঘুমনোর অভ্যাস আমার কোনোদিন ছিল না। অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভাঙতো, বাগানে কোন্ ভোর থেকে কোকিল হয়রাণ হত ডেকে ডেকে, ঝিঝু ঝিঝু করে আসত দখিনে বাতাস, আমি উঠে যেতুম ছাদে বেড়াতে। দেখতুম রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূবের উপাসনার ঘরে পাথরের চোঁকির উপর বসে আছেন চোখ বন্ধ করে পূবের দিকে মুখ করে। পূবের জান্না দিয়ে ভোরের সূর্যের প্রথম আলো পড়ত এসে তাঁর মুখের উপর। উপাসনা শেষ করে তিনি উঠে যেতেন।

বাঁশি বাজাবার খেয়াল এই সময় আমাকে পেয়ে বসে। আমার মেজদিদি এণার সঙ্গে রেযারেধির ফলেই শুরু হয় আমার বাঁশি বাজান। বাড়িতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ত, আমি যেতুম ছাদে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁশি বাজাতুম। কত বাঁশি, কত রকমের বাঁশি যে এই সময়ে যোগাড় করেছিলুম তার অন্ত নাই। এই সময় কলেজে ঢুকলুম ইন্সুলের পাঠ শেষ করে। প্রেসিডেন্সি কলেজের পশ্চিমে ছিল একটা মাঠ, দুপুর বেলা সেখানে গাছের তলায় বসে বাঁশি বাজাতুম। রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়েছি পুরীর সমুদ্রের ধারেও বাঁশি বাজিয়ে। একটা বাঁশের চোঙা করেছিলুম আমার বাঁশি রাখবার তুণ, সেইটি পিঠে বেঁধে বার হতুম আমার ভ্রমণে। একবার মনে আছে গেছি কেন্দুলীর মেলায়। হাজার হাজার বাউল এসেছে। তাদের সঙ্গে গাছের তলায় পেতেছি আমার আড্ডা, গান গেয়েছি, বাঁশি বাজিয়েছি, অজয়ের তীর থেকে তুলে এনেছি হাঁসের পালকের মত শাদা কাশ।

আমি লোকটা জাতে রোম্যান্টিক। আমার জীবনটা হচ্ছে কল্পনার স্বপ্নে ভরা অক্ষয়-তুণ। মনে স্বপ্নের শেষ নেই, স্বপ্নের কাজল চোখে মেখে আমি এ পৃথিবীতে এসেছি। আর নিয়ে এসেছি মনের মধ্যে অনন্ত বিরহ। যা দেখেছি দু'চোখ ভরে, তাতে মন ভরেনি। দেখেছি আলো, তবু আর আলো, আকাশ-উজাড়-করা, প্রাণ-ডোবান, সব-কালোকে-দেউলে-করে-দেওয়া আলোর জন্তে মন আমার তৃষিত হয়েছে। সবুজের ঢেউ ছলে ছলে উঠছে মাঠে মাঠে তবু মেটেনি মনের সবুজের তৃষা। পরমাশ্চর্য, অল্পম যে কল্পনা মন করেছে, যে স্বপ্ন মন দেখেছে তার তুলনায় সব সবুজ ফিকে হয়ে গেছে। এই জন্তে দু'চোখ ভরে যে রূপ দেখেছি, কানে যে সুর শুনেছি, তাদের গ্লান করে দিয়েছে সেই সব অফুরন্ত রূপ-ছবি যা সৃষ্টি করেছে মন কল্পনায়। সেই সব কানে-শোনা সুরকে ছাপিয়ে গেছে সুরের পরে সুর, যে অফুরন্ত সুর শুনেছে মন কল্পনার স্বপ্নলোকে। যা কিছু মন দেখেছে আর শুনেছে, কেবলই মনে হয়েছে কোথায় যেন কিছু কম থেকে গেছে, কোথায় যেন রঙটা একটু ফিকে থেকে গেল, সুর কেমন যেন ঠিক পর্দায় এসে থামল না, কিছু মীড় বাদ থেকে গেল। বাস্তবের সব রূপ-রসের মধ্যে এই অপূর্ণতার আভাস বারে বারে পায় বলেই মন সৃষ্টি

করে কল্পনার স্বপ্ন-লোক। সেখানে বাস্তবের রূপের ও রসের সমস্ত অপূর্ণতা, সমস্ত দৈন্ত্য মিলিয়ে যায়, কল্পনা তার হাতুড়ি দিয়ে বাস্তবকে ভেঙেচুরে, তার সঙ্গে স্বপ্নের মাল-মশলা মিশিয়ে এমন আশ্চর্য রূপ ও রসের সৃষ্টি করে যাতে মন ভরপুর হয়ে ওঠে আনন্দে। বাস্তবের অপূর্ণতার এই বোধ মনের মধ্যে সমস্ত অনুভূতির শিরাগুলোকে ব্যথায় টন্টনে করে রাখে। কল্পনা যখন তার রূপরসে নিটোল খেলনাগুলো সৃষ্টি করে নিয়ে হাজির করে মনের সামনে তখন সেই আগেকার ব্যথার সঙ্গে মিশে যায় এক নূতন ব্যথা, পূর্ণতাকে পাওয়ার ব্যাকুল বেদনা। জীবনের কেন্দ্রের অসীম অনন্ত বিরহ বলি আমি একেই। এই বিরহের তুষায় মনের অধর জলে পুড়ে যাচ্ছে, মনের কপোল চির-পাণ্ডুর। বাস্তবের অপূর্ণতা-বোধ আর মনের মধ্যে পূর্ণ রূপসৃষ্টি এ হল রোম্যান্টিকের জীবনলীলা, আর এই হোল আমার ভিতরটার আসল চেহারা। আমি জাতে রোম্যান্টিক। হালের মনো-বিজ্ঞানের বুলি-আওড়ানেওয়াল। ‘আধুনিক’ আমার উপর অবজ্ঞায় ও করুণায় যে মাটির উপর লুয়ে পড়বে তা’ আমি বেশ বুঝতে পারছি। ঠোঁটে, মুখে, চোখে অবজ্ঞার বিদ্যুৎ খেলিয়ে বিজ্ঞ ‘আধুনিক’ বলবে, এ রোম্যান্টিসিজম্ তো বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়ার (এস্কেপিজম্) খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাপুরুষতারই আর এক নাম রোম্যান্টিসিজম্! ঝুটো আধুনিককে আমি বলবো, নকলনবীশ আধুনিক, তুমি জীবন সম্বন্ধে আদবেই ওয়াকিবহাল নও। রোম্যান্টিসিজম্ বাস্তবকে এড়িয়ে-যাওয়া ভীকতা নয়। বাস্তব জীবনের দৈন্ত্য, অপূর্ণতা যে মন গভীরভাবে অনুভব করে না সে মন রোম্যান্টিক হতেই পারে না। এই অপূর্ণতা-বোধ মনের মধ্যে অসহ্য দহন-জ্বালা সৃষ্টি করে। তবেই মনে বিদ্রোহের কালবৈশাখী ঘনিয়ে আসে, বিদ্রোহী মন পূর্ণতার সন্ধানে বের হয়, কল্পনার সমস্ত শক্তি দিয়ে পূর্ণতার রূপসৃষ্টির কাজে লেগে পড়ে। পূর্ণতার কল্পনা কি যে-সে মনের কাজ! কত বীর্য, কত সংযম এই কল্পনার প্রাণ-রস জোগায় তার খবর কি ঝুটো ‘আধুনিক’ রাখে? পূর্ণতার কল্পনা ও পূর্ণতার রূপসৃষ্টি যে মানুষ করে সে নোংরা বাস্তবকে প্রচণ্ড আঘাত করে, সে জুগিরে দেয় কোটি কোটি লোকের হাতে এই বাস্তবকে ভেঙেচুরে নতুন বাস্তব সৃষ্টি করবার হাতিয়ার। যার বুক বাস্তবের এই দীনতার

ব্যথায় ভরে উঠেছে, যার মনে এই অ-ধরা পূর্ণতার ছবি কণিকের জন্তেও কল্পনার আলোকে ফুটে উঠেছে সে কি আর বসে থাকতে পারে নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মরতির রসে মজে ! সে রোম্যান্টিক তখন পথে বের হয়ে পড়ে, মিথ্যের চোর-কাঁটা মাড়িয়ে, নিন্দার শিলা-ঝুটি উপেক্ষা করে তাকে পথ চলতে হয়। মানুষের ইতিহাস যখনই এসে থমকে দাঁড়িয়েছে যুগের চৌমাথায় তখন এই রোম্যান্টিকেরাই নিজেদের জালিয়ে ধরেছে মশাল করে, নিজেদের পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে মানুষকে পথ দেখাতে। প্রত্যেকটি সৃজনশীল মানুষই তাই রোম্যান্টিক, প্রত্যেকটি সৃজনধর্মী যুগও এই কারণেই রোম্যান্টিক। তাই ‘প্রমিথিয়ুস আন্বাউণ্ড’ ও ‘রিভোল্ট অফ্‌ ইসলাম’ এর কবি শেলী রোম্যান্টিক। আর তাঁর যুগ, ইংলণ্ডের একটি সৃষ্টি-ধন্য বিরাট যুগ রোম্যান্টিক যুগ। ঠিক এই কারণেই, ‘এই সব মূঢ় স্নান মুক মুখে দিতে হবে ভাষা’র কবি, ‘বন্দরে বন্ধন-কাল এবারের মতো হোলো শেষ’ এই খবর যিনি আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন সেই চলার কবি, ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে বাছা বাছা ভূতগুলোকে বের করে আনবার কবি রবীন্দ্রনাথ রোম্যান্টিক। বাস্তবের দীনতা, অপূর্ণতা, ক্রুরতা, নোংরামি অসহ্য, পূর্ণতার ছবি মন দেখেছে। এই দীনতা, ক্রুরতা দূর করে সেই পূর্ণতা আনতেই হবে জীবনে, বের হয়ে পড়ো পথে। এই হোল রোম্যান্টিকের ডাক। এই ডাকে আমার প্রাণ সাড়া দিয়েছে। এই ডাকেই আমার প্রাণ তার পূর্ণ রস পেয়েছে। এই জন্তেই আমি রোম্যান্টিক, আর রোম্যান্টিক বলেই আমি বিপ্লবী। রোম্যান্টিক বলেই আমি বিপ্লবী এই কথাটা আধুনিকদের কানে তো বেশরো বাজবেই, তাদের বাদ দিয়েও আরো অনেকের কানে বেশরো ঠেকবে। তবু এ কথাটা আমায় জোর গলায় বলতে হবে, জীবনের সদর রাস্তায় একরাশ ধুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাঙা পাজরের স্তূপ নিজের এই জীবনের দিকে মাথা তুলে অবিকম্পিত কণ্ঠে বলতে হবে ; জাতে আমি রোম্যান্টিক, তাই আমি বিপ্লবী।

কতটুকু পেয়েছি? নিজেকেই শুধোই—কতটুকু পেয়েছি? সারা দুনিয়ার পথ, এন্ডোথেব্‌ডো পথ, চড়াইয়ের পথ, কণ্টকাকীর্ণ পথ চলার পর কতটুকু পেয়েছি? কতটুকু এগিয়েছি আদর্শের দিকে? বার বার তো দেখেছি যেখান থেকে একদিন চলা শুরু করেছিলুম সেখানে আবার

ফিরে গেছি। আবার চলা শুরু করেছি হার-না-মানা আমার এই পাগল মনটাকে নিয়ে। যেটুকু পেয়েছি তারি জোরে কি চলেছি, না যা-সব পাই নি, যার রঙে গন্ধে বুক ভরে আছে তারি পাগল-করা টানে চলেছি! সেই না-পাওয়াটার পাওয়া কি একেবারে নিশ্চিত? এড়িয়ে যাবার কোনো সম্ভাবনাই কি তার নেই? প্রত্যেকটি আদর্শের বেলায়ই কি বলা যেতে পারে না যে পাওয়া, না-পাওয়ার দুই সম্ভাবনার ঢেউয়ের চূড়ায় ছলছে সেই আদর্শ? তবুও যে মানুষ চলে, সে কেন চলে? সে রোম্যান্টিক তাই সে না-পাওয়ার টানে চলে। সে রোম্যান্টিক অর্থাৎ পাওয়ার দম-আটকানো বাঁধনের মায়া-মুক্ত সে, না-পাওয়ার আকাশে ডানা মেলেছে তার প্রাণ, তাই যা হয়ত কখন পাবে না সেই পরিপূর্ণতার স্বপ্নের টানে সে চলে। মানুষ যখন কলুষরীমূগসম পাগল হয়ে বনে বনে ফেরে তখন সে কোন্ ‘আপন-গন্ধে’ পাগল হয়ে ফেরে? এই আপন-গন্ধ হচ্ছে প্রাণের মধ্যে পরিপূর্ণতার চকিত আভাসের আমেজ, পরিপূর্ণতার ক্ষণিক প্রকাশের দ্বারা মনে যে রসের জোয়ার বয়েছে তার গন্ধ।

এরই জোরে মানুষ পথ চলে, নইলে পথ-চলা সম্ভব হত না। মানুষের ভবিষ্যৎ, সেই নির্মল, জ্ঞান-উদ্ভাসিত, অনুরাগ-রঞ্জিত ভবিষ্যৎ যার কথা বিপ্লবী বলে থাকে— তার সবটাই সমাজ-বিজ্ঞানের আর অর্থনীতির নিয়ম থেকে হেঁকে তোলা সম্ভব নয়, মিশোনো আছে তার সঙ্গে স্বপ্নের অনেক মালমশলা। বিপ্লবী মাত্রই তাই রোম্যান্টিক, আর প্রত্যেক খাটি রোম্যান্টিকের মধ্যে তাই প্রচ্ছন্ন রয়েছে বিপ্লবী।

আমার প্রাণের এই রোম্যান্টিক রস আমাকে একরোখা, জেদী আর আপস-সহিষ্ণু করে গড়ে তুলেছে। বাস্তবের সঙ্গে আপস করতে আমি রাজী হই নি সারা জীবনে। আদর্শের অন্ধকার পথে মন যাত্রা শুরু করেছে একদিন, সে অভিসার কি কখন সম্ভব আপসের বাঁধা সড়কের পথে?

তখন কিশোর বয়স। উজাড় করে পড়ে চলেছি দেশী-বিদেশী সাহিত্য, গান গাইছি, বাঁশি বাজাচ্ছি। মন স্বপ্নে মশ্গল। মনে পড়ে এই বয়সে একটি স্বপ্ন প্রায়ই দেখতুম। দেখতুম একটি মাঠ, দিগন্ত-ছোওয়া প্রকাণ্ড মাঠ, সেই মাঠের উপর দিয়ে আমি প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে চলেছি, আমার পা কিন্তু মাটি ছুঁচ্ছে না। এই অদ্ভুত স্বপ্ন আমি প্রায়ই

দেখতুম। ইয়োরোপে থাকাকালীন একজন সাইকোঅ্যানালিস্ট মনোবিজ্ঞান-দক্ষকে এই স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলুম। তিনি বলেছিলেন— বাস্তবকে অস্বীকার করছে তোমার মন, তাই মাটিকে স্পর্শ করছে না, উড়ছে মন কল্পনার আকাশে। স্বপ্নের অর্থ হোলো এই। অনেক দিন পরে নিজের জীবনের আসল কাঠামোটি কি সেটা নিয়ে মনের মধ্যে হাত্‌ডাতে হাত্‌ডাতে নিজের আসল চেহারাটা যখন দেখতে পেলুম তখন বুঝতে পারলুম যে স্বপ্নটা আমার রোম্যান্টিক প্রাণেরই ব্যঙ্গনা।

উনিশশো সতেরো সাল। স্কুলের পাঠ শেষ করে তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকেছি। স্কুলের কড়া বাঁধন থেকে ছুটি পেয়ে মনটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কলেজের কমনরুমে গানের ফোয়ারা বইয়ে দিলুম কপিল দেব আমি আর হরেন দত্ত। হরেন স্ককর্প, স্নগায়ক বলে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অল্প বয়সেই তার মৃত্যু হয়। ক্লাসেও গুঞ্জন চলত পেছনের বেঞ্চিতে বসে। ‘একদা তুমি প্রিয়ে’, ‘পথিক হে ওই যে চলে, ওই-যে চলে সঙ্গী তোমার দলে দলে’, ‘সে কোন্ বনের হরিণ’, এই সব গান তখন সত্য সত্য তৈরি হয়েছে। ‘বিচিত্রা’র যুগ তখন শুরু হয়েছে। বাড়িতে গান শেখা হলেই কলেজে কমনরুমের আসরে সে সব গান গাইতুম। কলেজের পশ্চিমে যে প্রকাণ্ড মাঠ ছিল, সেখানে গাছের তলায় বসে আমি আর কপিল গানের পর গান গেয়ে চলতুম ছপূরের পর ছপূর। বাঁশিও নিয়ে যেতুম সঙ্গে করে, আমাদের গাছের তলার আসর বাঁশির দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হত না। কলেজের বইয়েতে মন আদবেই বসতো না, তা ছাড়া ঝাঁরা পড়াতেন তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করতেন সমস্ত রস নিঙরিয়ে নিয়ে সাহিত্যকে একেবারে রসহীন করে তুলতে। তারপর সেই ছিব্‌ড়ে পরিবেশুন করতেন তাঁরা ছাত্রদের কাছে। ব্যাকরণ আর ঐতিহাসিক তত্ত্বের ফাঁস পড়িয়ে সাহিত্যরসের প্রাণ-হত্যার একটানা রসমেধ যজ্ঞ ছিল আমাদের ক্লাসগুলো। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত, ক্লাস পালিয়ে টেনিস খেলতুম কিংবা পশ্চিমের মাঠে গাছের তলায় জমাতুম গানের আর বাঁশির আসর।

উনিশশো সতেরো সাল, তখন সবেমাত্র কলেজে ঢুকেছি এমন সময় রবীন্দ্রনাথ এলেন শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ‘ডাকঘর’ নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করতে। সেই সময়ই কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন

হয় আর এ্যানি বেসন্ট কংগ্রেসের সভানেত্রী হন। মনে আছে তাঁকে সভানেত্রী করা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র মতবৈধতার উদ্ভব আর তার ফলে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের কাছে রাজনৈতিক নেতাদের ঘন ঘন আসা যাওয়া। যতদূর মনে পড়ে একদিকে ছিলেন সুরেন বাবুশ্যে আর অন্যদিকে বৈকুণ্ঠ সেন। বৈকুণ্ঠ সেনের দল রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক করেন। পরে দু'দলের আপস হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সেই কংগ্রেসের অধিবেশনেই আমরা 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি গাই। এই অধিবেশনের সময়েই রবীন্দ্রনাথ গানটি রচনা করেন। বাড়িতে আমি, আমার দিদি রমা, আর দাদা দিনেন্দ্রনাথ প্রথমে গানটি শিখি ও প্রকাশ্য জনসভায় সর্বপ্রথম সেবারে কংগ্রেসের অধিবেশনেই এই গানটি গাওয়া হয়।

'বিচিত্রা'র আসর তখন সবে শুরু হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ, গগেন্দ্রনাথ, কবি সত্যেন দত্ত, স্বকুমার রায়, ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, যতীন বাগচী প্রভৃতি কলাবিদ, কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক ও সমালোচকদের নিয়ে 'বিচিত্রা'র সৃষ্টি করেন রবীন্দ্রনাথ। রসবিদ রসস্রষ্টাদের আসর তখন একটিও ছিল না। কলকাতার মত এতবড়ো শহরে এমন একটি জায়গা ছিল না যেখানে মনের অন্তর-মহল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রসিকদের সমাবেশ হতে পারত কিংবা যেখান থেকে খাঁটি সাহিত্য-রসের পরিবেশন করা যেতে পারত রসপিপাসুদের। 'বিচিত্রা'র আসর সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ সেই দৈন্য ঘোচালেন। কত গান যে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তৈরি করলেন তার শেষ নেই। দাদা দিনেন্দ্রনাথ, দিদি রমা আর আমি কত গান যে গেয়েছি 'বিচিত্রা'র আসরে তার অস্ত নেই। দিদি রমার গলায় 'এই যে কালো মাটির বাসা', 'নাগো এই যে ধুলা আমার না এ,' 'এবার রঙিয়ে গেল হৃদয়গগন সাঁঝের রঙে,' 'সন্ধ্যা হল গো-ওমা সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো' এই গানগুলো যারা শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছে তারা কখনো ভুলবে না। রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে তাঁর গানগুলো আমার দিদি রমার গলায় যেমন রূপ নেয় এমন খুব কম লোকের গলাতেই নেয়। মনে পড়ে একটি দুপুরের কথা। ঘুরঘুর করতে করতে আমি 'বিচিত্রা'র ঘরে গিয়ে হাজির। দেখি রবীন্দ্রনাথ

পিয়ানো বাজাচ্ছেন আর গুন্‌গুন্ করে গাইছেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুনলুম। ‘আমি চঞ্চল হে স্বপ্নের পিয়ানী’ এই কবিতাটির কিছু অংশ নিয়ে স্বর দিয়ে গান রচনা করছিলেন তিনি। ‘বিচিত্রা’র আসরে সত্যেন দত্ত পড়লেন তাঁর কবিতা, প্রমথ চৌধুরী করলেন সাহিত্য নিয়ে আলোচনা আর রবীন্দ্রনাথ শোনালেন তাঁর ‘পলাতকা’র কবিতাগুলো আরো কত শত কবিতা আর গল্প। ‘বিচিত্রা’র আসরে যোগদান করবার সুযোগ লাভের জন্য কলকাতার সাহিত্য-রসিকেরা তখন উদ্গ্রীব হয়ে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে রসের পর্দা-বাঁধা ‘বিচিত্রা’ কলকাতার রসিক সমাজে রসের রুচি সৃষ্টি করতে যে কী অসামান্য কাজ করেছে তা বলে শেষ করা যায় না। ফরাসী দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে ‘সাঁল’র যে দান কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে ‘বিচিত্রা’র দাম তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। ‘বিচিত্রা’র মতো একটি মজলিস যদি আজ থাকত তাহলে রুচির এমন জঘন্য বিকার ঘটত কি? তাহলে রস পরিবেশনের অছিলায় পাকের সওদা ফিরি করে ফিরতে পারত কি ‘আধুনিক’ সাহিত্যিকেরা! সমাজের মার্জিত রুচি অতি সহজেই তাদের প্রত্যাখ্যান করত।

‘ডাকঘর’ অভিনয়ের কথা বলছিলুম। ‘বিচিত্রা’র ঘরে রিহার্সালের পালা শুরু হলো। ‘অমল’ মাজল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র বালক আশামুকুল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার অংশ গ্রহণ করলেন। গগনেন্দ্রনাথ মাজলেন অমলের পিসেমশায়, অবনীন্দ্রনাথ মোড়ল আর বৈষ্ণব, রথীন্দ্রনাথ রাজবৈষ্ণব, দাদা অসিতকুমার দইওয়ালার আর অবনীন্দ্রনাথের ছোটো মেয়ে সুরূপা মাজল সুধা। ভিতর থেকে গাওয়া হলো ‘হাদে গো নন্দরানী’, গাইলেন দিদি রমা আর আমার জ্যাঠাতুতো বোন হাসি আর বাঁশি বাজালুম আমি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার ভূমিকায় নেচে নেচে গাইলেন ‘গ্রাম ছাড়া এই রাঙা মাটির পথ’ আর আমি বাজালুম বাঁশি তাঁর গানের সঙ্গে। ‘বিচিত্রা’র ঘরের পশ্চিম দিকে স্টেজ বাঁধা হলো দরমা দিয়ে, তার উপরে আঁকা হোল আল্পনা। ঘরের কোণে রাখা হল পিলস্‌জ আর খড়ের চালের উপরে বাবুই পাখির শূণ্য বাসা। সাতদিন ধরে অভিনয় হয়। একদিন কংগ্রেসের সব নেতারা অভিনয় দেখতে আসেন। সেদিন তাঁদের মধ্যে ছিলেন গান্ধীজি, লোকমাত্র তিলক, মালবীয়ারজী, এ্যানি বেসন্ট আরো অনেক নেতা।

আমাদের বাড়িতে আমি অনেক অভিনয় দেখেছি, ইয়োরোপে থাকা-কালীনও প্রসিদ্ধ অভিনেতাদের অভিনয় আমি দেখেছি ও মুগ্ধ হয়েছি। সে সব অসাধারণ অভিনয়ের কথা স্মরণ রেখেও আমি বলছি যে ‘ডাকঘরে’র যে আমি দেখেছি তার মত আশ্চর্য অভিনয়, সর্বাঙ্গসুন্দর, নিখুঁত অভিনয় আমি মাত্র আর একবার দেখেছি জীবনে, আর সেটা হচ্ছে মস্কোর ভাগ্তান্গভ্ থিয়েটারে ‘প্রিন্সেস্ তুরেনদতে’র অভিনয়। ‘ডাকঘর’ নাটকায় অবনীন্দ্রনাথের ‘বৈজ্য’ আর ‘মোড়ল’ এই দুই চরিত্রের অভিনয় সে যে কী অপূর্ব, আশ্চর্যম্বষ্টি তা যে না দেখেছে তার পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। আমার মতে অভিনেতা হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বড়ো। যে অংশই গ্রহণ করুন-না কেন, রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথ থেকে যেতেন, রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত সচেতন সত্তা বিলীন হতে পারত না যে-চরিত্র অভিনয় করতেন তার মধ্যে। অবনীন্দ্রনাথ আশ্চর্যভাবে সে চরিত্র বনে যেতে পারেন। ‘ডাকঘরে’ অবনীন্দ্রনাথের অভিনয় রবীন্দ্রনাথের অভিনয়কে ছাপিয়ে চলে গিয়েছিল। তার আর একটি প্রমাণ এই যে অন্য সকলের অভিনয়ের স্মৃতি কিছু-না-কিছু স্মান হয়েছে কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের অভিনয়ের স্মৃতি জলজলে হয়ে রয়েছে মনের মধ্যে, তার রঙ এতটুকুও ফিকে হয়ে যায় নি।

স্বরের বিনি স্মৃতোয় গাঁথা ‘বিচিত্রা’র সেই সন্ধেগুলি আজও হারিয়ে যায় নি। পথের ধুলোর মদ পান করে মাতাল হ’য়ে বীভৎস চীৎকার করে চলেছি দিনের পর দিন, তবু স্মৃতির উজান বেয়ে মন বারবার ফিরে যায় যে কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্তে, ‘বিচিত্রা’র সন্ধেগুলি তাদের অন্ততম!

এর কিছুদিন পরে দাদামশায় দ্বিজেন্দ্রনাথ এলেন শান্তিনিকেতন থেকে। তার কিছুকাল আগে তাঁর নিউমোনিয়া হয়েছিল, জোড়াসাঁকোয় যখন এলেন তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন নি। বৈঠকখানা ঘরে তিনি থাকতেন, সকাল-বিকেল কাটাতেন দক্ষিণের বারাণ্ডায়। প্রতিদিন দুপুর বেলা ডিকেন্সের নভেল কিংবা আরব্যোপন্যাস পড়ে শোনাবার জন্তে আমার তলব পড়ত। এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব দ্বিজেন্দ্রনাথকে ভুলিয়ে ওষুধ খাওয়ানোর জন্তে গান গেয়ে শোনাতেন। কলকাতার লর্ড বিশপ্, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, হীরেন দত্ত এঁরা প্রায়ই আসতেন। দক্ষিণের

থাকবার সময় রোজই একবার তাঁর কাছে গিয়ে বসতুম। তখন আমি গান্ধীবাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছি। দাদামহাশয় ছিলেন গান্ধীজির পরম ভক্ত। প্রায়ই বলতেন, এতদিন বাদে একজন লোক এলেন যিনি আমাদের দেশকে বাঁচাবেন। বৃদ্ধ বয়েসে চরকা কাটতে শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীবাদের সব কিছু মেনে নিতে পারেন নি, কোনো কোনো বিষয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন জেনে দাদামহাশয় ভারি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, বলতেন— রবি ঠিক বুঝতে পারছেন না, তিনি ধরতে পারছেন না গান্ধীর উদ্দেশ্য। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে তাঁকে চিঠি লিখতুম ইংরিজী শব্দের যুত্‌সই বাঙলার জন্তে। তিনি নতুন নতুন বাক্য রচনা ক'রে পাঠাতেন। একটি চিঠিতে লিখেছিলেন তিনি : আমি ডানাতাড়া জটায়ুর মতো পড়ে আছি। তাঁর সেই কাঁপা-হাতের লেখা অমূল্য কয়েকখানি চিঠি আমার ছন্নছাড়া জীবনের ওলোটপালটের মধ্যেও বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি। তারপরে তাঁর মৃত্যুর পরে যতবার শান্তিনিকেতন গেছি একবার তাঁর সেই ঘরের কাছে না গিয়ে থাকতে পারি নি। জবাগাছগুলো অযত্নে মরে গেছে, শুধু আমলকী গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেই ঘর আর বারাণ্ডার দিকে তাকিয়ে। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ নীচু বাংলা কিনে নিয়েছেন অনেকদিন, তাঁরা কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের আবাসস্থলের গুচিটা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। সেবারে দাদামহাশয় প্রায় দু'মাস কলকাতায় থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। সেই তাঁর শেষ কলকাতায় আসা।

কলেজে পড়ি তবু কলেজের বইয়ের সঙ্গে কতটুকুই বা সঙ্গন্ধ ! উজাড় করে পড়ে চলেছি বিশ্ব-সাহিত্য। শেরিডনের নাটক, অস্কার ওয়াইল্ডের গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, রসেটির কবিতা, ইয়েটসের কবিতা, এ. ই.'র বইগুলো আরো কত কিছু পড়ে চলেছি। রসের জন্তে মনে তখন মরুভূমির পিপাসা জেগেছে। যতই রস জোগাচ্ছি মন সব টেনে শুষে নিচ্ছে, রসের তৃষ্ণা তার কিছুতেই মেটে না, তার দাবিরও অন্ত নেই। তিনজন কবি এই সময় আমাকে পেয়ে বসলেন, অবিশ্রি রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে। আলো-বাতাস যেমন : নিত্যসহচর, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান ছিল আমার নিত্য-সহচর। তাঁর কবিতা ও গানের বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ছিল আমার প্রাণের সাবা। যে তিন জন কবির কথা বলছিলাম, তাঁরা হলেন কীটস, শেলী ও

ব্রাউনিং। দু' একটা কবিতার মারফত তাঁদের সঙ্গে পরিচয় আগেই ঘটেছিল, এখন ডুবে গেলুম তাঁদের কাব্যের রস-সমুদ্রে। কীটসের সনেট আর ওড্‌গুলো আমাকে অভিভূত করে। একটি সনেট আমার বিশেষ প্রিয় ছিল। আজও তার লাইনগুলো মনে জড়িয়ে আছে :

The poetry of earth is never dead.
When all the birds are faint with the hot sun,
And hide in cooling trees, a voice will run,
From hedge to hedge about the new mown mead,
That is the grass-hopper's - he takes the lead !
In summer luxury,—he has never done
With his delights, for when tired out with fun
He rests at ease beneath some pleasant weed.
The poetry of earth is ceasing never :
On a lone winter evening, when the frost
Has wrought a silence, from the stove there shrills
The crickets' song, in warmth increasing ever,
And seems to one in drowsiness half lost,
The grass-hopper's among some grassy hills.

পৃথিবীর কবিতা কখনো শেষ হয়ে যায় না। প্রথর রৌদ্রের তাপে অবসন্ন মূর্ছাতুর পাখিরা যখন গাছের শীতল ছায়ায় লুকিয়ে বাঁচে তখন ঝোপ থেকে ঝোপে একটি স্বর ছড়িয়ে যায় সন্ত-ফসল-কাটা মাঠের সম্বন্ধে। সে স্বর হচ্ছে গঙ্গা-ফড়িংএর স্বর—সবার আগে স্বর ধরে সেই। গ্রীষ্মের প্রাচুর্যে তার আনন্দের শেষ পায় না সে। যখন কোঁতুকলীলায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তৃণের তলায় আরামে করে সে-বিশ্রাম। পৃথিবীর কবিতা কখনো থেমে যায় না। একটি নিঃসঙ্গ শীতের সন্ধ্যায় কুয়াশা যখন নিস্তব্ধতা এনেছে চারিদিকে তখন আগুনের ধার থেকে ঝিল্লীর গান বেজে ওঠে তপ্ত হ'তে তপ্ততর স্বরে। আর তন্দ্রায় নিজেকে আধা হারিয়েছে যে লোক তার কাছে ঝিল্লীর গান মনে হয় যেন ঘন ঘাসে ঢাকা পাহাড় থেকে ভেসে-আসা গঙ্গা-ফড়িংএর গান।

এই পৃথিবীর মাটির সঙ্গে কীটসের অন্তরের যোগ ছিল। তাঁর কবিতা কালো মাটির গন্ধে ভরপুর। শেলীর কবিতা যেন শুধু আলো দিয়ে বোনা,

মাটির সঙ্গে তার যেন কোনো সংস্পর্শ নেই। কীটস মাটি-মায়ের আঁচল-ধরা ছেলে, বেদনা-কাতর, আর শেলী আকাশচারী বহু উর্ধ্ব থেকে সব-কিছু দেখছেন। তিনি স্পর্শ করেন নি মন দিয়ে আমাদের এই কালো মাটির পৃথিবীকে। ভালোবাসি কালো মাটির বাসা এই পৃথিবী, ভালোবাসি তার গন্ধ, তাই ভালোবাসি কীটসকে। শেলীর আকাশচারী অতীন্দ্রিয়তা মনকে বিস্মিত করে, অভিভূত করে আলোর বন্যায়। শেলীকে শ্রদ্ধা করি, তাঁকে ভালোবাসতে ভয় করে, বড় বেশি আলো। তাঁর *Ode to Intellectual Beauty, Sensitive Plant, Prometheus Unbound, Adonis*, ছোটোখাটো কবিতাগুলো আমার সেই বাগানের ধারের এক-তলার দক্ষিণের ঘরে বসে কত দিন-দুপুরের নিস্তব্ধতায় মশগুল হয়ে পড়েছি। ওষুধ গেলার মতো করে আমি কখনো কবিতা পড়ি নি। কবিতার বই-গুলো হাতের কাছে সাজিয়ে নিয়ে বসলুম, একটি নির্দিষ্ট সময়ে কবিতা পড়তেই হবে বলে যে-কোনো একজন কবির কাব্যগ্রন্থ খুলে শুরু করলুম পড়া, এই ধরনের রসের ব্যভিচার আমি কখনো বরদাস্ত করতে পারে নি। মনের মধ্যে থেকে তাগিদ এসেছে কবিতার জন্তে। মন ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছে— শুকিয়ে গেলুম, রস ঢালো, তৃষায় মরছি—তখন অন্তরের তাগিদে কবিতা নিয়ে বসেছি। যখন ব্রাউনিং পড়তে শুরু করলুম তখন কীটস, শেলী সব সরে গেল মন থেকে। এত ভালো লাগল ব্রাউনিংয়ের কবিতা, দিনরাত নেশার মতো পড়েছি। কলেজে, বাড়িতে সব সময় ব্রাউনিংয়ের কবিতা আমার সঙ্গে থাকত। ব্রাউনিংয়ের যে কত বিভিন্ন সংস্করণ সংগ্রহ করেছিলুম সে সময়ে! ব্রাউনিংয়ের এমন-একটি কবিতা আছে কিনা জানি নে যা আমি পড়ি নি।

পরে যখন রসের অন্তরমহলে কুলুপ দিয়ে নেমে এলুম বাস্তব জীবনের কড়া রোদে তেতে-ওঠা সংঘাতের ধুলোর মধ্যে, গান, কবিতা, বাঁশি অভিমানিনী প্রিয়ার মতো মুখ ফেরালো আমার দিক থেকে, তখন সংঘাতের ফাঁকে ফাঁকে কর্মের অবসরে এক-একদিন বুঝতে চেষ্টা করেছি কেন কীটস, শেলী, বায়রন প্রভৃতি কবিদের কবিতাকে ছাপিয়ে ব্রাউনিং এত ভালো লেগেছিল। ব্রাউনিংয়ের কবিতায় কীটসের কবিতার যুক্তিকার গন্ধ নেই আর না আছে তাতে শেলীর অতীন্দ্রিয় আলোর অপূর্বতা। ব্রাউনিংয়ের অধিকাংশ কবিতা একটু ভারী, শেলী ও কীটসের কবিতা যেমন আলোর

No ! let me taste the whole of it, fare
like my peers
The heroes of old,
Bear the brunt, in a minute pay glad
Life's arrears
Of pain, darkness and cold."

আর আশার আলোতে জল্জল্ তাঁর সেই লাইনগুলো কতবার কত অন্ধকার
দিনে আমার মন ভরে দিয়েছে আলোতে :

"One who never turned his back, but
Marched breast forward,
Never doubted clouds would break,
Never dreamed, though right were worsted,
Wrong would triumph,
Held we fall to rise, are baffled to fight better,
Sleep to wake."

এই স্বরের সঙ্গে আমার জীবনের স্বরের মিল আশ্চর্য, তাই সেই কিশোর
বয়সে ব্রাউনিংয়ের কবিতা আমাকে এত মাতিয়ে তুলেছিল।

দু'বছর কেটে গেল কলেজে। ১৯১৯ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে
থার্ড ইয়ারে উঠলুম। এবারে দু' একজন গুণী অধ্যাপকের সঙ্গে পেলুম,
কলেজের পড়া আগের মতো আর ততটা নীরস ঠেকল না। প্রফুল্ল ঘোষ
আমাদের সেক্সপীয়র পড়াতেন, আর ইংরেজী কবিতা পড়াতেন শ্রীকুমার
বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের কাছে পড়ে আনন্দ পেতুম। মনোমোহন ঘোষ
তখন অধ্যাপনা করেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। আমার ইংরেজীতে অনার্স
ছিল না, আমি নিয়েছিলুম ইকনমিক্সে অনার্স। তবু মনোমোহন ঘোষ
শেলী পড়াতেন সেই টানে আমি তাঁর ক্লাসে যোগ দিতুম, লোভ ঠেকিয়ে
রাখতে পারতুম না।

আমার জীবনের ধারাটা এ পর্যন্ত যদিকে বয়ে চলেছিল সেটা পলিটিকাল-
সমুদ্র-অভিমুখী বলা চলে না। দেশকে ভালোবাসতুম, বিদেশী শাসনের
উপর অন্তর থেকে ঘৃণা ছিল, বিদ্বেষ ছিল, তবুও যাকে পলিটিকাল বলে
সেটা আমি ছিলুম না। দেশের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে আমার
কোনো প্রত্যক্ষ যোগ তখনোও ছিল না। তখনোও বাস্তবতার পক্ষ পরশ

আমার জীবনকে আঘাত করে নি। বয়সটা ছিল কাঁচা, আর আমার দেশোদ্ভোধ ভাবের রসের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, তৃপ্ত ছিল। দেশের প্রতি ভালোবাসা তখনো কর্মের মধ্যে মুক্তি পেয়ে সার্থক হয় নি। এক কথায় তখন পর্যন্ত আমার জীবনটা ছিল ভাব-রসের আলোতে ফুটে-ওঠা মাটির সম্বন্ধহারা একটি অর্কিড।

এমন সময় ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হল কলকাতায়। তার কিছু কাল আগে লাল লজপৎ রায় আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। তিনি হলেন এই বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি। সেবারে গানের দলের ভার নিয়েছিলেন অমলা দাশ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বোন। তিনি এসে আমাদের ভাইবোনদের টেনে নিলেন তাঁর গানের দলে। লাল লজপৎ রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, লোকমাত্র তিলক, মালবীয়জী, আরো অনেক নেতা ও বক্তা বক্তৃতা দিলেন। লাল লজপৎ রায়ের বক্তৃতা খুব ভালো লাগল, যেমন ছিল তাঁর বলার ভঙ্গী তেমনি জোরালো তাঁর বক্তৃতা। দেশ তখন পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডে ব্যথায় কাতর, প্রতিহিংসার আগুন তা'র বুকে জ্বলছে অথচ পথ খুঁজে পাচ্ছে না। নেতাদের বক্তৃতায় এই দুই সুরই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। সব শুনেও মনে হচ্ছিল আসল কথাটা যেন বাকী থেকে গেল, কেউ যেন আসল কথাটা ধরতে পারছেন না, তাই বলতেও পারছেন না। ভিতরে বক্তৃতা চলেছে, এমন সময় বাইরে থেকে জয়ধ্বনির আওয়াজ কানে এল। ছোট্ট একটি মানুষ এসে ঢুকলেন, তুমুল জয়ধ্বনি ঠেলে দ্রুতপদে উঠলেন গিয়ে মঞ্চে, মিলিয়ে গেলেন নেতাদের ভিড়ে।

গান্ধীজিকে আমি প্রথম দেখি যখন স্কুলে পড়ি। স্কুলে একদিন শুনলুম গান্ধীজি কলকাতায় আসছেন সেদিন দুপুরে। কে তিনি, কী তিনি, কিছুই জানতুম না। সেই প্রথমবার শুনলুম যে আফ্রিকায় তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছেন। স্কুল থেকে পালিয়ে দুটি বন্ধু আমরা হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত। গান্ধীজি এলেন, ঘোড়া-গাড়ির ঘোড়া খুলে লোকেরা গাড়ি টানতে লাগল। আমরা দুটি বালক জুতো হাতে নিয়ে খালি পায়ে গাড়ির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এলুম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে। গান্ধীজি সমাজের ভিতরে ঢুকলেন আমরা দুজনে স্কুলে ফিরে গেলুম। সেটা যে কোন্ সাল তা আমার ঠিক

মনে নেই। তারপর বছর কেটে গেছে গান্ধীজির কথা একেবারে ভুলে গেছি। হঠাৎ তাঁর নাম বিদ্যুতের মতো ঝলক দিয়ে উঠল। কাগজে দেখলুম রাওলাট বিলের প্রতিবাদে তিনি পাঞ্জাব যাচ্ছিলেন, তাঁকে যেতে দেওয়া হয় নি, গ্রেপ্তার করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে গভর্নেন্ট। সমস্ত দেশ গর্জে উঠল, শহরে শহরে হরতাল, পাঞ্জাবে জনসাধারণের বিক্ষোভ আর ডায়ারী হত্যাকাণ্ড। তখন থেকে গান্ধীজির নাম শোনা যেতে লাগল, আফ্রিকায় তিনি যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালিয়েছিলেন তা'র ইতিহাস তখন ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল।

সেই কংগ্রেসে অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব আনলেন গান্ধীজি। তাঁর সেই বক্তৃতা কখনো ভুলব না। তাঁর আগে অনেক নেতার বক্তৃতা শুনেছিলুম, তাঁদের বক্তৃতার বাক-চাতুরী আর অনায়াস-গতি তারিফ না করে পারি নি, তবু তাঁদের বক্তৃতায় মন ভরে নি, কী যেন কী একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। গান্ধীজি বক্তৃতা শুরু করলেন। বক্তৃতার সুর উঠল না, নামল না। কোনো হাতনাড়া নেই কিংবা অঙ্গ-সঞ্চালন নেই। প্রাণের ভিতর থেকে কথা আসছে। প্রাণের সামনাসামনি হয়ে কথা যেন তার সমস্ত প্রগল্ভতা খুইয়ে বসেছে। কিন্তু সেই নিরাভরণ কথার কী আশ্চর্য শক্তি! সমস্ত শরীর থবুথবু ক'রে কাঁপতে লাগল। পাশের লোকদের দিকে তাকাতে সাহস হয় না, পাছে তা'রা আমার এই অবস্থা দেখে ফেলে। সে কী অসহ্য অসোয়াস্তি মনে! এত প্রবল সেই অসোয়াস্তি যে সেই বেদনা দৈহিক ব'লে মনে হতে লাগল। কিছু একটা করতে পারলে যেন বেঁচে যাই। গান্ধীজি ব'লে চলেন আর আগুনের হল্কার পর হল্কা এসে বুকে বিঁধতে লাগল। বক্তৃতা শেষ হবার পর যখন উঠল জয়ধ্বনি, আমি তখন সোজা বের হ'য়ে পড়লুম রাস্তায়, শুরু করলুম হাঁটতে। হন্থন্থ ক'রে রাস্তার পর রাস্তা হেঁটে চলেছি, মনের মধ্যে যে আগুন জালিয়ে দিলেন গান্ধীজি তার দাহ থেকে রক্ষা পেতে। বক্তৃতা শুনে এরকম অসহনীয় অবস্থা আমার আর-একবার হয়েছিল উনিশ শো আটশ সালে মস্কোতে ট্রটস্কির বক্তৃতা শুনে।

মনে আর কোন সংশয় রইল না। সেই দিনই স্থির করলুম যে রাজ-নৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কোথায় ভেসে গেল অক্সফোর্ড যাওয়ার কল্পনা! গান্ধীজির বক্তৃতায় সমস্ত জীবনের মোড় ঘুরে

গেল। অতীতের সব খেয়াল মন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে কোনো ক্ষোভ হল না, বরঞ্চ আবর্জনা সরে যেতে মন হাল্কা হয়ে গেল, ভরে গেল আনন্দে। নিজের দিক থেকে বাধা কিছুই রইল না বটে, বাড়ির নিষেধ কিন্তু যে কী প্রবল রূপ নেবে তা জানতুম বলে মনে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। আমাদের পরিবারের কেউ কোন দিন প্রত্যক্ষভাবে পলিটিকাল কর্মক্ষেত্রে নেমে আসেন নি। ভাবের রস দিয়ে, চিন্তার বীর্ষ দিয়ে তাঁরা স্বাদেশিকতাকে পুষ্ট করেছেন। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ দেশবাসীকে আমাদের সংস্কৃতির যথার্থ ঐশ্বর্য কোথায় রয়েছে সেটা তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন আর দেশের প্রতি যথার্থ ভালবাসা কাকে বলে সেটাও তাঁরাই দেশবাসীকে বুঝিয়েছেন। জাতির আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত করতে তাঁরা যা করেছেন তার সম্যক ধারণা এ দেশের লোকের এখনো নেই। তবুও পলিটিকাল কর্মী বলতে যা বোঝায় তা আমাদের পরিবারে কেউ কোনদিন ছিলেন না। আমার সিদ্ধান্ত যে তাঁদের কাছে কি রকম খাপছাড়া লাগবে তা আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম। তা ছাড়া আমার উপর আমার গুরুজনদের স্নেহের অন্ত ছিল না। সবাই অজস্র স্নেহ ঢেলে দিতেন আমার উপর। তাঁদের এই আশাও মনে ছিল যে বাড়ির ধারা হয়তো কিছুটা আমাকে দিয়ে বজায় থাকবে। আমার মনে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা ছিল আমার পিতার সম্বন্ধে। আমাকে তিনি প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতেন। জানতুম তিনি অসীম দুঃখ পাবেন আমার সিদ্ধান্ত শুনে, আর সেই দুঃখ সব নিজের ভিতরে টেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকে যেতেও দেবেন আমার পথে, তাও জানতুম। মনের মধ্যে তোলপাড় চলতে লাগল। নিজেকে তৈরি করে নিতে মনের ভিতরটা ক্ষতবিক্ষত করে ফেললুম। তারপরে একদিন দুপুরে তিনি স্বপ্নে বিশ্রাম করছিলেন তখন তাঁর কাছে গিয়ে আমার মনের সংকল্পের কথা সব খুলে বললুম। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, পরে বললেন—অন্য পথ দিয়ে কি দেশের কাজ করা যায় না? বললুম—যায় নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার পক্ষে এই পথই একমাত্র পথ। আমাকে যেতে দাও আমার পথে। আবার চুপ করে রইলেন, পরে বললেন—তোমাকে ধরে নিয়ে গেলে আমার পক্ষে মর্যাদাসিক হবে, আর কত দিনই বা আমার বাকী আছে, আমার মৃত্যুর পর তুমি ও পথে গেলেই তো পারতে? বুকের ভিতরটা

চৌচির হয়ে ফেটে যাচ্ছিল, তবুও উপায় ছিল না। বের হতেই হবে পথে আর চরম মূল্য না দিয়ে কি পথে বের হবার জো আছে? শেষ পর্যন্ত বললেন— তুমি আমাকে কথা দাও যে এখুনি এমন কিছু করবে না যাতে তোমাকে ধরে নিয়ে যায় আর কলেজের পড়া তুমি এখুনি বন্ধ করে দেবে না। তাঁকে কথা দিলুম যে জেলে যেতে হয় এমন কিছুই আমি করব না আর কলেজ ছাড়ব না। তা' ছাড়া কলেজ ছাড়ার নির্দেশে আমার মন সায় দেয় নি। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে কলেজ বন্ধ হয়ে গেলে গভর্নমেন্টের কী ক্ষতি হবে! বরাবরই তো শুনে আসছিলাম যে বিদেশী গভর্নমেন্ট যাতে আমাদের দেশে শিক্ষার প্রসার না হয়, তার জন্য বাধা দিয়ে এসেছে। আমরা কলেজ স্থল বয়কট করলে তাদের খুশি হওয়া ছাড়া অখুশি হবার তো কোন কারণ নেই। আমাদের কলেজে যখন কলেজ বয়কট নিয়ে মিটিং হল তখন আমি সেই বয়কটের বিরুদ্ধতা করে প্রস্তাব আনি। আমার প্রস্তাব ছিল এই যে আগে বহুসংখ্যক জাতীয় শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হোক তারপরে ছাত্রদের নির্দেশ দেওয়া হোক গভর্নমেন্টের অধীন শিক্ষাভবনগুলিকে বয়কট করতে। আমার প্রস্তাব গৃহীত হয় আর আমার সহপাঠী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, অধুনা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক, তাঁর প্রস্তাব যে কলেজ বয়কট করা হোক, পরাজিত হয়। তার কিছুকাল পরেই, ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে নিখিল-ভারত-ছাত্র-সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এর আগে নিখিল-ভারত-ছাত্র-সম্মেলন আর কখনো হয়নি। প্রেসিডেন্সি কলেজের তরফ থেকে নলিনাক্ষ সান্যাল আর আমি ডেলিগেট নির্বাচিত হই। আমাদের কনফারেন্সের সময়েই নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কলকাতা থেকে যে ট্রেনে আমরা নাগপুর যাই সেই ট্রেনেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙলা দেশের বহু ডেলিগেট নিয়ে নাগপুর যাচ্ছিলেন নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ নীতির বিরুদ্ধতা করবার জন্যে। কোথায় তলিয়ে গেল দেশবন্ধুর সেই বিরুদ্ধতার সংকল্প! তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলেন গান্ধীজির কাছে।

আমাদের ছাত্র-সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন লাল লজপৎ রায়। কনফারেন্সে বক্তৃতায় আমি বলি যে স্থল কলেজ ত্যাগ করা উচিত নয়। সর্বত্রই একই সময়ে ভিতর থেকে আর বাইরে থেকে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধতা

করতে হবে। আমার পরে বক্তৃতা দিলেন শ্রীমা নেহেরু— বিপ্লবী বাঙলার প্রতিনিধির মুখ থেকে এই রকম অ-বিপ্লবী কথা শুনে তিনি মর্মাহত হয়েছেন, বাঙালির মুখ থেকে এরকম বিপ্লব-বিরোধী কথা বের হবে এ তিনি কখনো আশা করেন নি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর অশেষ দুঃখের বোঝা প্লেষের রসে সিক্ত করে, আরো ভারী ক'রে আমার মাথায় চাপিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা। বেচারী বাঙালি সম্ভানের তখন যা অবস্থা !

উনিশ শো উনিশ সাল শেষ হ'য়ে এল। ডিসেম্বর মাস, উত্তরে হাওয়ার দৌরাণ্যে আমাদের বাগানে শিশু গাছ, চাঁপাগাছ সব পাতা খুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিগন্তর সন্ধ্যাসী সেজে। রজনীগন্ধা আর গাঁদাফুলের রেবারেধি চলেছে বাগানে কে কত ফুল ফোটাতে পারে। শিউলি গাছে ছ-চারটে শিউলি কি জানি কি মনে করে তখনো এসে হাজির হচ্ছে মাঝে মাঝে। এমন সময় উঠল ঝড়, আকাশ-পাতাল-তোলপাড় করা ঝড়। বাইরে নয় কিন্তু— আমার অন্তরে।

কৈশোরের গোধূলি তখন সবে মাত্র বিলীন হচ্ছে যৌবনের স্বপ্নময়ী নিশীথিনীতে। সে এক আশ্চর্য সময়। রক্তের মোঁমাছি স্বপ্নের মোঁচাক বেঁধেছে বৃকে, হল ফুটোচ্ছে পাঁজরাগুলোতে, প্রিয়ার স্বপ্নের মধু ঢালছে আমার শিরায় শিরায়। কৈশোর-যৌবনের গোধূলি-রাত্রির ধূপছায়া রঙে রাক্ষা সেই প্রিয়ার কি তুলনা আছে? সে প্রিয়া এই পৃথিবীর হয়েও এই পৃথিবীর নয়, নাম জানি নে তার, সে আমার অনামিকা প্রিয়া। জীবনের একটা পরমাশ্চর্য ক্ষণে পুরুষের বৃকে এই প্রিয়ার পরশ লাগে। রক্তের মোঁমাছি গুন্ গুন্ করে তার কথা বলে চলে পাঁজরের তলায় মনের কানে কানে। যৌবনের উষার সেই অনামিকা প্রিয়া "কোনো বিশেষ নারীর রূপ নিয়ে মনের আয়নায় তার ছায়া ফেলে না, তার রূপের অপূর্ণ আভাস নানা মানবীর মুখে নানা ক্ষণে দেখা যায়। কারো হাসিতে, কারো কালো ভুরুর মেঘের তলে চাহনির বিদ্যৎ-ঝলকে, কারো কচি ধানের শীষের মতো নমনীয় দেহভঙ্গিতে সেই অনামিকা প্রিয়ার রূপের খন্দ ও চকিত আভাস ধরা পড়ে। রক্তের মোঁমাছি তখন আনন্দবেদনায় বেপরোয়া হয়ে হল ফুটাতে থাকে পুরুষের বৃকে।

আমি যে বাড়ির আবহাওয়ায় মানুষ সেখানে রসবোধের অভাব বুটো

বৈরাগ্যের তলায় আত্মগোপন করে সাধুগিরির ঢঙ করে আত্মপ্রবঞ্চনা করে নি। ক্ষীণজীবীদের বৈরাগ্য-বিলাস এ-বাড়ির মানুষেরা মানতেন না। দেহে এবং মনে ছিল এঁদের প্রচণ্ড শক্তি, বিচারবুদ্ধি ছিল তরোয়ালের মতো ধারালো, রস-বোধ ছিল অনুপমেয়। রস-বোধের দৈন্ত্যকে বৈরাগ্যের গেকুয়া পরিয়ে আধ্যাত্মিক সাজাবার চেষ্টা এঁরা কখনো করেন নি। অথচ এই রস-বোধই করেছিল এঁদের সত্যিকার বৈরাগী। রসের গভীরতা ও শুচিতাবোধ ছিল এঁদের অসামান্য, সংযম ছিল এঁদের সেই রস-বোধের সহজ অভিব্যক্তি। অসংযমের দ্বারা রসকে ঘেঁটে তার তলানি নিয়ে ভাবুনেগিরি করা আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ির ধারা ছিল না। আমি সেই আবহাওয়ায় মানুষ। রসকে আমার মন কখনো অস্বীকার করে নি। সবল শরীর ও সহজ মন দিয়ে আমি গ্রহণ করেছি সব রসানুভূতিকে। রক্ত যখন প্রিয়ার স্বপ্নের আলপনা এঁকেছে মনে, তখন আনন্দে ভরে গেছে বুক। কবিতা দিয়ে, গান দিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে আমার সেই মানসী প্রিয়ার মন ভোলাবার জন্তে কত না চেষ্টা করেছি সেদিন।

কৈশোরের প্রদোষ তখন সবে বিলীন হয়েছে যৌবনের প্রথম আলোকে, এমন সময় মানসী প্রিয়ার অ-ধরা রূপের ছায়া দেখলুম এক মানবীতে। স্বপ্নের খেয়া, রসের নায় এসে ঠেকল বাস্তবের ঘাটে, রূপের কূলে। শীতের দিন, হিমের রাত্রি মনের কাণ্ডনের রঙে রাঙা হয়ে উঠল। হৃদয়ের বালির চর ডুবে গেল অনুরাগের জোয়ারে। নারীর দেহ ও মনের সংস্পর্শ পেল আমার দেহ ও মন সেই প্রথম। সেই প্রথম মিলনের বিস্ময় ও আনন্দের তুলনা নেই ত্রিভুবনে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অসীম শূন্যে নিঃসঙ্গ তারা ঘুরতে ঘুরতে যখন একদিন আর-একটি তারার কাছে এসে পড়ে তখন পরস্পরের প্রবল আকর্ষণে তারা কক্ষচ্যুত হয়ে ধাক্কা খায়, জলে উঠে উক্কা হয়ে ঝরে পড়ে আকাশ থেকে। তেমনি করে নিঃসঙ্গ আমার জীবন চলতে চলতে যখন অকস্মাৎ একদিন একটি মানবীর সাক্ষাৎ পেল যাতে সেই প্রথম যৌবনের ভোরের আলোতে মানসী প্রিয়ার রূপ দেখতে পেল মন, তখন জলে উঠল আমার দেহমন। কোন বাধাই মানলো না মন সেদিন। ঘরের ও বাইরের প্রবল আপত্তি উজাড় হয়ে গেল অন্তরের সেই বিস্ময় ও আনন্দের কাছে। কাছের লোকেরা বিস্মিত হলেন, হুঃখ পেলেন। আমার

উপরে এঁদের স্নেহের অন্ত ছিল না। তাঁরা আমার আবেগের প্রাবল্যকে বুঝতে পারলেন না। তাঁদের প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার এই কুল-ডোবানো আবেগের জোয়ার ক্ষণিকের মোহ বলে ঠেকল। তাঁরা প্রাণপণ করতে লাগলেন যে অনুরক্তিকে তাঁরা মোহ ভাবছিলেন সেই মোহের কলুষ থেকে আমাকে বাঁচাতে। আমার মনপ্রাণ তখন ডুবেছে। কুল অকুল দুই পেয়েছে মন রসের আনন্দে, আর কিছুই বাকী নেই তখন নিজের। ফিরব কোথা থেকে? ঈঙ্গ-বঙ্গ সমাজের হাটের লোকেরা খুশি হল। আমাদের বাড়ির উপর তাদের চিরকেলে ঈর্ষার রসদ জোগালো আমার আচরণ। নিন্দার শিলাবৃষ্টি নেমে এল আমাদের মাথার উপর। এই হাটের লোকদের মতামতের উপর আমার আজও কোনো শ্রদ্ধা নেই, সেদিনও ছিল না। জিভের পিচকারী দিয়ে তারা যে কুৎসা ছিটাল তার বেশির ভাগটা তাদেরই গায়ে পড়ল। আমি তখন জলে উঠেছি দেহে ও মনে, সে আগুন তখন এদের দুর্বল পশু জিভের পিচকারী-নির্গত কুৎসার কাদাজল দিয়ে নিবোনো একেবারেই সম্ভব ছিল না। বাড়িতে আবহাওয়াটা তখন থম্‌থমে হয়ে উঠেছে আমাকে ঘিরে। সেইটেই ছিল আমার পক্ষে অসহ্য। ভিতরটা হচ্ছিল ক্ষতবিক্ষত, বাইরে ছিল আমার জিদের বেপরোয়া ঠাট। বংশমর্যাদা সমাজ এই-সব দানবের ভয়ে ভীত আমার বাড়ির লোকেরা আমার ভালোবাসাকে মোহ বলে প্রমাণ করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগে গেলেন। কাছের লোক বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ চিনতে পারে না আর সত্যি করে তারা ব্যক্তির আপনার লোকও নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রক্তের সম্বন্ধ যার সঙ্গে সে আত্মিক অনাত্মীয়। নারী-মাংস-লোলুপতা আমার স্বভাববিরুদ্ধ, যেমন নারীকে দেবী বানিয়ে তাকে পূজা করার অভিনয় আমার রস-বোধের শালীনতায় বাধে। দেহকে মন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার নামই হল কুলটাবৃত্তি। এই কুলটা মনোবৃত্তির উপর আমার মনের স্বাভাবিক বিরাগ চিরদিন। অথচ নারী মাত্রকেই শুধু মন বলে দেখতে হবে, ঝুটো বৈরাগ্যের এই রস-বিবর্জিত বস্তুহীন হিতোপদেশ চিরদিনই আমার কাছে অত্যন্ত খেলো বলে ঠেকেছে। দেহকে মনের স্বরে বেঁধে নিতে হবে, মনকে দেহের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পুরুষ যেখানে প্রেমিক, নারী যেখানে প্রিয়া সেখানে দেহ ও মনকে প্রেমের

আলোতে এক, অথও, অদ্বৈতরূপে দেখাতেই রসবোধের চরম সার্থকতা। মানুষ যখন ভালোবাসে তখন দেখেও তাই। সেদিন আমি সেই চরম সার্থকতার সন্ধান পেয়েছিলুম, তাই আমার মনে কোনো কুণ্ঠা ছিল না। তবু একদিন আমাকে হার মানতে হল। হার মানতে হল মনের অনাত্মীয় কাছের লোকদের কাছে। তাই-বা বলি কেন? হার মানলুম নিজের দুর্বলতার কাছে, নিজের কাপুরুষতার কালি দিয়ে ভালোবাসার মুখে কালি দিলুম। বুকের মধ্যে সেদিন কী তোলপাড়, পাগলা চেউয়ের কী মাতামাতি! পঁজরগুলো হয়ে গেল বেদনার চেউয়ের ঘায়ে, নিজেকে ধিক্কার দিলুম। ভালোবাসার মান আমি রাখতে পারি নি। ভালোবাসার কাছে ক্ষমা চাইলুম আমার দুর্বলতার জন্যে, আমার অক্ষমতার চেউয়ে আমিই সরিয়ে দিলুম তাকে যে আমার জীবনে প্রথম প্রেমের আলো। জীবন আমার ভরপুর আলো থেকে ঘন অন্ধকারের মধ্যে এসে থমকে দাঁড়াল। বুকের সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে আমার জীবন মুখ গুঁজে পড়ে রইল। আমার জীবনের সমস্ত গতি সেদিন স্তব্ধ, প্রাণের সমস্ত অনুভূতি অসাড় হয় গেল ঘন বেদনায়। মাঝ নদীতে হঠাৎ ঝড় ওঠে এক-এক দিন, তখন সোনার আলোতে ভরপুর চেউয়ের রঙ, তরঙ্গের ললিত ভঙ্গি সব বদল হয়ে যায় অকস্মাৎ। ঝড়ের ঝাঁকুনি আর চেউয়ের ক্রুদ্ধ আঘাতে নৌকো ক্ষতবিক্ষত হয়, তার পাল ভেঙে পড়ে, দাঁড় যায় ভেসে, হাল হয় অচল। নৌকোটিকে নাজেহাল করে, নাস্তানাবুদ করে ঝড় ঠেলতে ঠেলতে একদিন তীরের পাশে পৌঁছে দিয়ে সরে পড়ে কোতুকভরে। নৌকো টেরই পায় না সে কোথায় এসে পৌঁছেছে। তীব্র ব্যথায় অসাড় আমার জীবনের অবস্থা সেদিন এই হাল-ভাঙা, ঝড়ের ঝাপটা-খাওয়া নৌকোরই মতো। কখন সে ঝড় ধাক্কা দিতে দিতে আমাকে তীরের কাছে এনেছে, তার কোনো চেতনা সেদিন ছিল না আমার। নিজের উপর ধিক্কারের গ্লানিতে, লজ্জাতে, ব্যথাতে জীবন তখন একেবারে অসাড়, নিঃশ্বাস। কখন জানি না ব্যথার আঁধারে ঘুরপাক খেতে খেতে অন্ধ জীবন-তরী তীরের কাছে এসে পড়েছিল নিজের অজানিতে। সে তীর যে কোন্ তীর সেটা বোঝবার মতো অবস্থাও ছিল না তখন আমার মনের। অসহ ব্যথার অসাড়-করা বন্ধন থেকে মন যখন ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল তখন তীরের দিকে দৃষ্টি পড়ল, তীরটাকে চিনতে

পারলুম। দেখলুম আমার বেদনার ঝোড়ো হাওয়া আমাকে সকল মানুষের বেদনার তীরে পৌঁছে দিয়েছে। যখন ব্যথা বুকুর ভিতরে ঝরনার মুখ-আটকানো পাথর সরিয়ে দিল তখন মানুষের উপর আমার প্রাণের সহজ দরদ উপচে পড়ল শতধারে। প্রাণের বন্ধ তাল। যখন খুলে দিল গভীর বেদনা, তখন দেখলুম মানুষের উপর পরম বিশ্বাসের মানিক জ্বলছে প্রাণের সেই মনি-কুঠরীতে। ব্যথা আমাকে অবিশ্বাসী করে নি মানুষের সম্বন্ধে। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানোর পাপ থেকে, অবিশ্বাসের অপমৃত্যু থেকে আমার ব্যথা আমাকে বাঁচিয়েছিল। দরদ ও বিশ্বাসের তীরে আমাকে পৌঁছে দিয়ে ব্যথার ঝড় দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

তীরে সবে এসে উঠেছি এমন সময় ভারতবর্ষের আকাশে ঝড়ের ঢেউ তুলে এলেন গান্ধীজি। এ ঝড়ও নিছক বাইরের আকাশের ঝড় ছিল না, অন্তত আমার মনের কাছে দেখা দেয় নি এই ঝড় সেই রূপে। এ ঝড় আমাকে নিজের বাইরে বেরিয়ে আসবার পথ দেখালো। মানুষের উপর দরদ শুধু ভাবরসের সামগ্রী করে না রেখে, কেমন করে নিরলস কর্মের দ্বারা তাকে শুদ্ধ করে নিতে হয়, তাকে বিকশিত করতে হয় প্রতিদিনকার জীবনে সেই বিশ্বয়কর চেতনা গান্ধীজি পৌঁছে দিলেন আমার প্রাণের সেই কুঠরীতে যে কুঠরীর বন্ধ দরজার তাল। ব্যথার আঘাতে সবেমাত্র ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। বিরাট বেদনাবোধের স্রোত বইয়ে দিলেন প্রাণের মধ্যে গান্ধীজি। যে ব্যথা শুধু একান্ত আমার, তার উপর দিয়ে বয়ে গেল সেই স্রোত। আমার ব্যথাকে এই বিরাট বেদনাবোধের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে আমি বাঁচলুম।

নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের ডাক হিসেবে গান্ধীজির ডাক সেদিন আমার প্রাণে এসে পৌঁছয় নি। আমার প্রাণের ঘুমনো স্বরগুলোকে জাগিয়ে দিয়েছিল গান্ধীজির ডাক। তাই আমার প্রাণ এমন সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করেছিল তাঁর ডাকের কাছে। নিছক রাজনৈতিক ডাকের কাছে আমি কখনো আত্মসমর্পণ করতে পারতুম না। যাকে রাজনৈতিক লোক বলে মূলতঃ আমি তা নই। পরে যখন রাজনীতির আসরে কোমর বেঁধে নেমে এসেছি তখন নানা ঘটনা আমার কান মলে বার বার আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে যে আসলে আমি রাজনৈতিক লোক নই। রাজনৈতিক চালবাজীতে

ওস্তাদ বহু লোকের কাছে আমি বহুবার ঠকেছি। তারা খুশি হয়েছে ভেবে—কেমন হার হোল ওর আমাদের কাছে! কিন্তু আমি এদের কাছে হারি নি কখনো। হার শুধু নিজের দুর্বলতার কাছে ঘটে, আদর্শের তপস্কার তাল কাটলেই হার আর হার নেই। আদর্শের তপস্কার তপোভঙ্গ করে ক্ষুদ্র লোভের অপসরা। আমার মধ্যেও ছোটো লোভ আছে নানা বিষয়ে, কিন্তু এক জায়গায় আমি খাঁটি। আমি যে আদর্শকে আমার জীবনের কেন্দ্রে বসিয়েছি, তার কাছে আমি কখনো সত্যভঙ্গ করি নি। কোন ব্যক্তিগত লোভ ক্ষণিকের জন্তেও তার কলুষ নিশ্বাসের ছোঁয়ায় আমার আদর্শকে অশুচি করে নি, ম্লান করে নি। আর এই জায়গায় আমার জীবনে মহাত্মাজীর দান অসীম। তাঁর টানের মতো এমন প্রবল, একনিষ্ঠ, নির্লোভ, সমগ্র-জীবনছোঁয়া টান না এলে যাকে অল্পবুদ্ধি লোকেরা ভুল করে রাজনৈতিক পথ বলে থাকে সেই পথে এসে আমি দাঁড়াতুম কি না আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আগেই বলেছি যে যাকে রাজনৈতিক ব্যক্তি বলা চলে সে লোক আমি নই। সাময়িক সাফল্যের অপদেবতার পায়ে আমার আদর্শকে বলি দিতে আমি কখনও রাজী হই নি। রাজনীতির হাতে চোরাকারবারীর অন্ত নেই। বুদ্ধিমান লোকেরা রাজনৈতিক চোরাকারবারের তারিফও করে থাকে। রাজনীতির চোরাকারবারীদের হাতে জীবনে বার বার নাস্তানাবুদ হয়েছে, প্রবঞ্চিত হয়েছে। এদের হাতে আসর জমাতে গেলে যে বুদ্ধির প্রয়োজন সেই পাটোয়ারী বুদ্ধি আমার নেই এটা স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই। অনেকদিন থেকেই রাজনৈতিক চোরাকারবারীরা যে আমাকে অবজ্ঞা-মেশানো করুণার চোখে দেখে থাকে তাও আমি জানি। তবু আমি নিরুপায়। যে বাড়িতে আমি জন্মেছিলুম সেখানে এমন সব লোক আমি দেখেছি আর তাঁরা তাঁদের জীবনের ছোঁওয়া দিয়ে এমন করে আমার মনের তার বেঁধে দিয়েছেন যে তার সুর নামিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই পাটোয়ারী বুদ্ধির প্রয়োগ করা আমার সাধ্যের বাইরে। তাই জার্মান ভাষায় যাকে বলে ‘রিয়াল পলিটিকার’ অর্থাৎ কিনা বাস্তব রাজনীতির পাটোয়ারী, তা আমি কখনো হয়ে উঠতে পারলুম না।

মহাত্মাজীর ডাক এল। তাঁর ডাকের আলোয় দেশের বুক-জোড়া অন্ধকার কেঁপে উঠল আলো ফুটে উঠতে লাগল যেখানে আগে

নিশ্চিন্তে থিতিয়ে ছিল অন্ধকার। তাঁর ডাকেতে কোটি কোটি লোকের অনাহার, নিষ্পেষণ ও অপমানের দুঃখ ধ্বনিত হল আর বেজে উঠল তারই সঙ্গে সেই অনাহার আর অপমান দূর করবার আশার সুর। মানুষের সমস্ত জীবনটা, গোটা মানুষটাকে ধরে নাড়া দিলেন মহাত্মাজী। কী সহজ ও গভীর সেই আবেদন! এমন সহজ ও শক্তিমান ভাষায় কোটি কোটি লোকের প্রাণের কথা গান্ধীজির আগে এ দেশের কোনো নেতা কোনোদিনও বলেন নি। তাঁদের কথা শুনলে কিংবা পড়লে মনে হত যে কথাগুলো যেন আকাশ থেকে ঝুলে রয়েছে, আসমানের ফুল তারা, মাটির সঙ্গে কোনোই সংস্ক নেই যেন তাদের। এই নেতাদের সঙ্গে মাটির সংস্ক সত্যিকারে ছিলও না কোনো দিন, তাই তাঁদের কথায় মাটির গন্ধ আসবে কোথা থেকে? ভারতবর্ষের মাটির গন্ধে ভরপুর গান্ধীজির কথা ও লেখা আমার প্রাণ ভরে দিল তার সুরবাসে। ছোট বেলায় আমি অনেকবার কংগ্রেসের অধিবেশনে গেছি। সেখানে সাজানো মণ্ডপে ইংরাজীতে বক্তৃতা হত। বক্তৃতার পরে মণ্ডপের বাইরে পেলিটির রেস্টোরাঁয় চা-কেকের সন্ধানে নেতারা দৌড়তেন, আমরাও দৌড়তুম। সবটাই যেন ড্রইংরুমের মজলিশ বলে মনে হত। দেশের ধারণা তখন সত্যিকারে কিছুই ছিল না আমার। ইংরেজ-বিদ্বেষ, দু-চারটে স্বদেশী গান, রাথী-বন্ধন, টেরারিস্ট কর্মীদের সংস্কে রোমাঞ্চকর গল্প—এই ছিল আমার পুঁজি দেশ-প্ৰীতির ঝোলায়।

এলেন গান্ধীজি, এক নিমেষে সব বদল হয়ে গেল। দেশের লোক যথার্থ কারা, কোথায় কাদের মধ্যে দেশের সত্যিকার শক্তি ঘুমিয়ে আছে, কেমন করে তাদের শক্তি জাগ্রত করে দেশ স্বাধীন করবার কাজে লাগানো যায় এ সব আমাদের দেখালেন আর শেখালেন গান্ধীজি। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের বাস্তবতা-বিবর্জিত নিষ্ফল বক্তৃতার নাগপাশ থেকে স্বাধীনতা-আন্দোলনকে মুক্ত করলেন গান্ধীজি। গণ-সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন সমস্ত দেশ জুড়ে শোনা গেল। স্বাধীনতা-আন্দোলন মধ্যবিত্তদের রাজনৈতিক খিড়কির পুকুরে ঞ্চাঙলার মতো ভাসছিল এত দিন। এবারে গণ-আন্দোলনের ঢেউয়ের সোয়ারি করে এগিয়ে চলল আন্দোলন। কোথায় ভেসে গেল মধ্যবিত্তদের সেই খিড়কির পুকুরের রাজনীতি! এই খিড়কির পুকুরের বন্ধ জলের টানে

আমি স্বাধীনতা-আন্দোলনে আসি নি। আমি এসেছি গণ-সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রবল টানে।

আমার মতো কত তরুণের মনের আয়নায় ভারতবর্ষকে প্রতিবিম্বিত করলেন যে সেদিন গান্ধীজি তার ইয়ত্তা নেই। সেই প্রথম ভারতবর্ষকে চিনতে শুরু করলুম। বিলাসী বাবুদের ড্রইংরুমের ভারতবর্ষ এ নয়। লক্ষ লক্ষ কুঁড়ে ঘরে, বস্তিতে যে ভারতবর্ষ অনাহারে, উপবাসে, বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন হয়ে দিন যাপন করছে সেই ভারতবর্ষ আমার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। বুকের মধ্যে ভূমিকম্প হয়ে গেল। গান্ধীজি যে কী গভীর ও প্রবল বিপ্লব ঘটালেন সেদিন আমার জীবনে তা বলে শেষ করা যায় না। ভারতবর্ষের গণ-আন্দোলনের পথ-প্রদর্শক ও স্রষ্টা হলেন গান্ধীজি।

কলেজে আমরা ক'টি বন্ধু স্থির করেছিলুম আমাদের পথ। বন্ধু চপলাকান্ত ভট্টাচার্য কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দেবার সংকল্প করেছিলেন, তিনি করলেনও তাই। আমি আরও কয়েকমাস কলেজে থেকে গেলুম। বিদ্যালয়-বর্জন নীতি আমি যে গ্রহণ করতে পারি নি সে কথা আগেই বলেছি। চপলার সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল সেদিন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সে প্রায়ই আসতো আমিও যেতুম তার বাড়িতে। শ্যামবাজারে খালের ধারে বসে দুই বন্ধুতে অনেক জল্পনা কল্পনা করেছি। 'দেশ' নাম দিয়ে একটি সাপ্তাহিক কাগজ বের করবার কল্পনাও আমরা করেছিলুম সেই সময়। ত্রিশ বৎসর আগের তার সেই বুদ্ধি-দীপ্ত তেজস্বী ও প্রশান্ত চেহারা আজও আমার মনে আছে। পরবর্তী কালে চপলা হোলো হিন্দু মহাসভার সমর্থক আর আমি হলুম কমিউনিস্ট। আমার পথ সরে গেল তার পথ থেকে। তবু তার প্রাণের দীপ্তি স্নান হয়ে যায় নি তখনো। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বর্তমান সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের মধ্যে সেদিনকার সেই তেজস্বী তরুণের এতটুকুও রেশ নেই, সেই বন্ধু নিঃশেষে হারিয়ে গেছে।

চলবার পথ স্থির করে নিলুম কিন্তু তখনো ভিতরের সঙ্গে বাইরের দ্বন্দ্ব মেটাতে পারি নি। ভিতর ও বাইরের ছন্দ এক না করতে পারলে চলা যায় না। তা ছাড়া ভিতর আর বাইরে বলে দুটো আলাদা জিনিষ আছে কি?

একদিন ঝড়ের খড়গ দিয়ে নিজের বুক চিরে ছ'খানা করে দিলুম, ছুঁড়ে ফেলে দিলুম আমার সন্তার অত্যন্ত প্রবল একটি অংশকে অতীতের

অন্ধকারে ! এমনিকরে মেটালুম সেদিন আমার বাইরের সঙ্গে আমার ভিতরের
 দ্বন্দ্ব । আমার পক্ষে এটা বড়ো সোজা ছিল না । আটপৌরে আবহাওয়ায়
 আমার জীবন বিকশিত হয় নি । জীবন দিয়ে, সাধনা দিয়ে বিরাট মানুষেরা
 যে আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন জোড়াসাঁকো বাড়িতে এক শতাব্দী ধরে,
 তাঁদের তৈরি সেই আলো-বাতাসের বুকে আমার জীবন মেলে দিয়েছিল
 তার দলগুলি । সেই অমিত-শক্তিশালী মানুষগুলি যে সুরে আমাদের
 পারিবারিক জীবনের সুরের পর্দা বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই সুরের ফাঁক-
 তালে আমার জীবনের চলার ছন্দ ফেলা যে কী শক্ত ছিল তা যারা এমন
 বিশ্ববিজয়িনী শক্তির সম্মুখীন হয় নি কোনোদিন তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব
 নয় । এস্‌থেটিক অনুভূতির সে এক আশ্চর্য গভীর, সীমাহীন আকাশ এই
 রসোপলব্ধির সাধকেরা রচনা করে রেখেছিলেন আমাদের জীবন ঘিরে ।
 বাড়ির বায়ুমণ্ডল ছিল ভাবের রসে মগ্ন, ভাবের গন্ধে উন্মন । সেই প্রবল,
 গভীর এস্‌থেটিক আবেষ্টনীর বিরুদ্ধে আমি ঘোষণা করলুম আমার বিদ্রোহ ।

মন অবিশ্রান্ত এই প্রশ্ন করে চলল—কোথায় আলো, কোথায় সৌন্দর্য,
 কোথায় রঙ, কোথায় রূপ ? জীবনের কেন্দ্রে ঘন অন্ধকার । অত্যাচার ও
 নিপীড়নের বিষে মানুষের জীবন কালো, চোখের জলের আগুনে মানুষের
 জীবনের সব রঙ গেছে পুড়ে, জীবন হয়েছে পোড়া মাটি । জোড়াসাঁকো
 বাড়ির শাস্ত ভাব-ঘন আবহাওয়ার বাইরে যেজীবনের ধারে মহাত্মাজীর
 ডাক আমাকে পৌঁছে দিল সেই জীবনের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আমার মন
 কৈপে উঠল, তার ভয়ংকর ও অসহ প্রকাশ স্তম্ভিত করল আমার মনকে,
 সৌন্দর্যের কথা উচ্চারণ করতেও লজ্জা বোধ হল । হায় রে সৌন্দর্য !
 জীবনের কেন্দ্রে অমারাত্মির নিবিড় অন্ধকার বিছানো, লোভ আর হিংসার
 পাঁকের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের বুক থেকে, জীবনকে করছে দুঃসহ ।

মানুষের জীবনের কেন্দ্রেই যখন এই অমাবস্থা, তখন কোথায় আলো,
 কোথায় রঙ ? অথচ কী আলোই না জ্বলতে পারে জীবনের প্রদীপে রক্তের
 পলতেতে, কী অফুরন্ত রঙ না ঝরতে পারে পাজরের তলায় মনের ঝরনা
 থেকে ! জীবনের অন্ধকার খোলা চোখে দেখার বীর্য ভাব-বিলাসী
 এস্‌থেটদের নেই । তাই এড়িয়ে যায় তারা এই অন্ধকারকে, বলে শাস্ত
 আলোর পূজারী তারা, কনিকের এই অন্ধকারের দিকে তারা চোখ

দেবে কেন? জীবনের কেন্দ্রে অন্ধকারকে বাঁচিয়ে রেখে যারা আকাশের নীল আর মাঠের সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকে আর সকলের দৃষ্টি সেই দিকে টেনে নিয়ে চলে তারা শাস্ত্রত আলোর স্তবগান মুখে যতই করুক-না কেন, তারা আসলে আলোর পূজারী নয়, তারা অন্ধকার-রাক্ষসীর সেবায়ের দল। মানুষের জীবন, তার প্রাণের আলো, রঙ সব এই রাক্ষসীর ভোগ দিয়ে আসছে তারা যুগযুগান্ত ধরে আর ভোলাচ্ছে মানুষকে প্রকৃতির রূপ দিয়ে। এই অন্ধকার-রাক্ষসীর থাবার তলায় মানুষের বৃকের মধ্যে যে নীল, যে সবুজ চাপা পড়ে আছে, গুমরে মরছে, তার তুলনায় আকাশের নীল আর মাঠের সবুজ কতটুকু? আকাশের সব নীল, মাঠের সব সবুজ দেউলে হয়ে যাবে মানুষের বৃকের নীল-সবুজের সঙ্গে পাল্লা দিতে। মানুষের বৃকের নীল আর সবুজ যতদিন পাথর-রাক্ষসীর তলায় চাপা পড়ে থাকবে ততদিন প্রকৃতির রঙ ও রূপের দিকে মানুষের মনকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে সর্বনাশী খেলা এস্‌থেটরা করে থাকেন সে খেলা অন্ধকার বজায় রাখবার খেলা। মানুষের বৃকে বন্দী আলোর মুক্তির শত্রু হচ্ছে এস্‌থেটিক ভাব-বিলাসের এই খেলা।

জোড়াসাঁকো বাড়ির এস্‌থেটিক দুর্গের রস-ঘন আবহাওয়ার বৃক চিরে আমার মন তখন বিদ্রোহের পতাকা তুলল। বাড়ির পুর্বের প্রাচীরের গায়েই সিংহীবাগানের বস্তি। বস্তিতে শত শত লোকের বাস। দক্ষিণের বারাণ্ডা আর ছাদ থেকে বস্তির মাটির বাড়িগুলো চোখে পড়ে। বস্তির বাসিন্দা মেয়ে-পুরুষ-শিশুরা আমাদের বাড়ির পাঁচিলের গায়ের সরু রাস্তা দিয়ে ঘোরাফেরা করে, রাস্তার ধারেই তারা বসে। বাতাস যেখানে পথ ভুলেও কখনো যায় না সেই অন্ধকার, সঁাতসঁতে কুঠরিগুলোতে তারা পিপড়ের সারির মতো গিয়ে ঢোকে যতটুকু আলোবাতাস পথের ধার থেকে কুড়িয়ে নিতে পারে তাই কুড়িয়ে বৃকের মধ্যে পুরে নিয়ে। দিনের পর দিন বছরের পর বছর তাদের দেখেছি, তবুও জোড়াসাঁকো বাড়ীর এস্‌থেটিক-কুয়াসা ভেদ করে এই মানুষগুলো আমাদের কাছে মানুষ হিসাবে কখনো দেখা দেয় নি। তারা যেন আমাদের এই পৃথিবীর মানুষই নয়, তাদের সম্বন্ধে একটা কোঁতুহল ছিল হয়তো, কিন্তু সে কোঁতুহল ছিল এক অজানা জগতের অচেনা জীবদের সম্বন্ধে মানুষের যে কোঁতুহল থাকে সেই কোঁতুহল। তাদের

স্বথঃ হানিকার সঙ্গ আমাদের বাড়ির কোনো যোগ ছিল না। তারা আমাদের রস-সৃষ্টির, সাহিত্য-সৃষ্টির মালমশলা মাত্র, তুরি জোগান দিতে পারাতেই তাদের জীবনের চরম সার্থকতা, তার বেশী তারা আর কিছু নয়। মানুষকে শুধু ভাব-রসের মালমশলার যোগানদার হিসেবে দেখাটাই হোলো এস্‌থেটিক দৃষ্টিভঙ্গির মর্মকথা আর এই দৃষ্টিভঙ্গি হল কাপুরুষ স্বার্থপর লোভীর দৃষ্টিভঙ্গি। ভাব-রসের সামগ্রী করে মানুষকে কেমন করে পাকে নামিয়ে আনা যায় বৈষ্ণব রসবাদ তা প্রমাণ করেছে, আর শুধু ভাব-রস জোগাবার উপাদান, কলা-সৃষ্টির উপাদান হিসাবে গণ্য করে অত্যাচার-উৎপীড়নের অন্ধকারের মধ্যে ডুবে থাকা মানুষের দুঃখটাকে কেমন করে এড়িয়ে যাওয়া যায় তার প্রমাণ দিয়েছে ভাব-বিলাসী এস্‌থেটরা। এস্‌থেটিক দৃষ্টিভঙ্গির এই আত্ম-কেন্দ্রিক ভোগলোলুপতা, ক্লীবত্ব ও নির্বীৰ্যতার বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহের ফণা তুলে গর্জে উঠল। গান, কবিতা, রস-বিহ্বলতা সব অসহ বোধ হল। বাড়ির ভাব-বিভোল আবহাওয়া যে শুধু অসহ মনে হল তা নয়, লজ্জা দিতে লাগল আমাকে। রসের মক্ষিরানীকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনের মোঁচাক তো এতকাল ধরে রচনা হল, গান, কবিতা, কলার মধু দিয়ে তো জীবনের মোঁচাক ভরা হয়েছে যুগে যুগে, তাতে কি মানুষের উপর অত্যাচার, ভোগীর হিংসা, ধনীর হিংস্র পাশবিকতা গরিবের উপর বিন্দুমাত্র হ্রাস পেয়েছে? যারা এই ভাব-রসের সাধক তারা কি ভোগ-লোলুপতা, মানুষকে শোষণ করবার পশু-প্রবৃত্তি ও হিংসা ত্যাগ করেছে? আদবেই ত্যাগ করেনি, শুধু রসের তুলি দিয়ে রূপের আল্পনা এঁকে এরা নিজেদের জীবনের পাককে গোপন করেছে, ঠিক যেমন করে মুখের পাককে রুজ লিপ্‌স্টিক দিয়ে নিকিয়ে সহজাত কুরূপতাকে ঢাকা দেয় আধুনিকারা। উভয় ক্ষেত্রেই এটা ছলনা ছাড়া কিছু নয়। রস-সাধনার-সাধকদের সাধনার উদ্দেশ্য যে রসই, মানুষ নয় এটা আমি যেদিন উপলব্ধি করলুম সেদিন আমার মনের অশ্রান্ত প্রশ্নের জবাব পেলুম। নিজের ভিতর-বাইরে সবটাকে নতুন করে সাজাবার কাজে উঠে পড়ে লেগে গেলুম। মিহি চিকণ বেশ করলুম বদল। মোটা খন্দের ধুতি, খালি গায়ে খন্দের চাদর, এই হল আমার বেশ। পা দুটিকে জুতোর শৃঙ্খল থেকে দিলুম মুক্তি, ফিরতে লাগলুম খালি পায়ে কলকাতা শহরের ধূলা-সমুদ্র মন্থন করে। মুখের উপর বিদ্রোহের

পতাকা উড়িয়ে দিলুম দাড়ি গজিয়ে । বাড়িতে বর্ষা-মঙ্গলের উৎসব, সুরের বিছাৎ খেলছে বাড়ির আকাশে, কলকাতার লোক ভেঙে পড়েছে বর্ষা-মঙ্গলের উৎসব-সভায়, আমি বাড়িতে থেকেও গেলুম না উৎসব-প্রাঙ্গণে । এই রকম কঠোরতার সঙ্গে সেদিন নিজের জীবনের ভিতর ও বাইরের আমূল পরিবর্তনের কাজে আমি লেগে গিয়েছিলুম । ত্রিশ বৎসর আগেকার আমার জীবনের রূপ এখনো আমার মনের আয়নায় মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে । সেই অতীতের আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেই ধরা পড়ে যায় সেই আমার ছেলেমানুষি আর বাড়াবাড়ি । সেই বাড়াবাড়ির মধ্যে ছেলেমানুষি নিশ্চয়ই ছিল, ফাঁকি কিন্তু আদবেই ছিল না । মনের তাগিদে নি-খাদ আন্তরিকতার সঙ্গে নিজেকে বদল করবার জন্তে মরিয়া হয়ে উঠেছিলুম সেদিন । আর যাকে আমি বাড়াবাড়ি বলছি তার প্রয়োজনও ছিল, কেননা আমার মধ্যে এস্থেটিক-দুর্বলতা ছিল যথেষ্ট । ভাব-রস পান করে মন ছিল মাতাল, দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা দিয়ে এই ভাব-রস বয়ে যেত দিনরাত অবিশ্রান্ত ধারায় । তখন আমি ছিলাম গান-বাঁশি-সাহিত্যের স্বপ্ন-পুরীর বাসিন্দে । পৃথিবীর মাটির সঙ্গে আমার জীবনের কোনো যোগ ছিল না সেদিন । কল্পনার আশমানে উড়ন্ত আমার জীবন-বিহঙ্গকে মাটির নীড়ে ফিরিয়ে আনবার জন্তে এমন একটি প্রবল টানের প্রয়োজন ছিল যা কোন ওজর গুনবে না, যে আদর্শের মাধ্যাকর্ষণে জীবন মাটির উপর এসে আছড়ে পড়ে সচেতন হয়ে যাবে । ভাব-রসের আরকে-ভেজানো আমার অচেতন মনকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে জাগিয়ে তোলবার দরকার ছিল । ' রস-আবিল আত্ম-কেন্দ্রিক স্বার্থপর মনকে ধীরেস্থে একটু একটু করে বদল করে নেওয়া সম্ভব ছিল না । আর, কোনো গভীর পরিবর্তনই ঘটে না আস্তে আস্তে, ঘটে অকস্মাৎ, ঘটে নিমেষে । বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিধারা সঞ্চয় করে ঝরনা করে না বন্যার সৃষ্টি । বিন্দু বিন্দু সঞ্চয় বিন্দু বিন্দু ব্যয়ে শেষ হয়ে যায় । হঠাৎ আকাশ জুড়ে জোটে কষ্টিপাথরের মতো কালো মেঘের দল, নেমে আসে অশ্রান্ত বৃষ্টিধারা মেঘের কালো বুক থেকে, তবেই না ঝরনা-ধারা ঝরে পড়ে পাগলা-ঝোরা হয়ে, তবেই না শেওলা যায় ভেসে, পাথর যায় সরে ! সে কি ঝিরঝির করে বয়ে-চলা ঝরনা-ধারার কাজ ? তার জন্তে চাই বন্যার কূল-ডোবানো

প্রবলতা। আমার বুকের ভিতর সেদিন বান এসেছে, পাঁজরের পাথর সরিয়ে দিয়ে বান ভরেছে আমার বুক কানায় কানায়। অন্তরে বগা অথচ বাইরে দেহের বালির চর ধু ধু করছে এও কি কখনো সম্ভব? যদি তাই হয় তাহলে বুঝতে হবে বগা নেমে আসে নি বুকের ভিতর, শুধু ভুলিয়েছে আমাদের নকল বগার সর্বনাশী মরীচিকা। বান এলে ভিতর বাহির সব ডুবে যাবেই যাবে, একরঙা হবেই মন ও দেহ, এক সুরে বাজবেই দেহ-মনের একতারা। আমার বান-ডাকা মনেরই পরিচয় দিচ্ছিল সেদিন আমার বাইরেটা। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের পানাপুকুরে উঠল সেদিন বিদ্রূপের ঢেউ আমাকে ঘিরে। সমাজের উপর-তলার বাসিন্দারা আমার এই পরিবর্তন তাঁদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর উপর কটাক্ষ হিসেবে ধরে দিলেন। রাগের ঝলক দিত ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের বাসিন্দাদের চোখে যখন আমি ধুলো-পায়ে খন্দর গায়ে তাঁদের ড্রইংরুমের মজলিশে গিয়ে হাজির হতুম। এঁদের ক্রোধ আর বিদ্রূপের ধুলো আমার মনকে কিন্তু বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নি। এসুথেটিক দুর্বলতার ক্লেদ থেকে মুক্ত হয়ে আমার মন তখন আনন্দে ভরপুর। উড়ছে মন পাখির মতো মুক্তির আকাশে, ড্রইংরুমের ধুলো কি তাকে স্পর্শ করতে পারে? গান্ধীজি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' তখন একেবারে টেনে নিয়েছে আমার মনকে। সেই প্রথম যুগের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র গান্ধীজি যে সব প্রবন্ধ লিখতেন তার কি তুলনা আছে? প্রত্যেকটি প্রবন্ধ যেন আগুনের ফুলকি, যেখানে সেই ফুলকি পড়ছে সেখানেই দুর্বলতা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, অন্ধকার কেঁপে উঠছে ভয়ে, মরে যাচ্ছে লজ্জায়। শোনালেন তিনি আমাদের সেই পাখীর কথা যার ডানায় নেই জোর। সূর্যের আলো, নীল আকাশের হাতহানি হার মেনে যায় তার কাছে। পাখির জোটে না শস্ত-কণা, কেমন করে সাড়া দেবে তার দুর্বল ডানা নীল আকাশের ডাকে? জীবনের চেয়ে গানকে বড়ো করবার এসুথেটিক ফাঁকি তার সমস্ত মিথ্যে, সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে ধরা পড়ে গেল। লক্ষ পাখির দুর্বল ডানার অসহায় ক্রন্দন আমাদের শোনালেন গান্ধীজি, দেখালেন আমাদের ভারতবর্ষের সেই বিন্দু আকাশ যা লক্ষ লক্ষ পাখীর ডানার স্পর্শের জন্যে অধীর হয়ে রয়েছে।

১৯১৯-১৯২০ সালে লেখা গান্ধীজির প্রবন্ধগুলি ছিল অরণির মতো

আগুন-ভরা, ধার্মিকতার পশলায় ভিজে প্রবন্ধগুলো তখনো ভিজে কাঠের মতো ধোয়াতে শুরু করে নি। তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলো বার বার পড়তুম। আলোচনা করতুম লেখাগুলো বন্ধুরা মিলে। চপলাকান্ত, অনাথ আর আমি—আমরা তিনটি বন্ধু সেদিন পথে নেমে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। চপলাকান্ত আর অনাথ দুজনে ঘরে ফিরে গেছে, আমি পথেই রয়ে গেছি সেদিন থেকে।

১৯২১ সাল। গান্ধীজি বাঙলা দেশে এলেন বাঙলার জেলায় জেলায় সফর করবার উদ্দেশ্যে। ইয়োরোপ থেকে ফিরে আসবার পর রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের কয়েকটি বিশেষ দিকের সমালোচনা করেন। গান্ধীজিও তাঁর ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’তে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার উত্তর দেন। অনেক দিন দুজনের দেখা হয় নি, এবারে দুজনের দেখা হল। আমার স্পষ্ট মনে আছে সেই সকাল বেলাটা। গান্ধীজি এলেন জোড়াসাঁকো বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন পশ্চিম বারাণ্ডায়, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই যে বসবার ঘর তার পাশের ঘরে। সেই ঘরে ঢালা বিছানার উপর বসলেন গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ আর এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব। আমরা সবাই পশ্চিমের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে। দেখতে দেখতে গান্ধীজির আসার খবর ছড়িয়ে গেল চারদিকে। গলি লোকে লোকারণ্য। বাড়ির মধ্যও অগুনতি লোক পড়লো ঢুকে। বাড়ির উঠোনে, বারাণ্ডায়, ছাদে দলে দলে লোক ভিড় করে দাঁড়াল। বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণে বিলীতি কাপড়ের বহুসংখ্যক লোক করল গান্ধীজির হিন্দুস্থানী ভক্তের দল।

ঘরের মধ্যে শুধু তিন জন, গভীর আলোচনায় মগ্ন তাঁরা। বাইরে থেকে দেখছি—একবার রবীন্দ্রনাথ বলছেন, তারপরে গান্ধীজি, তারপরে আবার রবীন্দ্রনাথ। এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব নির্বাক শ্রোতা। আমার ঠাকুরদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ এ্যাণ্ড্রুজ সাহেবকে ‘হাইফেন’ আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর মতে এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব ছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীজির মধ্যের যোগসূত্র—হাইফেন। সেদিন সকালে এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব ছিলেন এই দুই বিরাট পুরুষদের মধ্যে আত্মিক সেতুর প্রতীকস্বরূপ। পশ্চিমের বারাণ্ডায় বসে অবনীন্দ্রনাথ এই তিন জনের ছবি এঁকে নিলেন। তাঁর সেই বিখ্যাত ছবি অনেকেই দেখে থাকবেন। পেন্সিল দিয়ে গান্ধীজির প্রতিকৃতি আঁকলেন আমার

কাকী প্রতিমা দেবী। সেটি তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। অনেক কাল সেই ছবিটি থাকত আমার টেবিলের উপর। ইয়োরোপ চলে গেলুম, ফিরে এসে সে ছবি আর খুঁজে পাইনি। তিন ঘণ্টারও উপর আলোচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীজি। সন্ধ্যাবেলা রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে শুনলুম সকালের আলোচনার বিষয়গুলি।

চরকা চালাতে শুরু করলুম, লেগে গেলুম খদ্দের কাপড় আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ফিরি করবার কাজে। বাড়ির স্নিগ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে আমি নিয়ে এসে হাজির করলুম কালবোশেখীর ঝোড়ো হাওয়া। বড়োরা বিস্মিত হলেন ক্ষুব্ধও হলেন, কিন্তু কখনো তাঁরা জোর করে আমাকে রুখতে চেষ্টা করেন নি। আমাদের বাড়িতে চিন্তার স্বাধীনতার মর্যাদা ছিল। বাড়িতে একা আমি সক্রিয়ভাবে গান্ধীবাদের পক্ষে, আর সবাই ছিলেন তার বিপক্ষে। আমার ঠাকুরদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ গান্ধীজির মহা-সমর্থক ছিলেন বটে কিন্তু একান্ত নিরাসক্ত সেই আত্মভোলা মানুষটি একেবারে সরিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে সব কিছু থেকে। জোড়াসাঁকো বাড়ির হলেও তিনি যেন জোড়াসাঁকো বাড়ির ছিলেন না।

আমার একরোখা অসহিষ্ণু মনের চেহারা তখন সজারুর মতো, কাঁটা বিঁধোবার জন্তে মন উচিয়ে ছিল সব সময়েই। যাকে পাই তার সঙ্গে জুড়ে দিই তর্ক। মরছে মানুষ, জীবনভরা হাহাকার, বাঁচাও মানুষকে—তার পরে গেলো গান, বাজিও বাঁশি। ঘরে বাইরে করে চললুম তর্ক। আমার পিতা আমাকে অনেকবার বোঝাতে চেষ্টা করে হার মানলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্ক শুরু হল গান্ধীবাদ নিয়ে। দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠেই তাঁর যে বসবার ঘর ছিল—যে ঘরে পরে তাঁর মৃত্যু হয় সেই ঘরে তিনি বসেছিলেন, গল্প করছিলেন একজনের সঙ্গে। আমি এসে উপস্থিত হলুম, কথায় কথায় কথা গেল ঘুরে, গান্ধীবাদ নিয়ে আলোচনা হল শুরু। গ্রামোনাগরিক, চরকা, যন্ত্রের বিরুদ্ধে গান্ধীজির অভিযান প্রভৃতি বহু বিষয় নিয়ে সেদিন সন্ধ্যাবেলা আলোচনা হল প্রায় দু' ঘণ্টারও উপর। রবীন্দ্রনাথের একটি কথাও আমি মানি নি সেদিন। গান্ধীবাদের সমর্থনে তাঁর সঙ্গে তর্কই করে গেলুম সারা সন্ধ্যা। তখন গান্ধীজির লেখার ও বলার আয়নায় দেখেছি ভারতবর্ষের এমন এক

রূপ যা তার আগে কখনো দেখি নি, গান্ধীজির ডাকে শুনছি সেদিন লক্ষ লক্ষ লোকের চলার শব্দ, গণ-আন্দোলনের ধ্যেয়ে-আসা বানের ক্রুদ্ধ গর্জন, যার মতো প্রবল স্বর আমি আগে কখনো শুনি নি। তখন এই দেখা আর এই শোনা আমার মনকে এমন পরিপূর্ণ ভাবে দখল করেছিল যে সেখানে ইন্টেলেক্টুয়ল্ সংশয়ের তিলমাত্র স্থান ছিল না। বুদ্ধি, বিচার সেদিন সব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল লক্ষ লক্ষ লোকের চলার শব্দের অপূর্ব ধ্বনির সামনে। সেদিন আমার মন বিচারশীল ছিল না, বয়েস ছিল কাঁচা আর রাজনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় তখন আমার ছিল না বললেই চলে। এক কথায় বলা যেতে পারে যে তখন আমার মনটা ছিল আবেগের বাষ্পে ভরা, জীবনের ইন্জিন্ চলছে তখন নিছক আবেগের স্টীমে।

পরে যখনই সেই সন্ধ্যাবেলার আলোচনা মনে পড়েছে তখনই রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি বেজেছে মনের কানে, অন্ধ জাতীয়বাদের বিরুদ্ধে তাঁর জলন্ত কথাগুলি আগুনের হল্কার মতো বুকে এসে বিঁধেছে। গান্ধীবাদের সমালোচনায় তিনি যা বলেছিলেন সেটাই ছিল ঠিক। আবেগের কুয়াশায় আমার বুদ্ধি ছিল আচ্ছন্ন, তাই তাঁর খাঁটি কথাগুলি থিতোতে পারে নি আমার হৃদয়ে, পিছলিয়ে পড়ে গিয়েছিল কথাগুলি আবেগের কুয়াশা-পিছল আমার মনের উপর থেকে। তার কথাগুলি যে সেদিন আমার মনে ধরে নি তার আরো একটি কারণ ছিল। আমার দৃষ্টি-ভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি-ভঙ্গির ছিল মূলগত পার্থক্য। আমার মনের দৃষ্টি তখনো অস্থির, কেন্দ্রস্থ হয় নি মন, তবুও তার গতি তখনো ছিল বিপ্লব-মুখী। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নির্বস্তক abstract) মানব-প্রেমের সাধকের দৃষ্টিভঙ্গি। নির্বস্তক মানব-প্রেম আর মানুষকে রস-সৃষ্টির উপাদান হিসেবে দেখার ভাব-বিলাস এই দু'টির সমর্থন ছিল না আমার মনে, শুধু ছিল মনে এদের সম্বন্ধে প্রবল অস্বীকার ও প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা। নির্বস্তক মানব-ধর্মের সঙ্গে গান্ধীবাদের কী সম্বন্ধ তার বিচার করছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আর আমি দেখেছিলুম গান্ধীবাদকে গণ-আন্দোলনের স্রষ্টা হিসেবে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শাসন খতম্ করবার যন্ত্র হিসেবে। এই দু'টি ভিন্নমুখী মনের ধারার মধ্যে মিল সম্ভব ছিল না।

জোড়াসাঁকো বাড়ির ফটক পার হয়ে আমার মন তখন সবেমাত্র যাত্রা শুরু করেছে, এমন সময় শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন। কলকাতার ধূসর রাস্তা সেদিন হল নদী। তার শান-বাঁধানো দুই তীরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলল জনতার তপ্ত শ্রোত। বিপ্লবের লাল জোয়ারে কানায় কানায় ভরে উঠল রাস্তার নদী। শহরতলীর রাস্তায় রাস্তায় সেদিন কী শ্রোত, কী আগুনভরা ঢেউ! সেই ঢেউয়ের গর্জনে শুধু এক ধ্বনি বেজে উঠল—মহাত্মা গান্ধীজিকি জয়। সেদিন এই ডাক ছিল মুক্তিপিয়ারী জনতার ডাক। এই ডাকের অন্তরে ভরা ছিল সেদিন কোটি কোটি লোকের স্বাধীনতা-তৃষ্ণা, নিপীড়ন, অত্যাচার, অনাহার থেকে মুক্তি পাবার আকুলতা, আশা, প্রতিজ্ঞা ও বিদ্রোহ। এই আগুন-ভরা ডাক সেদিন বিদেশী শাসকের বুকে জাগাচ্ছিল ভয় আর আমাদের বুকে মুক্তি-স্বপ্ন, আলো, আশা আর সাহস। লোভী, ক্ষমতা-লিপ্সু, হিংস্র ও নীচ লোকদের মুখে, শেঠীর মুখে, ফড়েদের ও চোরাকারবারীদের মুখে এই ডাক আজ যেমন কলুষিত হয়েছে, অবমানিত হয়েছে, সেদিন তা' হয় নি। সেদিন পরাধীন ভারতের মুক্তির ডাক ছিল—মহাত্মা গান্ধীজিকি জয়।

সে কী আশ্চর্য এক সময়, কী অপূর্ব প্রাণে আলোয় ভরা সেই দিনগুলি! সবাই সেদিন আপনার হয়ে গেছে, প্রত্যেকটি ঘর আপনার ঘর মনে হচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষের কাছে দাবি জানাতে মনে এতটুকু সঙ্কোচ নেই। কত অজানা, অচেনা বাড়িতে ঢুকে গিয়ে সেদিন খদ্দর বেচেছি, টাকা আদায় করেছি। শুনেছি রবীন্দ্রনাথের মুখে, স্বদেশী আমলে নাকি এই রকম একটা প্রবল একাত্মবোধের জোয়ারে বাঙালির মন ভরে উঠেছিল কানায় কানায়। রাস্তার মুটে মজুর, গাড়োয়ান থেকে শুরু করে ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, বাড়ির মেয়েরা—সবাই সেদিন অকাতরে দান করেছিল স্বদেশী-ফাণ্ডে। স্বদেশীয় যুগ আমার সচেতন মনের পরিধির বাইরে। স্মৃতির আয়নায় তার অস্পষ্ট রেখা ছবির মতো ভেসে ওঠে কখনো কখনো, কখনো বা ভুলে-যাওয়া গানের সুরের মতো বাজতে থাকে আমার মনে আমার ছোটোবেলার জীবনের সুরের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া স্বদেশী যুগের সুর।

অসহযোগ আন্দোলনই আমার জীবনে আনল এই রকম মন-প্রাণ-

দখল-করা সর্বগ্রাসী অমুভূতির প্রথম অভিজ্ঞতা। স্বদেশী যুগে শুধু বাঙলা দেশের সীমানায় মধ্যে যে বান ডেকেছিল, এই প্রথমবারের মতো ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত সেই বে-হিসেবী বে-পরোয়া আবেগের জোয়ার বয়ে গেল। আমার কিশোর বয়সের সচেতন সত্তার কাছে অসহযোগ আন্দোলন এক আশ্চর্য রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে বিদ্রোহের এই রকম দেশ-জোড়া জোয়ার আর এর আগে কখনো দেখা যায় নি। আমারই মতো লক্ষ লক্ষ লোককে মুগ্ধ করেছিল, টেনে নিয়েছিল এই জোয়ার। মনের মধ্যে পরাধীনতার যে বেদনা ছিল, স্বাধীনতার জন্য যে গভীর তৃষ্ণা ছিল, সেই বেদনা ও তৃষ্ণা-মিশানো হৃদয়ের সুরের সঙ্গে এই দেশ-জোড়া জোয়ারের সুরের ছিল প্রাণের মিল। এই জোয়ারের উদ্দাম ব্যাপকতা আমাকে মুগ্ধ করছিল, এর গভীরতা বোঝাবার কিছা যাচাই করবার ক্ষমতা আমার ছিল না সেদিন।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর জয়ধ্বনি উঠছে রাস্তায় রাস্তায়। শত শত লোক এগিয়ে আসছে প্রতিদিন আইন ভঙ্গ করবার জন্যে। ইন্সুল কলেজ সব বন্ধ। রাস্তায় পুলিশ আর গোরা পল্টনের অত্যাচার চলছে পথিকদের উপর। রোজ প্রায় পাঁচশো লোক আইন-ভঙ্গ করে ধরা পড়ছে, আরো সহস্র এগিয়ে আসছে আইন ভাঙবার জন্যে। সত্যিই সেদিন “আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান” এই ছিল প্রতিটি কর্মীর মনের কথা। রাজনীতির ক্ষেত্রে পাটোয়ারী বুদ্ধির লোকদের আবির্ভাব তখনো হয় নি; দেশের দুর্গতিতে কর্মীদের বুকের প্রতিটি শিরা ব্যথায় টন্ টন্ করছিল, দেশের প্রতি ভালোবাসায় তাদের মন ছিল কূলে কূলে ভরা। তাই দেশের জন্য দুঃখ-ভোগ, অসীম নির্যাতন সওয়া অত্যন্ত সহজ কর্তব্য হিসেবে দেখা দিয়েছিল সে সময় কর্মীদের কাছে। দেশ-সেবা তখনো ‘ত্যাগ’ এই নাম নেয় নি আর এই বুটো নাম নিয়ে মালা-চন্দন-পূজোর কোন দাবি করে নি। মতলবী লোকদের কাছে দেশের জন্যে অতি সামান্য দুঃখভোগও ‘ত্যাগ’ বলে মনে হয়, ত্যাগের ছদ্মবেশে সাজায় তারা নিজেদের স্বার্থসেবায় কষ্ট-ভোগকে। ভালোবাসা নিজের গরজে বরণ করে দুঃখ, যাকে ভালোবাসে

তার কাছে একান্ত আত্ম-নিবেদনের আনন্দে সে ভরপুর; কিছুই অভাবই সে বোধ করে না। ত্যাগের নামাবলী গায়ে দিয়ে লোক ঠকাতে তার রুচিতে বাধে। সেদিন দেশকে ভালোবাসে এমন শত সহস্র লোক এসেছিল এগিয়ে, তাই তাদের ভালোবাসার সহজ ও নীরব আত্ম-নিবেদনের সৌরভে দেশ মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল। ‘ত্যাগী’দের আত্ম-প্রচারের কোলাহল সেদিন আদবেই ছিল না। সহজ হবার, নির্ভীক হবার, বিলাস ত্যাগ করবার, গভীর আবেদন ছিল অসহযোগ আন্দোলনের ডাকের মধ্যে। সমাজের উপরতলার ভোগ-পঙ্কিল আবহাওয়ায় জীবন এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে সহজ হবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল জীবন। সহজ হলে লোকে কী বলবে এই আশঙ্কায় ও সঙ্কোচে জীবন ছিল ভরা। গান্ধীজি ত্রাণ করলেন আমাদের এই সঙ্কোচের গ্লানি থেকে। মন ও দেহকে, নিরাভরণ সহজ অথচ প্রবল এক সুরে বেঁধে নিয়ে গভীর আনন্দে মন গেল ভরে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্বদিকে একটি বাড়িতে তখন কংগ্রেসের আপিস। অসহযোগ আন্দোলনের জন্ত স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা ও শহরের স্থানে স্থানে আইন-অমান্যের জন্ত স্বেচ্ছাসেবক পাঠানো হত এই কেন্দ্র থেকে। আন্দোলন তখন সবেমাত্র কয়েকদিন শুরু হয়েছে এমন সময় একদিন বিকেলে এই কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আমার নাম দিলুম আইন-অমান্যের স্বেচ্ছাসেবকের তালিকায়। স্থির হল তার পর দিন বিকেলে আইন-অমান্যকারীদের সঙ্গে আমি বের হবো। শরীর মন আলোর মতো হালুকা বোধ হতে লাগল সংকল্পের আনন্দে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে হন্ হন্ করে বাড়ি ফিরছি। মাটিতে যেন পা পড়ছে না, আবেগের ঝোড়ো হাওয়া আমাকে যেন ঠেলে নিয়ে চলেছে। রাত্তিরে আমার পিতা যখন বাড়ি ফিরে এলেন তখন তাঁকে জানালুম আমার সংকল্পের কথা। তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কোঁচের উপর চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন তিনি অনেকক্ষণ। রাত্তিরের খাবার এল, নাড়াচাড়া করেই তিনি উঠে পড়লেন, খাওয়া আর হল না। গভীর রাতে এলেন তিনি আমার শোবার ঘরে, আমার বিছানায় বসে বার বার আমাকে অমুরোধ করলেন আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান না করতে। সমবেদনা-লুক লোকদের

মতো দুঃখ জাহির করার কুরুচি আমার পিতার কিছুমাত্র ছিল না। যত দুঃখ তিনি পেয়েছিলেন জীবনে, সব তিনি অন্তরের গভীর গহনে নিয়ে গিয়েছিলেন লোকচক্ষুর আড়ালে, নিবেদন করেছিলেন তাঁর সব দুঃখ শুধু তাঁর অন্তরদেবতাকে। বেদনার মাধুর্যে মধুর ছিল তাঁর স্নিগ্ধ হাসি আর প্রশান্ত দৃষ্টি। বেদনা যদি না চোখের উপর থেকে ধুলোর পর্দা সরিয়ে দেয়, মুখের মাটি ধুয়ে না দেয়, তাহলে হাসিতে দৃষ্টিতে এই অপরূপ স্নিগ্ধতা ও শুভ্র প্রশান্তি কখনো ফুটে ওঠে না। ক্লান্ত স্নেহ-বেদনায় কাতর তাঁর সেই কণ্ঠস্বর আজো আমার কানে বাজে। সে রাত্তিরে তাঁর অনুরোধ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলুম বারবার, শেষে হার মানলুম তাঁর ক্লান্ত স্নেহ-বেদনার কাছে। হল না আমার আইন অমান্য করা, হল না আমার আন্দোলনের ফুটন্ত ঢেউয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। বুকের মধ্যে পাগল-করা ঢেউয়ের মাতামাতি চেপে রেখে দাঁড়িয়ে রইলুম আমি তীরে।

কলকাতায় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয় লাল লজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে, সেই অধিবেশনেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই কংগ্রেসে গান্ধীজির প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। মনে পড়ে দেশবন্ধুর বক্তৃতা। আইনজ্ঞের বাক্‌চাতুরী যথেষ্ট ছিল সে বক্তৃতায়। সে বিরুদ্ধতা কিন্তু ঝড়ের মুখে পালকের মতো উড়ে চলে গেল। আমার মন আদবেই স্পর্শ করে নি সে বক্তৃতা। গণ-আন্দোলনের ঝড়ের মধ্যে, কুলডোবানো বানের মধ্যে কৌশলের, চাতুরীর, কূটনীতির ছক-কাটার স্থান কোথায়? সহজে হার মানবার লোক ছিলেন না দেশবন্ধু। নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করবার জন্য বাঙলা দেশ থেকে ট্রেন বোঝাই লোক নিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশ নাগপুরে যান। সেই একই ট্রেনে আমি, নলিনাক্ষ ও আরো কয়েকজন যাই নাগপুরে নিখিল-ভারত-ছাত্র-কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্যে। সারা পথ মনে হচ্ছিল যেন বর-যাত্রীদের সঙ্গে চলেছি। হাসি, গল্প আর যে অফুরন্ত আকর্ষণ ভোজন চলছিল সারা পথ তাতে দেশ ঠাই পাবে কোথা এদের বুকের মধ্যে! নাগপুরে চিত্তরঞ্জন আত্মসমর্পণ করলেন গান্ধীজির কাছে। ফিরে এলেন বাঙলাদেশে সম্পূর্ণ নতুন মানুষের রূপে। ব্যারিস্টারি ছেড়ে দিলেন, বিলাস করলেন বর্জন, গায়ে বালাপোশ,

পরনে খন্দের ধুতি, পায়ে চটি এই বেশে আমরা তাঁকে দেখলুম। তাঁর এই পরিবর্তন বাঙালীর ভাবপ্রবণ হৃদয়কে উদ্বেল করল। বাঙালী তাঁকে দেশবন্ধু হিসেবে বরণ করে নিল হৃদয়ের মধ্যে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্বেই তিনি চলে গেলেন জেলে। একটি সন্দের ছবি আমার মনে জল্জলে হয়ে আছে। ‘সারভেন্ট’ পত্রিকার আফিসে গিয়েছি সন্দের পরে। শ্রামসুন্দর চক্রবর্তী মশায় রয়েছেন। ঘরভর্তি লোক। দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের খবর এল। দেশবন্ধুর পরে তাঁকে আন্দোলনের নায়ক নির্বাচিত করা হয়েছে এই শুনে ভাব-প্রবণ শ্রামসুন্দর অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনিও বন্দী হলেন। গ্রেপ্তারের মরশুম চলেছে তখন হাজার হাজার লোকে বাঙলার কারাগারগুলি ভর্তি। এক বাঙলাদেশেই বিশ হাজারের উপর লোক আইন অমান্য করে জেলে গেল। আন্দোলনের এই জোয়ারের মুখেই একদিন খবর এল যে পুলিশের অত্যাচারে ক্ষেপে গিয়ে চৌরিচৌরার জনতা কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করেছে আর এই কারণে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করে দিয়েছেন। সমস্ত দেশ স্তম্ভিত হল বটে আন্দোলন স্থগিতের খবরে, তবু মেনে নিল গান্ধীজির আদেশ। অহিংসার মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে আন্দোলন বন্ধ করা হল, গান্ধীজি দিলেন এই যুক্তি। এই যুক্তি খণ্ডন করবার প্রতি-যুক্তি সেদিন আমার ছিল না। তবুও মন আমার গভীরভাবে ব্যথিত হল আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়াতে, কি রকম যেন মনের ভিতরে সব এলোমেলো হয়ে গেল। মনের মধ্যে ভারী অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম, কোথায় যেন কি একটা গলদ আছে এইটে মনে হতে লাগল, অথচ গলদ ধরবার মতো রাজনীতির জ্ঞান ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা তখন আমার আদর্বেই ছিল না। এর অল্পদিন পরে গান্ধীজি দীর্ঘ কালের মতো কারারুদ্ধ হলেন। চরুখা, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-সাধন প্রভৃতি গঠনমূলক কাজে পূর্বের চেয়ে আরো বেশি করে আমাদের লেগে পড়তে হুকুম দিয়ে গান্ধীজি চলে গেলেন। হঠাৎ যেন সব স্তব্ধ হয়ে গেল। ঝড়ের অট্টহাসি, ঢেউয়ের গর্জন সব থেমে গেল। হাজার হাজার লোকের মুখে যে আলো ফুটে উঠেছিল, নিভে গেল সে আলো। পথ আর নদী রইল না, হল আবার সেই আগেকার পাথর। আলো নিবল, ঢেউ সরে গেল, ঝড় লুকোল দিগন্তের

অঞ্চল-তলে, নদী গেল শুকিয়ে। সে এক ভয়ংকর মরা দিন আমাদের সামনে হাজির হল। নিজের জোরে পথ কেটে চলবার মতো কোনো শক্তি তখন ছিল না আমার। আমার জন্তে গান্ধীজির লেখাগুলিই ছিল পথ। সেই পথ দিয়ে আমি চলেছিলুম নিঃসংশয়ে। সে পথও বন্ধ হয়ে গেল গান্ধীজি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। কে যেন আলো থেকে একেবারে অন্ধকারে ঠেলে দিল আমাকে। শুধু একটি পথ সামনে ছিল। গঠন-মূলক কাজে আত্মনিবেদন করতে আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন গান্ধীজি। গান্ধীজির আদেশ মেনে গঠন-মূলক কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়াই ছিল আমার ও আমার মতো শত শত তরুণের পক্ষে নিরাশার দম-বন্ধ-করা অন্ধকার থেকে বাঁচবার একমাত্র পথ। মনে গুমোট, বাইরে গুমোট, সে অসহ্য অবস্থা থেকে রেহাই পাবার জন্তে কলকাতা ছেড়ে কোথাও গ্রামে চলে যাব স্থির করলুম। এমন সময় হঠাৎ একদিন চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হোয়ে গেল, তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন বোনপাশে যেতে। বেঁচে গেলুম আমি, তখনই স্থির করলুম বোনপাশ যাবো। চপলা চলে গেল কুমিল্লায় ‘অভয় আশ্রমে’, অনাথ গেল বীরভূমের একটি গ্রামে, আমি চলে গেলুম বোনপাশে। একটি নদী যেন অনেক ধারায় নিজেকে ভাগ করে দেশের চারদিকে ছড়িয়ে গেল।

বোনপাশ। গ্রামের বাইরে ধু ধু করছে মাঠ। কঙ্কালের মতো হাড়-বেড়-করা শুকনো ডাঙা। সেই ডাঙার এক প্রান্তে আমার কুঁড়ে ঘর। একটি ঘরে আলু রাখা আছে বোঝাই করে। অন্য ঘরটিতে থাকি আমি। কিছু দূরে সরু মরা নদী, চোখের জলের মতোই স্বল্প তার জল। ঘরের পেছন দিকে কয়েক পা গেলেই সাঁওতাল গ্রাম। সন্ধ্যাবেলা মছারার গন্ধের সঙ্গে ভেসে আসে সাঁওতাল গ্রামের মাদলের আওয়াজ। ঘর থেকে দেখতে পাই সামনের মাঠ দৌড়ে গিয়ে থমকি দাঁড়িয়েছে তকীপুর গ্রামের সীমানায়। বেলা বাড়তেই মাঠ ওঠে তেতে, নিঝুম মাঠের স্বর কানে আসে, যেন রোদের ঝাঁ ঝাঁ পোকা ডাকছে। খালি মাথায়, খালি পায়ে মাঠ পার হয়ে বাই তকীপুর গ্রামে। গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে আলাপ করি, চরখার কথা বলি, মহাত্মাজীর আদেশ শোনাই তাদের, বলি তাদের আন্দোলনের কথা, আবার মাঠ পার হয়ে ফিরে আসি আমার ঘরে।

একবেলা রাধি,খাই দু'বেলা। কোনো কোনো দিন মুড়ি চিড়ে খেয়েই কাটিয়ে দিই। সাঁওতাল গ্রামের সঙ্গেও আত্মীয়তা বাড়তে লাগল। ছেলেমেয়ে-গুলো ঘরের বাইরে ঘোরাঘুরি করত, আন্তে আন্তে ঘেঁসে এলো দাওয়ার কাছে। তারাই হোলো আমার সেতু সাঁওতাল গ্রামের অন্তরে পৌঁছে যাবার। তকীপুর গ্রামটি আয়তনে বড়ো, মজে-যাওয়া বড়ো বড়ো দীঘি অতীতের ভালো সময়ের সাক্ষী দেবার জন্য কোনো মতে বেঁচে আছে।

এতো বড়ো গ্রামে লোক খুবই অল্প, ম্যালেরিয়ার দাপটে গ্রাম উজাড়। যে পেরেছে সেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে, যারা রয়েছে গ্রামের বাইরে ডাঙার মতোই তারা হাড়গোড়-বের-করা কঙ্কালসার। গ্রামের মধ্যে ঢুকলেই মনে হয় যেন, গ্রাম তার মরা হাতটি বুকের ওপর চেপে ধরছে। জীবন্ত, তাজা কোনো-কিছু তার চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকবে এতে তার ঘোর আপত্তি। গাঁয়ের পথে লোক চলে কালো ছায়ার মতো, কোনোমতে কাজ সেরে ঘরে ঢুকতে পারলেই তারা বাঁচে। উদ্ভূত তো কিছু নেই, প্রাণ এদের তলানিরও তলানিতে পৌঁছে গেছে। এমন অসহ্য মরা চেহারা আমি এর আগে আর কখনো দেখি নি। ক্রান্তির অবসাদে ঝিমোনো এই গ্রামে আমার কাজ শুরু করলুম। চরখা চালাতে, কুঁড়ের গায়ের জমিতে তুলোর চাষ করতে উৎসাহিত করতে লাগলুম গাঁয়ের লোকদের। গ্রামের পথঘাট পরিষ্কার করবার কথাও তুললুম এদের কাছে। উত্তরে শুধু বোবা অসহায়তা ভেসে ওঠে এদের চোখের দৃষ্টিতে, কোন-কিছু করবার মতো শক্তি এরা নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছে। মন! আত্মা! মনের অপরাধেয় শক্তি! আত্মার প্রাধান্য! ঝুটো কথার কত-না সওদা ফিরি করে ফেরে বাবুরা জীবনের রাজপথে ভরা পেটের খুস মেজাজে। শরীর শুকিয়ে গেলে 'আত্মা' যে কেমনতর শুকিয়ে যায়, মন যে কেমন হয়ে যায় মরীচিকার মরীচিকা, তা একবার ড্রইংরুম থেকে নেমে এসে যদি বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস 'আধ্যাত্মিক' বাবুদের একটুও থাকত তা হলে হয়তো তারা বুঝতে পারত। তকীপুরের গায়েই বিশ্বগ্রাম। সেখানেও যাতায়াত শুরু করলুম। আজো ভুলি নি গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোক লম্বোদর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে নেমস্তন্ত্রের কথা। নেমস্তন্ত্র করে বাড়ি নিয়ে গিয়ে তিনি শোনালেন আমাকে যে, আর যাই হোক-না কেন এ

গ্রামে ব্রাহ্মণের অপমান কখনো হয় নি, আর সেইটি হাতে হাতে প্রমাণ করে দেবার জগ্গেই বোধ হয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেখানে খেতে বসলেন সেই ঘরের চৌকাঠের ওদিকে আমাকে খেতে বসালেন ! গাঁয়ের জীবনের সঙ্গে আমার সেই প্রথম সত্যিকার পরিচয় । গাঁয়ের জীবন নিয়ে অনেক কবি অনেক কবিতা লিখেছেন, পল্লী-জীবনের কত মধুর ছবিই-না তাঁরা এঁকেছেন ! কোয়েল-দোয়েল-ডাকা গ্রামের বনতলের ছবি, দীঘির কাক-চক্ষু জলে কলস ভরতে চলেছে গ্রামের বধু, সরলতা ও মানবতায় ভরা গ্রামবাসীদের জীবন ! হায় রে, এর যদি একটাও সত্যি হত, বাস্তবের সঙ্গে যদি এর কোথাও লেশমাত্র সম্পর্ক থাকত ! এই গ্রাম ও এই গ্রামবাসী, দুই-ই কবির কল্পনা-লোকের বাসিন্দে, আমাদের এই মাটির-বাসা পৃথিবীতে কোথাও তাদের অস্তিত্ব নেই । কোয়েল-দোয়েল হয়তো কখনো পথ ভুলে ডেকে চলে যায় গাঁয়ের বনে, যা অহরহ ডাকে সে হচ্ছে মশা । মশা-ডাকা গ্রামের সঙ্গেগুলি যে কী ভয়াবহ তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে । শ্রাওলা-ঢাকা মজে-যাওয়া দীঘিগুলো ছানি-পড়া আধ-বোঁজা চোখের মতো বিক্রী । জল তার বিষাক্ত । গাঁয়ের মেয়ে আধ-পেট খেয়ে জন্তুর মতো খেটে চলে সকাল হতে সন্ধে । তার কঁাকের কলসী যদি কথা বলতে পারত তাহলে কবির বর্ণনা লজ্জায় মুখ ঢাকত । গাঁয়ের জীবন নীচতা, কুটিলতা, পরশ্রী-কাতরতা, দলাদলি আর কুসংস্কারে ভরা । গাঁয়ের জীবনের মাধ্যাকর্ষণে মানুষ মনুষ্য হারিয়েছে, নেমে গেছে মানুষ জন্তুর পর্যায়ে, প্রকৃতি-রাক্ষসীর জৈবিক এলাকায় হাত-পা-বাঁধা বন্দীর মতো পড়ে থেকেছে মানুষ যুগের পর যুগ । শহর ও শহরের জীবন - বলতে সত্যি যা বোঝায় এরাই মানুষকে পথ দেখিয়েছে মুক্তির দিকে । আমাকে গ্রামের জীবন কখনো মুগ্ধ করে নি, সে দিনও না, আজও না । পরে যখন গ্রামের জীবনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছে তখন পল্লী-জীবনের উপর আমার বিতৃষ্ণা কমে তো নি-ই বরঞ্চ অনেকগুণ বেড়ে গেছে ।

সন্ধে হবার আগেই মাঠ পার হয়ে চলে আসি আমার কুঁড়েতে, যাই সাঁওতাল গ্রামে । ছোট্ট গ্রামখানি, তক্তকে ঝকঝকে । নিকোনো আঙিনা, ঘর দোর কী পরিষ্কার ! সবলদেহ মেয়ে পুরুষ । দুজনেরই শরীর যেন ঢালাই-করা ইস্পাতের ফোয়ারা । মেয়েদের পরনে মোটা লাল-

পেড়ে শাড়ী হাঁটু পর্যন্ত, গলায় কুঁচের মালা। চূলে পরে তারা জবা ফুল। মনে হয় যেন কালো ইম্পাতের ডগায় কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় আকাশ-ছোঁওয়া বটগাছের তলায় বসে সাঁওতালদের সঙ্গে গল্প করি। মহয়ার ঝাঁঝালো গন্ধে মাথা ধরে আসে। মাদল বাজে; ছোটো ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে বেড়ায়। একবার জোর পরীক্ষা করলুম সাঁওতাল ছেলের সঙ্গে। গ্রামের লোক মেয়ে-পুরুষ সব জুটলো বিকেল বেলা, মাদল বাজল, আমরা দু'জনে একটা রশি দু'দিকে ধরে দাঁড়ালুম। কে কাকে টেনে নিতে পারে এই হল বাজি। জিতলুম আমি, শরীরে ছিল তখন দরকারের চেয়েও বেশি শক্তি। গাঁয়ে বিয়ের ধুম লাগল, লাল-পেড়ে শাড়ী আর হাড়িয়ার খরুচা জোগালুম আমি। এমনি করে তারা আমাকে আপনার করে নিল, আমি নিলুম তাদের আপনার করে। সকাল সন্ধ্যা আমার ঘরে সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের ঘোরাফেরা আসা-যাওয়ার শ্রোত বয়। এমনি করেই কাটছে দিন, একদিন গ্রাম থেকে ফিরে এলুম, শরীরটা জর জর বোধ হতে লাগল, শুয়ে পড়লাম মাদুরে, দু'দিন পড়ে রইলুম জরের ঘোরে অসহ্য মাথায় যন্ত্রণায়। গাঁয়ের লোকেরা এল খবর পেয়ে, গোকুর গাড়িতে পৌঁছে দিল স্টেশনে, তুলে দিল বোলপুরের গাড়িতে। দাদামশায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ও আমার বড়োমা হেমলতা দেবী থাকতেন তখন নীচু বাংলায়। কোনো রকমে এসে হাজির হলুম বড়োমার কাছে। কয়েকদিন বাদে জর ছাড়তে কলকাতায় চলে গেলুম। ম্যালেরিয়া জরের জের চলল অনেক মাস ধরে। বোনপাশের পাট উঠল, সেখানে আর ফিরে যাওয়া হল না। কলকাতায় ফিরে এলুম অসাড় শরীর ও মন নিয়ে। চুপচাপ পড়ে থাকি ঘরে, যখন মন চায় গান গাই, যখন ভালো লাগে পড়ি। জীবনটা যেন একটা ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেছে, কিছুতেই আর এগোতে পারছে না। চুপ করে যাওয়াটা তখন নিজেকে বাঁচাবার একমাত্র পথ ছিল, নইলে ঘূর্ণির তলায় তলিয়ে যেতুম একেবারে। বাইরের অবস্থাও তখন আমারই মতো, সারা দেশ তখন এক ভয়ংকর প্রাণঘাতী ঘূর্ণিতে আটকে গেছে, কিছুতেই জোর পাচ্ছে না ঘূর্ণ থেকে বের হয়ে যাবার। ধর-পাকড় তখনো থামেনি কেউটের মতো ছোবল মেয়েই চলেছে ব্রিটিশ শাসকেরা।

১৯২৩ সাল। বন্ডায় ভেসে গেল উত্তর বঙ্গ। শত শত গ্রাম ডুবে গেল বন্ডার জলে, হাহাকার উঠল বাংলা জুড়ে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বঙ্গাপীড়িত-দের ত্রাণের জন্যে স্বৈচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠনের আহ্বান দিলেন। আমি আর আমার পিসেমশায় নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আমরা দু'জনে গেলুম আত্মাইতে। সেখান থেকে গেলুম আমরা কালিগ্রাম পরগনায়। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরতে লাগলুম। চারদিকে অথৈ জল, ক্ষেত, মাঠ, গ্রাম সব এক হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে উঁচু জমিগুলো কচ্ছপের পিঠের মতো জলের ভিতর থেকে মাথা তুলে আছে। ডিঙি ঠেলে গ্রামে গিয়ে উঠি। জলে জেঁক আর সাপ, জলে নেমে ডিঙি ঠেলবার সময় সাপ লাগে গায়ে। ডাঙা জমির উপর গাছের গুঁড়িতে অগুন্তি সাপ জড়িয়ে। মরা গরু-বাছুর ভেসে চলেছে। গ্রামে গ্রামে গুরু হয়েছে মড়ক। গ্রামে গ্রামে ওষুধ দিই, শোধন করি কুয়োর জল, কাপড় বিলোই, টাকাও দিয়ে আসি কোনো কোনো গ্রামে। এই রকম করে এক মাস গ্রামে গ্রামে ঘুরে ফিরে এলুম কলকাতায়।

জেল থেকে বের হয়ে আসবার পরেই দেশবন্ধু এক নতুন কর্মপদ্ধতি হাজির করলেন দেশের সামনে। বাইরে থেকে আঘাত করে বিদেশী শাসন-যন্ত্র ভেঙ্গে দেওয়া গেল না, এবারে ওদেরই তৈরী আইন-সভায় ঢুকে শাসন-যন্ত্রকে অচল করে দিতে হবে। গান্ধীজির আইন-সভায় বর্জনের নীতি পালটাতে হবে। এও অসহযোগ, তবে এ অসহযোগ আইন সভায় ঢুকে করতে হবে। আইনসভা থেকে সরে গিয়ে ব্রিটিশের পদলেহী ভারত-বর্ষীয়দের দেশের নামে দেশের সর্বনাশ করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই দেশদ্রোহীদের তাড়াতে হবে। দেশের নামে সাম্রাজ্যবাদের সেবা করবার সব সুযোগ থেকে এদের বঞ্চিত করতে হবে। এই ছিল দেশবন্ধুর নতুন কর্ম-পদ্ধতির উদ্দেশ্য, আর এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি স্বরাজ পার্টি গঠন করেন। গান্ধীজি এই নতুন কর্ম-পদ্ধতি মানতে পারলেন না, বাধাও কিন্তু তিনি দিলেন না দেশবন্ধুকে, এই নতুন কর্ম-পদ্ধতি নিয়ে কাজ করতে। স্বরাজ পার্টির পতন হল। মতিলাল নেহরু, জিন্না, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রভৃতি নেতার দল যোগ দিলেন। ইলেকশনের ধুম পড়ে গেল দেশে। ব্রিটিশের জো-হুন্মের দল কোথায় গেল ভেসে শ্রোতের মুখে কচুরীপানার

মতো। স্বরাজ পার্টির লোকে আইন সভা গেল ভরে। শাসন-যন্ত্র অচল করে দেবার জন্যে দেশবন্ধু মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা-প্রস্তাব আনলেন। টাউন হলের দোতলায় তখন কাউন্সিলের অধিবেশন হ'ত। দেশবন্ধু অস্থূল ছিলেন, স্ট্রেচার শুইয়ে তাঁকে দোতলায় তোলা হল। নীচে লোকের ভিড়। উপরে গ্যালারীতে আমরা ভিড় করে বসে আছি। সভাগৃহে উত্তেজিত ঢেউ বইছে, আসা-যাওয়ার অন্ত নেই। সভার আরম্ভে বাঙলার গভর্নর লর্ড লিটন এসে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা-প্রস্তাব যেন না আনা হয়—এই অনুরোধ জানিয়ে বক্তৃতা দিলেন। লর্ড লিটন বক্তৃতা দিয়ে যেতে না যেতেই দেশবন্ধু আনলেন অনাস্থা-প্রস্তাব। তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হল। আমরা জয়ধ্বনি তুললুম দর্শকের গ্যালারি থেকে, নীচে জয়ধ্বনি তুলল অপেক্ষমান জনতা। কটন সাহেবের আদেশে আমাদের বের করে দেওয়া হল গ্যালারি থেকে। লর্ড লিটন আবার কয়েকটি জো-ছকুম জুটিয়ে মন্ত্রী বানালেন। আবার তাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এল, পাসও হল। এই রকম করে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বার বার তিনবার অনাস্থা প্রস্তাব পাস করালেন দেশবন্ধু।

জো-ছকুম গোলামের দল মন্ত্রী হতে পারল না বটে কিন্তু শাসন-যন্ত্র একটুও অচল হল না। ব্রিটিশ গভর্নর তাঁর পরামর্শদাতাদের সাহায্যে তোফা আরামে শাসন করতে লাগলেন। বিদেশী শোষকদের শাসন-যন্ত্রে কোথাও বিন্দুমাত্র চিড় ধরার লক্ষণ দেখা গেল না। আইন সভায় বক্তৃতা দিয়ে ভোট দিয়ে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে কি অত্যাচারী শাসকদের হটানো যায়, ক্ষমতা দখল করা যায়?

স্বরাজ পার্টি সম্বন্ধে প্রথম থেকেই আমার মনে সন্দেহ ছিল, বিরূপতাও ছিল। আইন সভার মধ্যে ঢুকে যে গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধতা করবার দরকার আছে আর বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থাতে সেটা যে অত্যন্ত জরুরি কাজ এ জ্ঞান তখন আমার ছিল না। গান্ধীজি এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে রাজী হন নি, এই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে দামী যুক্তি। তা ছাড়া স্বরাজ পার্টি সম্বন্ধে আমার সাহজিক (instinctive) বিরূপতা ছিল খুব জোরালো। যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু মন বলছিল এ পথে হবে না। কাউন্সিলে বক্তৃতা দিয়ে দেশ স্বাধীন করা যায় না। রাস্তাটাকে

করতে হয় বিপ্লবের নদী আর তাতে ডেকে আনতে হয় জোয়ার গণ-সমুদ্র থেকে—তবে দেশ স্বাধীন হয়, আর সে পথ আমাদের দেখিয়েছেন গান্ধীজি, দেশবন্ধু নয়। এর দু-এক বছর পরে গণবাণীতে একটি প্রবন্ধে স্বরাজ পার্টি'কে আমি উকিল-ব্যারিস্টার-জমিদারবাবুদের দল বলে অভিহিত করি। আমার সহজ-বুদ্ধির (instinct) যে সন্দেহ ছিল তার যথার্থতার যাচাই হয়ে গেল পরবর্তী কালে যখন আমি রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষমতা লাভ করলুম। তখন বুঝলুম স্বরাজ পার্টি শুধু কাউন্সিল ঘরে হাত ছুঁড়ে বক্তৃতা দেবার কর্মপদ্ধতি নিয়েছে। বুঝলুম স্বরাজ পার্টির নেতাদের মধ্যে একজনও গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করবার ক্ষমতা রাখেন না। বাইরের গণ-আন্দোলনের সম্পূর্ণক হিসেবে আইন সভায় গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধতা করার কর্ম-পদ্ধতি স্বরাজ পার্টির নেতারা গ্রহণ করেন নি। তাঁরা রাস্তা থেকে একেবারে সরে পড়ে সাত তাড়াতাড়ি ঢুকে বসেছিলেন কাউন্সিলের ঘরে। রাস্তা থেকে সরে পড়ার যে রূপ স্বরাজ পার্টির প্রত্যেকটি নেতার চেহারায়, বক্তৃতায়, ও কর্মে ফুটে উঠেছিল তারি বিরুদ্ধে আমার মনে সাহজিক সন্দেহ ও বিরূপতা দেখা দিয়েছিল। গণ-আন্দোলনের বৈপ্লবিক পন্থা ছেড়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বাঁধা মড়কে দেশকে হাঁটি হাঁটি পা পা করাবার মতলব নিয়ে তৈরি হোলো স্বরাজ পার্টি। নিয়মতান্ত্রিক প্রণালীতে আন্দোলন করে দেশ স্বাধীন করতে হবে, প্রস্তাব পাস করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাঠিয়ে দিয়ে শাসকদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করে দেশ স্বাধীন করতে হবে, কংগ্রেসের এই গুণ্ডাকারজনক নীতির নাগপাশ থেকে গান্ধীজি আমাদের মুক্তি দিয়েছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নয়, গভর্নমেন্টের তৈরী আইন অমান্য করে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী কোটি কোটি লোকের বিরুদ্ধতা উদ্ভুদ্ধ করে, সংহত করে, গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করে দেশের স্বাধীনতা আনতে হবে—এই হল গান্ধীজির প্রদর্শিত পথ। স্বরাজ পার্টি আবার দেশকে সেই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকেই টেনে নিয়ে গেল। কাউন্সিল ভবনে বক্তৃতার বাজিখেলা দেখানো হল অনেক, রাস্তা কিন্তু একেবারে অসাড়, নিরুন্ম, প্রাণহীন হয়ে গেল। গান্ধীজি চলে গেলেন জেলে আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় আন্দোলনের কোটাল বইয়ে দেবার

যে একটিমাত্র লোক ছিলেন সারা ভারতবর্ষে তিনি গেলেন চলে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে।

মনে বড়ো অশান্তি, কী যে করব কিছুই ঠাণ্ডর করে উঠতে পারছিলুম না। সারা দেশও যেন আমারই মতো দিশেহারা হয়ে থম্কে দাঁড়িয়েছিল।

এই রকম যখন আমার মনের অবস্থা তখন আমার এক দাদা সুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী আমার বউঠাকরুন বরোদা থেকে কলকাতায় এলেন। দাদা সুপ্রকাশ তখন বরোদা মিউজিয়মের কিউরেটর ছিলেন। বউঠাকরুন যখন আমাদের বাড়িতে বউ হয়ে আসেন তখন তাঁর বয়েস মাত্র দশ আর আমার বয়েস সাত। সেই ছেলেবেলার হালকা আলোভরা দিনগুলোর অনেক খেলাধুলো ছুঁমির সঙ্গী ছিলেন আমার বউঠাকরুন। তিনি আর আমার দাদা আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন বরোদায়। সেটা ১৯২২ সালের কথা। বরোদাতে আলাপ হল ডাঃ স্মৃন্ত মেহতার সঙ্গে ও তাঁরি বাড়িতে আলাপ হোলো ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের সঙ্গে। ইন্দুলাল যাজ্ঞিক তখন গান্ধীজির অন্যতম শিষ্য, গুজরাটের কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে সেরা বলে গণ্য। ইন্দুলাল আমাকে আহমেদাবাদে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। আহমেদাবাদে পৌঁছলুম সকালে। তখনই সবরমতী আশ্রম দেখবার জন্য রওনা হলুম। নদীতে শুধু বালির ঢেউ চোখে পড়ে, কোথাও কোথাও ক্ষীণ জলের রেখা। নদীর ধারেই মহাত্মাজীর বাসস্থান। পাথরে তৈরি ছোট বাড়িটি; বারাণ্ডা আর বারাণ্ডা-সংলগ্ন ঘর। ঘরে দরজার বালাই নেই, কোনো আসবাবও নেই ঘরে। যতদূর মনে পড়ছে যীশু-খৃস্টের ছবি ঝোলানো ছিল দেয়ালে। অনেকক্ষণ গান্ধীজির কুটিরে বসে সমস্ত প্রাণ দিয়ে কঠোর তপস্যার গুচিটা অনুভব করতে লাগলুম। আমার বুকের মধ্যে আমার মন যে চির-জাগ্রত বৈরাগী! তাকে বাইরের জীবনের কত রঙিন ধুলো দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছি, তবুও সে কি বাগ মানে? যখনই সবরমতী আশ্রমের মতো কোনো জায়গায় গিয়ে হাজির হয়েছি তখনই সে বুকের পাঁজর ধরে কী ঝাঁকুনিই না মেরেছে আমাকে!

গুজরাটে দু'মাস কাটিয়ে ফিরে এলুম কলকাতায়। শরীর ও মন থেকে অবসাদের ধুলো ঝেড়ে ফেলেছি অনেক পরিমাণে। কাজ করবার জগ্

তাগিদ আসতে লাগল মনের ভিতর থেকে, কিন্তু ঠিক কী যে করব তা স্থির করে উঠতে পারছিলুম না। যা হাতের কাছে পাই তাই পড়ি, গান গাই, বাঁশি বাজাই, সকাল-সন্ধ্যে নিয়মিত ব্যায়াম করি, এমনি করেই আমার দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।

১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে গান্ধীজি ছাড়া পেলেন। তার কিছুদিন পরেই দেশবন্ধু হঠাৎ মারা গেলেন দার্জিলিঙে। দেশবন্ধুর মৃতদেহ দার্জিলিং থেকে কলকাতায় আনা হল। সকাল বেলা আমি আর চপলা শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে হাজির হলুম। স্টেশনের ভিতরে, স্টেশনের প্রাঙ্গণে, সাকুলার রোড আর হারিসন রোডে লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়। ট্রেন এল, মৃতদেহ ফুল দিয়ে ঢেকে শোভাযাত্রা শুরু হলো। হারিসন রোড আর সাকুলার রোড যেখানে এসে মিলেছে ঠিক সেইখানে রাস্তার একধারে মোটরের উপরে দাঁড়িয়ে মহাত্মাজী জনতাকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি কলকাতায় চলে আসেন। বিরাট জনতার সঙ্গে আমরাও চললুম দেশবন্ধুর শব অনুগমন করে। পথের ধারের দু'পাশের বাড়ি থেকে ফুল ঢেলে দিতে লাগল দেশবন্ধুর মৃতদেহের উপর। চৌরঙ্গী হয়ে শোভাযাত্রা থামল গিয়ে দেশবন্ধুর বাড়ির সামনে। সেখানে তাঁর মৃতদেহ নামানো হলো বাড়ির সামনে রাস্তার উপর কিছুক্ষণের জন্য। কেওড়াতলা শ্মশানের কাছাকাছি থেমে আমি আর চপলা ফিরে এলুম। আমাদের দুজনেরই মন ভারাক্রান্ত, চপলার চোখ উপরন্তু অশ্রুগিক্ত।

আমার মনের মাটিতে দেশবন্ধুর প্রভাবের কোনো চিহ্ন পড়ে নি। তাঁর রাজনীতি আমার মনকে কখনো টানে নি, তাঁর বক্তৃতাও আমাকে কখনো অভিভূত করে নি। গান্ধীজির বক্তৃতার আর কর্মের স্বাদ পাবার পর আর-সব নেতাদের বক্তৃতা, আচরণ ও কর্ম নেহাৎ পান্বে ঠেকতে লাগল আমার কাছে। গান্ধীজি দেশকে যে পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন, কংগ্রেসের বন্ধ্য রাজনীতিকে ফসল ফলাবার যে শক্তি তিনি দিলেন, তারপরে দেশবন্ধুর রাজনীতি দেশকে একপাও এগিয়ে দিতে পারে নি।

পৃথিবীর ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে যে উগ্র আশনালিঙ্গম দেশের অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে অতীতের ভালোমন্দ বিচার না

করে গোটা অতীতটার জয়গান করতে শুরু করে। যে লোক যত উগ্র উন্নততার সঙ্গে সেইটে করতে পারে, দেশের সার্থার লোকদের কাছ থেকে সে তত বেশি খাতির আদায় করে নেয়। অন্ধ গ্রাশনালিজমের খেলো ভাবপ্রবণতার ঝোঁকে বাঙালী অনেক বার নিজের দেশের নোংরাকে বুকে চেপে ধরে তার স্তবগান করেছে। হাটের লোক চাঁচিয়ে বাহবা দিয়েছে—আহা! দেশের প্রতি অমকের কী গভীর ভালোবাসা, দেশের নোংরাটাকেও সে বুকে স্থান দিয়েছে! আসলে কিন্তু এটা ভালোবাসা নয়, এটা নোংরামি বাঁচিয়ে রাখবার সর্বনাশী খেলা। এ কথা আমাদের জানা একান্ত দরকার যে গ্রাশনালিজম আর দেশের যেটা মহৎ, সত্য ও সুন্দর সাধনা ও সৃষ্টি, তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এ দুটো একেবারেই এক জিনিস নয়। রামমোহন রায় ভারতবর্ষকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন, কী শ্রদ্ধাই না তাঁর ছিল ভারতবর্ষের বিরাট সত্য সাধনার প্রতি। তাই বলে দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে কালীঘাটের পাঠাবলি, সতীদাহ প্রভৃতি জঘন্য কুসংস্কার তিনি কখনো মেনে নেন নি, কিন্তু তাদের সাফাই গাইতে তিনি কখনো চেষ্টা করেন নি। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই তিনি দেশের প্রতি সত্য ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছেন। দেশের প্রতি এই সত্য ভালোবাসার উদাহরণ শক্তিমান মানুষেরা কর্মের দ্বারা বারে বারে ধরে দিয়েছেন সকলের সামনে সকল দেশে।

দেশবন্ধু এ পথে গেলেন না। ভাব-বিলাসী বাঙালীর যেখানে দুর্বলতা, ঠিক সেই দুর্বলতা, ঠিক সেই দুর্বলতার উপর ঝোঁক দিয়ে বাঙালীর হৃদয় জয় করলেন তিনি। যে চলার পথ গান্ধীজির ব্যক্তিত্বের অগ্নি-শিখার দহনে শুকিয়ে এসেছিল সেই পথ দেশবন্ধুর ভাব-রসের বর্ষণে আবার চ্যাট্‌চ্যাটে হয়ে গেল। বাঙালী রাজনৈতিক ধুলোটে মন দিল। ভাব-রসের বর্ষণে চলার পথকে চ্যাট্‌চ্যাটে কোরে তোলাতে আমার ঘোর আপত্তি, ওতে কাদায় পা অবশ হয়ে যায়, চলা যায় না। বাঙালীর মন অতি সহজে জয় করবার জন্যে দেশবন্ধু ভাবোন্মদনার পন্থা নিয়েছিলেন, হাতে হাতে ফলও পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু এ পথ মুক্তির পথ নয়, সর্বনাশের পথ! তা ছাড়া এক দিকে যেমন ভাব-রসের

হোলিখেলা চলল বক্তৃতায় আর 'নারায়ণ' পত্রিকার পাতায়, অগ্নাদিকে বাঙলা দেশের রাজনৈতিক জীবনে সর্বপ্রকার নোংরামির বেপরোয়া আমদানি করা হল উদ্দেশ্য সাধনের জন্তে। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করাবার জন্তে যে কী সব জঘন্য কৌশল অবলম্বন করল স্বরাজ পার্টি, তা সেদিনের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল প্রত্যেকটি লোক জানে। রাজনৈতিক জীবনের সুর সেই যে নামিয়ে দিল স্বরাজ পার্টি তার জের এখনো চলছে বাঙলা দেশে।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর গান্ধীজি কলকাতায় রয়ে গেলেন এক মাস। দেশবন্ধুর বাড়িতেই তিনি থাকতেন। একদিন সকালে তিনি জোড়াসাঁকোয় এলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবার জন্তে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে আমন্ত্রণ জানালেন শান্তিনিকেতনে যেতে, গান্ধীজি সম্মত হলেন। গান্ধীজি যেদিন শান্তিনিকেতনে যাত্রা করলেন আমিও সেদিন চললুম শান্তিনিকেতন। সেবার শান্তিনিকেতনে প্রায় এক সপ্তাহ ছিলেন গান্ধীজি। দু'দিন সকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হল, আমরা চুপচাপ বসে তাঁদের আলোচনা শুনলুম। ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে গান্ধীজির অভিযান নিয়েই বেশির ভাগ আলোচনা হল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গান্ধীজি জাতীয়তাবাদের যে বেড়া তুলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। এতে দেশের অকল্যাণ হবে, আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব করতে হবে, এটা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ধারার বিরুদ্ধ পথ, এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বার বার বলছিলেন। এ জায়গায় গান্ধীজির সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুরের কোনো মিল ছিল না। একজনের সুরে বাজছিল শুধু বর্তমান, আর একজনের সুরে ধ্বনিত হচ্ছিল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

শান্তিনিকেতনের দোতালায় থাকতেন গান্ধীজি। মাঝের বড়ো ঘরটিতে খদ্দেরের চাদর-ঢাকা বিছানায় বসে তিনি চরুখা কাটতেন আর আগন্তুকদের সঙ্গে কথা বলতেন। দূর গ্রামগুলি থেকে শত শত লোক রোজ ভিড় করত এসে তাঁর বাস-ভবনের চারপাশে, একটিবারের মতো তাঁকে দেখবার জন্তে। সন্ধ্যাবেলা বারাণ্ডায় ক্যাম্পখাটে তিনি শুয়ে থাকতেন, আমরা বসতুম মাটিতে। তিনি আস্তে আস্তে আমাদের প্রশ্নের জবাব দিতেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় কি ভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন

চলেছিল তার গল্প করতেন। গান্ধীজির সঙ্গেই আমি শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসি। তার কিছুদিন পরেই শ্রীমতী এলো কলকাতায়, পরনে তার পাতলা শাড়ী। ঠাট্টা করে বললুম—বিলিতি শাড়ী আবার কবে থেকে পরা শুরু হল? উত্তরে শুনলুম—এটা বিলিতি সূতোয় বোনা শাড়ী নয়, এটা আহমেদাবাদ মিলের শাড়ী, সূতোও দিশি। বিশ্বাস হল না, তর্ক বেধে গেল। আমি মানতে চাইলুম না যে এত মিহি সূতো আমাদের দেশে তৈরী হয়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল গান্ধীজি তো কলকাতায়, তাঁর কাছে গেলেই তো মীমাংসা হয়ে যায়! ছুটলুম দু'জনে দেশবন্ধুর বাড়ি। রাস্তার দিকের বারাণ্ডায় মাটিতে পাতা বিছানায় বসে ছিলেন গান্ধীজি। হেসে অভ্যর্থনা করলেন আমাদের। মাটিতে বসলুম দুজনে, জানালুম তাঁকে তাঁর কাছে ছুটে আসবার হেতু। আমার হার হল।

বর্ষা ঘনিয়ে এলো। আকাশে কালো মেঘের ছুটোছুটি। লালবাড়ির (বিচিত্রা ভবনের) কোণে কদমগাছ ছেয়ে গেল ফুলে ফুলে। হঠাৎ খেয়াল হল বর্ষার গানের মজলিশ করলে তো হয়! অমনি বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে গান শেখাতে শুরু করলুম। সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করে রবীন্দ্রনাথকে লিখলুম কলকাতায় আসতে। তিনি এলেন, বিচিত্রা ভবনের দোতলায় হল গানের আসর। রবীন্দ্রনাথ বসলেন আমাদের সামনে, পড়ে শোনালেম দুটি কবিতা। তার পরের বার বর্ষা-মঙ্গলের আয়োজন করলুম বিচিত্রা ভবনের একতলায়। নন্দিতা তখন সাত-আট বছরের, নাচল সে “কদম্বেরি কানন ঘেরি” গানের সঙ্গে। কনক দাসের গলায় ‘অশ্রুভরা বেদনা’ রসের আবেশে মগ্নর করে তুলল শ্রোতাদের মন। গানের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দিল রজনীগন্ধার গন্ধ, কেয়ার সুরভি।

নানা রঙের সূতোয় বোনা আঁচলার মতো আমার জীবনটা তখন নানা রঙে রঙিন। তখনো একরঙা হয়ে যায় নি জীবন।

চলছি, মনের মধ্যে পথ নেই, শুধু চলার অভ্যেসের ঝোঁকে চলেছি। এই অর্থহীন চলা আমি চলছিলুম এই সময়। চোরিচোরার পর গান্ধীজি যখন আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন তখন আঘাত পেয়েছিলুম মনে। কোথায় একটা গলদ আছে সেটা অনুভব করছিলুম, কিন্তু বুঝি দিয়ে সেটা ধরতে পারছিলুম না। গভীর অসোয়াস্তি আঁচড়ে চলেছিলো বুকের

মধ্যে । যে চলার পথ মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল, সেই আলোয় ঝলমল-করা দিগন্ত-ছোওয়া পথ হঠাৎ যেন ছোটো হয়ে গেল, সরে এল হাতের নাগালের মধ্যে । দূরের ডাক আর বাজলো না সেই পথে, মনে হতে লাগল এ পথ আর মুক্তির দূতী নয়, এ পথ পায়ের শিকল, কারাগার । মনের মধ্যে সেই ছোট পথে এগোচ্ছি আর পেছোচ্ছি মাকুর মতো । কোনোই আনন্দ পাচ্ছি নে সে চলায়, অথচ অন্য পথও নজরে পড়ছে না । এই অবস্থায় পড়ে আমার মন সেদিন নাজেহাল ।

গান্ধীজির আর গান্ধীজির মতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সেদিন ছিলেন দেশবন্ধু আর ছিল তাঁর কর্মপদ্ধতি । স্বরাজ পার্টির নেতারা কিম্বা ঐ দলের মজলিশি নিয়মতান্ত্রিক বক্তৃতা-সর্বস্ব রাজনীতি—এ দুয়ের কোনোটাই আমার মনকে স্পর্শ করে নি । স্বরাজ পার্টির রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি মানা, পথ থেকে ড্রইং রুমে ফিরে যাওয়ার সামিল । আমি আদবেই রাজী ছিলাম না তাতে । গান্ধীজি যে পথে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে, সে পথের সত্যিকার স্বাদ পেয়েছিল আমার মন । সে পথ যখন ছোট বলে মনে হতে লাগল তখন এগিয়ে যাবার জন্তে ব্যাকুলতা জাগলো মনে । যে পথ দিগন্ত-প্রসারী বলে মনে হয়েছিল সে পথ কেন ছোটো হয়ে গেল, কেন আলো সরে গেল পথের বুক থেকে, আবার কোন্ পথ ধরব, সে পথই বা কোথায় নিয়ে যাবে— এই-সব প্রশ্ন তীরের মতো অহরহ বিঁধছিল বুকে । এগিয়ে যাওয়ার কথাই ভাবছিলাম সেদিন, পথ থেকে তল্লিতল্লা গুটিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবার কথা এক মুহূর্তের জন্তেও মনে আসে নি । স্বরাজ পার্টির পলিটিক্যাল সাইনবোর্ড আঙুল দেখাচ্ছিল পেছনে ঘরের দিকে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার দিকে নয় । আইনের বাঁধ-ভাঙা গণ-আন্দোলনের বিদ্রোহী জোয়ারের সঙ্গে কোলাকুলি করবার পর এ যেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের খিড়কীর পুকুরের পচা জলে চোখ-কান বুঁজে ডুব দেওয়ার ব্যবস্থা ! দেশের জনসাধারণ স্বরাজ পার্টির রাজনীতি কখনো গ্রহণ করে নি । গ্রহণ করেছিল শুধু উকিল, ব্যারিস্টার, ব্যবসায়ী আর জমিদার, এক কথায় সমাজের উপর তলার আর মাঝের তলার বাবুদল । এই বাবুরা তেতলা-দোতলায় যে রাজনৈতিক হুল্লোড় করতেন তার ধ্বনি সমাজের বিরাট একতলায় কখনো

পৌঁছয় নি। বাবুদের চিকণ কণ্ঠে আর ঘাই থাক, এ তাগদ আদবেই ছিল না।

মনের মধ্যে অশান্তি বেড়েই চলেছে। আগে যেমন নিঃসংশয় আনন্দে গান্ধীজির কথা গ্রহণ করেছিলুম, সেটা আর পারছিলুম না। বাস্তবের ধাক্কায় গান্ধীজির মতবাদের মধ্যে অনেক ফাটল দেখা দিল। চরখার স্তুতো দিয়ে ব্রিটিশ সিংহীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সাগর পার করে দেওয়া সম্ভব হবে, এই কল্পনায় মন আর সায় দিচ্ছিল না। ব্রিটিশ বেনের পকেটে লুটের টাকা কিছু কমে যেতে পারে, আগের মতো ভরা না থেকে পকেটটা কিছুটা চুপসেও যাবে হয়ত, কিন্তু তাতেই বা হবে কী? যে বিরাট লুট করে চলেছে ব্রিটিশ বেনের দল ভারতবর্ষে, তার কতটুকু অংশই বা সেটুকু যেটুকু বিলীতি কাপড়ের সিঁধকাঠি দিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকে নিয়ে যায় তারা? চরখার স্তুতো দিয়ে ব্রিটিশ সিংহীর নাকে স্ফুঁস্ফুঁ দেওয়া যেতে পারে, তাতে তার ঘুমের অস্ববিধা হবে হয়তো কিছুটা, কিন্তু তাই বলে স্ফুঁস্ফুঁ দিলে সে ভারতবর্ষ ছেড়ে পালাবে এ কথা আশাড়ে বলে মনে হতে লাগল। চরখার সমর্থনে আর-একটি যুক্তি পেশ করা হয়েছিল তখন। এই যুক্তি-দেখানেওয়ালাদের মতে চরখার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে আমরা যোগ স্থাপন করতে পারব। চরখা হচ্ছে গণ-সংযোগের উপায়। এই যুক্তিটা মানতে একটুও বাধা ছিল না, শুধু বাধা সৃষ্টি করলেন এই যুক্তির সমর্থকেরা চরখাকে গণ-সংযোগের একমাত্র উপায় বলে মানিয়ে নেবার জন্তে জবরদস্তি শুরু করে। নানা উপায়ে জনসাধারণের সঙ্গে যোগস্থাপন করা যায়, চরখা তার একটা উপায়। বিনি পয়সায় কিম্বা অতি অল্প মূল্যে ওষুধের ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়ে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন করে, জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার থেকে চাষীদের বাঁচাবার জন্তে গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ গঠন করে, এই রকম কত শত উপায় আছে জনসাধারণের মনে পৌঁছবার! জনসাধারণের মনে পৌঁছবার জন্তে দরকার দরদী মন। এই মনটা থাকলে উপায়ের কমুতি কখনো হয় না। কে বললে যে একমাত্র চরখার টাকা ঘুরিয়েই পথ কেটে যাওয়া যায় জনসাধারণের মনের দিকে, আর কোনো উপায়েই সেটা সম্ভব নয়! চরখাই গণ-সংযোগের

একমেবাদ্বিতীয়ম্ উপায়, এই যুক্তিহীন গোঁড়ামি প্রচার করেছিলেন সেদিন গান্ধীবাদীরা চরখা চালু করবার যুক্তিস্বরূপ। এই অন্ধ গোঁড়ামি স্বীকার করে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। জীবনের সমস্যা ও তাদের সমাধানের বহুমুখী উপায় চিরকালই থাকবে। একটা মনগড়া একপেশে সমাধান তৈরি করে সেইটিকে সমস্যা-সমাধানের একমাত্র উপায় বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা প্রমাণ করে বিচার-বুদ্ধির অভাব, বিশ্লেষণ-ক্ষমতার দৈন্য ও মনের আলসেমি। বাজারে এই একপেশে টোটকাগুলোর কাটতিও হয় বেশ, শুধু হয় না সমস্যার সমাধান, এই যা। জীবনের সমস্যাগুলির যে স্বভাবগত জটিলতা আছে তার চেয়েও তাদের মনগড়া বেশি জটিলতা আরোপ করা হচ্ছে ভাব-বিলাসীদের একটি অতিবুদ্ধির ঢঙ, তেমনি আবার একটি সমস্যার বহুমুখী প্রকৃতি বিশ্লেষণ না করে তার প্রকৃতির একটি বিশেষ দিককে তার গোটা প্রকৃতি বলে কল্পনা করে নিয়ে সমাধানের বিধান দেওয়া অল্পবুদ্ধির বাস্তিচার। মানছি যে এই ধরনের কাল্পনিক সমাধান সহজ আর সহজ বলেই আলসে মনের গালিকেরা এটা করে থাকে ; কিন্তু এই-সব সমাধানে মগজের ছাপ আদবেই নেই। ভাব-রসের বেলায় সহজিয়া পথ ধরা চলে, অন্তত লোকে ধরছে সে পথ। বিচারের ক্ষেত্রে কিন্তু সহজিয়া সাধনা সর্বনাশের চোরাবাঁলি, আলেয়ার হাতছানি। খিলাফৎ-আন্দোলনকে আমাদের দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গান্ধীজি যে ভয়ানক ভুলটি করেছিলেন সেটিও আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলুম এই সময়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগদান করবার জন্তে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী একদল ভারতীয়দের খিলাফতের ঘুঁষ দিয়ে স্বাধীনতার লড়াইতে টানতে হবে এটা গোড়া থেকেই আমার কাছে অশোভন ঠেকেছিল। অল্পদিনের মধ্যেই বাস্তবের আলোতে পরিষ্কার ধরা পড়ে গেল যে ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের টান দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের দিকে ততটা নয় যতটা খিলাফৎ-আন্দোলনের দিকে। যেটুকু তাঁরা দিয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে সেটা খিলাফৎ-আন্দোলনের ফায়দা হবে এই আন্দোলনে যোগ দিলে, এই পাটোয়ারী বুদ্ধির হিসেব-কষারই ফল। ইসলামের বিশ্বব্যাপী ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীকরণ বিপ্লবমূলক আন্তর্জাতিকতার বিরোধী তো নিশ্চয়ই, এমন কি, বুর্জোয়া

আন্তর্জাতিকতারও বিরোধী। ইসলামের এই ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীকরণ আন্তর্জাতিকতা তো নয়ই, এমন কি, এটা জাতীয় বিপ্লবেরও বিরুদ্ধ শক্তি। ইসলামপন্থীরা যে দাবি করে থাকেন যে তাঁরা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী নন, তাঁরা আন্তর্জাতিকতার উপাসক, সে দাবি এই ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধতাকে আন্তর্জাতিকতা বলে চালিয়ে দেবার ফাঁকির উপর প্রতিষ্ঠিত, ঠিক যেমন ইসলামের মাসাওয়াৎকে (সমতাকে) অর্থাৎ ধনী-গরিবের একই সঙ্গে নামাজ-পড়ার রীতিকে কমিউনিজমের সমতার নজীর হিসেবে চালিয়ে দেবার আশ্রয় চেষ্টা বিলকূল ফাঁকি। ইসলামের এই ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধতাকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন কামাল পাশা, বিদায় করে দিয়েছিলেন তাকে তুর্কী থেকে। তবেই না নব্য তুর্কীর বিপ্লবপন্থী জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে তুর্কীকে মুক্ত করতে পেরেছিল! মোলানা শোকত আলী ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অর্থে তুর্কী গিয়েছিলেন খলিফার হয়ে ওকালতী করবার জন্তে। সেখানে গৌড়ামিমুক্ত আওয়ানপন্থী মুসলমানদের হাতে প্রতিক্রিয়ার মেদময় মূর্তি এই মোলানা যে কি জ্বরদস্ত লাক্ষিত হয়েছিলেন তা রাজনীতির খবরদারীকরনেওয়ালারা সবাই জানেন। এই ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধতাকে আঘাত তো করলেনই না গান্ধীজি, এমন কি, তিনি এই উন্নত গৌড়ামির পাশ কাটিয়েও গেলেন না। এই খলিফা-কেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিক অন্ধতা কামাল পাশার প্রবল আঘাতে মুসড়ে পড়েছিল ও দম নিয়ে ঠেলে ওঠবার জোর খুইয়ে বসেছিল। খিলাফতের চুপ্‌সনো বেলুনে হাওয়া ভরে দিলেন গান্ধীজি। তিনি পুষ্ট করলেন ভারতবর্ষের জাতীয় বিপ্লব-বিরোধী এই প্রতিক্রিয়াকে। কামাল পাশার লাথি খেয়ে যে দানব কলসীর মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল ও ছিল বন্দী সেখানে, কলসী খুলে সেই দানবকে মুক্তি দিলেন গান্ধীজি। তার ফলে যে শুধু ভারতবর্ষের জাতীয় বিপ্লবের সর্বনাশ করা হল তা নয়, গৌড়ামির বিষাক্ত বাষ্পকে উড়িয়ে দেবার জন্তে ইসলামীয় দেশগুলিতে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার যে পূর্ববৈয়া বায়ু বইছিল, তাকে হটিয়ে দিয়ে সেই দেশগুলিতে সনাতনী প্রতিক্রিয়ার দুর্গন্ধময় বাষ্পকে আবার চাঙা হয়ে থিতিয়ে বসতে সাহায্য করলেন গান্ধীজি। হিন্দুদের দুর্ব্যবহার উপেক্ষা করে, ইংরেজের মতলবী উসকানি অগ্রাহ্য করে, ভারতবর্ষের মুসলমান

আন্তে আন্তে শিখছিল ভারতবর্ষকেই আপনার বলে বুঝতে, জানতে ও ভালোবাসতে। যে কোনো উপায়ে অসহযোগ-আন্দোলনের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের টেনে নেবার জন্যে খিলাফৎ-আন্দোলনে কংগ্রেসের সমর্থনের ঘুঁষ দিলেন তিনি তাদের। গান্ধীজিই তাদের দৃষ্টি ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধতার দানবের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। এমনি করে তিনি সেদিন ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টির অভাবে নিজের অজ্ঞানিতে সর্বনাশের যে বীজ বুনলেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, পাকিস্তান হল তারই ফসল।

স্বাধীনতা-আন্দোলন থেকে ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের সরিয়ে নেবার জন্যে সূচত্বর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা খিলাফতের দাবি মেনে নিল, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা-আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানদের যেটুকু শ্রোত বইছিল তাতে ভাঁটা পড়ে গেল। শৌকত আলি, মহম্মদ আলি স্বমূর্তি ধরলেন, গোষ্ঠীর লোকদের খুশি করবার জন্যে জাতীয়তাবাদের আলখাল্লা তাঁরা সাত তাড়াতাড়ি ঝেড়ে ফেলতেই তলা থেকে বের হয়ে পড়ল তাঁদের আসল সাম্প্রদায়িক মাজ— চাঁদমার্কী টুপি আর সবুজ আলখাল্লা।

হিন্দু সমাজকে খুশি করবার জন্যে গান্ধীজি জাতিভেদ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখলেন ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’ পত্রিকায় তাতে আমি দুঃখ পেয়েছিলুম। আমার পক্ষে জাতিভেদ মানা কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। এই প্রবন্ধে হিন্দু সমাজের চতুর্ভাগকে গান্ধীজি শাস্বত সমাজ-ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করলেন। জাতিভেদ-প্রথার উৎপত্তির ঐতিহাসিক কারণ সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তি করে গান্ধীজি দেখালেন যে প্রাচীন কালের সামাজিক ব্যবস্থায় কাজ ভাগ করে বেঁটে নেওয়ার চাহিদার তাগিদেই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি। এই ঐতিহাসিক আলোচনায় নতুন করে শেখবার কোনো কিছু না থাকলেও আপত্তি করবার কিছু ছিল না। প্রত্যেকটি সামাজিক প্রথার উৎপত্তির ঐতিহাসিক কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেই ঐতিহাসিক কারণের দোহাই দিয়ে তাকে শাস্বত বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা অবৈজ্ঞানিক তো নিশ্চয়ই, অশুচিতও। ঐতিহাসিক বিচার-পদ্ধতি আর যা প্রমাণ করুক না করুক এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে একটি প্রথার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে যাবার পর সেই প্রথার সামাজিক জীবনে জায়গা জুড়ে থাকবার কোনো ঐতিহাসিক কিম্বা সামাজিক অজুহাত নেই। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও

যে তারা থেকে যায় তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে থাকা মানুষের চলার পথের বাধা সৃষ্টি করে, সমাজের ধৈর্য-বাওয়া এগিয়ে-চলা স্রোতের মুখে রচনা করে মরা বালির বাধ। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ-প্রণালী ও বিচার-পদ্ধতি গান্ধীজি ব্যবহার করলেন বর্তমান কালে জাতিভেদ-প্রথার অস্তিত্বের সাফাই গাইবার জন্যে। ঐতিহাসিক বিচার-পদ্ধতি যেটা প্রমাণ করে সেটা হচ্ছে প্রতিটি সামাজিক প্রথার ও সামাজিক সংগঠনের সাময়িকতা, তার অবশ্যস্বাধী পরিবর্তন কিম্বা বিলুপ্তি। এই বিচার-পদ্ধতির একেবারে অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার করে ঠিক বিপরীতটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন গান্ধীজি। তিনি অস্পৃশ্যতার নিন্দা করলেন বটে কিন্তু তারই সঙ্গে হিন্দু-সমাজের বর্ণবিভাগকে শাস্ত বলে জাহির করলেন।

চতুর্বর্ণ প্রথাই যে অস্পৃশ্যতার হেতু, এই প্রথা যে মানুষের পক্ষে অসম্মানজনক ছোঁওয়াছুঁয়ির কলুষে ভরা, সেই কথা গান্ধীজি বেবাক এড়িয়ে গেলেন! তাঁর মামূলি যুক্তির বাঁধুনি ছিল ঢিলেঢালা; তাতে ফাঁক ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ভক্তদের ভক্তি-আবিল চোখে কবে কোন্‌দিন গুরুর কথার ফাঁক ধরা পড়েছে! ভক্তির মোঁ দিয়ে রচা মনের মোঁচাক একেবারে নীরেট, সেখানে বুদ্ধির মধু ভরবার এতটুকু ফাঁক থাকে না। গান্ধীজির ভক্তদের মনের মোঁচাকে সেদিন এতটুকু ফাঁক ছিল না। অন্ধ ভক্তির মোম দিয়ে প্রতিটি ফাঁক বুজিয়ে দিয়েছিল ভক্তেরা, আর এই ফাঁক না থাকাটাই তারা পরম সৌভাগ্য বলে ধরে নিয়েছিল।

যে আবহাওয়ার ছাঁচে আমার মনের কাঠামো ঢালাই হয়েছিল সে আবহাওয়ায় ভক্তির আবিলতা ছিল না, শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু সে শ্রদ্ধা ছিল বিচারশীল। ভাবালুতার ফেনায় চোখ কান নাক ভরে নিয়ে সব-কিছু নির্বিচারে গ্রহণ করবার নির্দেশ ছিল না সেই আবহাওয়ায়। বিচার, গ্রহণ ও বর্জন এই তিনটি খুঁটির উপরই না চিন্তার ইমারৎ রচনা। এর একটি খুঁটিও সরানো চলে না, সরালে চিন্তার ইমারৎ ধসে পড়বেই। আমাদের পরিবারে পৈতে নেওয়ার রেওয়াজ ছিল। পৈতে নিতে আমার অমত জানিয়ে দিই আমার পিতাকে। তিনি যদি জোর করতেন তা হলে আমাকে পৈতে নিতেই হত, কিন্তু জোর করে কাউকে কিন্তু মানাবার লোক তিনি ছিলেন না। তাঁর চরিত্রের আভিজাত্য ও উদারতা এমনই

ছিল যে কাউকে জোর করে কিছু মানাবার অশালীনতা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। আমি পৈতে নিই নি। আমার পৈতে না নেওয়ার পরে পৈতে নেওয়ার রেওয়াজ উঠেই গেল আমাদের পরিবারে। আদি-ব্রাহ্মসমাজে ও আমাদের পরিবারে হিন্দুয়ানির গোঁড়ামি যথেষ্ট ছিল। পৈতে নেওয়ার রেওয়াজ তার মধ্যে একটি। আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দেবার কড়া অমুশাসন ছিল। অন্য জাতের সঙ্গে বিয়ে ছিল নিষিদ্ধ। এই-সব সনাতনী রীতি বহুদিন থেকে চলে আসছিল আমাদের বাড়িতে। আমার বেড়া-ভাঙা মন ধাক্কা খেতে লাগল এই-সব কুৎসিত অর্থহীন নিষেধের বেড়াতে। আমার মন ফণা তুলে গর্জে উঠল বাড়ির এই-সব সনাতনী রীতির বিরুদ্ধে। তাই হিন্দুয়ানীর জাতের গোঁড়ামি বাঁচানোর জন্তে গান্ধীজির প্রচেষ্টা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কোনোমতেই সম্ভব ছিল না।

গান্ধীবাদের উপর আমার নিটোল বিশ্বাস এমনি করে টোল খেল। বাস্তবের আঘাতে বিশ্বাস তুবড়ে গেল বটে কিন্তু ভেঙে যায় নি। আমার তুণে তখন কমিউনিস্ট মতবাদ ও অনেকান্ত ভূতবাদের (ডায়ালেক্টিকাল মেটেরিয়ালিজম) ধোঁওয়ানাশন তীরগুলো জোগাড় করা হয় নি। গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করল আমার সংস্কার। যে সংস্কারের ছাঁচে আমার জীবন ঢালাই হয়েছিল সে সংস্কার সহজে হার-মাননেওয়াল ছিল না। আমার বাড়ির সংস্কারকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমি গান্ধীজির টানে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিলুম, গান্ধীবাদ গ্রহণ করেছিলুম। আমি আগেই বলেছি যে সেই গ্রহণের মধ্যে বিচার ছিল না, ছিল আবেগের বাষ্প ব্রিটিশ-বিদ্বেষ আর ছিল স্বাধীনতার তৃষ্ণা।

ঘটনার পর ঘটনার আঘাত হেনে বাস্তব-ব্রাহ্মসমাজ যখন আমার বুকের পাজির ধরে বাঁকাতে শুরু করল তখন শুরু হল বিচার। যখন আন্দোলনের জোয়ার বইছিল তখন এত মুগ্ধ ছিল আমার মন গণ-আন্দোলনের ঢেউয়ের গর্জন শুনে যে বিচার করবার শক্তিই আমার ছিল না। আবেগ আর দেশের প্রতি ভালোবাসার স্রোত দিয়ে বোনা আমার একান্ত বিশ্বাসের দুহস্তিকে ঘটনার তপ্ত লোহার ছেঁকা দিয়ে পুড়িয়ে দিল বাস্তব। তখন সেই দুহস্তির ঠাস-বুহনির বুক জুড়ে দেখা দিল বহু ফুটো। তবুও গান্ধীবাদ

থেকে আমার মন তখনো একেবারে সরে যায় নি। বিনামূল্যে পাওয়া আমার বংশগত সংস্কারের ধাক্কায় গান্ধীবাদকে আমার মন থেকে একেবারে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। জোড়াসাঁকোর বাড়ির সংস্কারের মধ্যে অনেক কিছু ছিল যা অমিতশক্তিশালী, অন্য দিকে তার মধ্যে এমন অনেক কিছু ছিল যা জমিদার-পরিবারের বনেদী দুর্বলতার ক্লেদে কলুষিত। চিন্তার উদ্দেশ্য চিন্তাই, এই ভাব-বিলাসিতা ছিল সেই সংস্কারের মধ্যে। জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাববিলাসী আত্মকেন্দ্রিক জীবনের সংস্কার শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল আমাদের বাড়িতে। দু'মুখো তরোয়ালের মতো, এই দু'মুখো সংস্কারের চিন্তার দিক ও রস-সৃষ্টির দিক ছিল খরধার আর কর্মের দিকটা ছিল ভাব-বিলাসে মর্চে-পড়া, ভোঁতা। এই সংস্কারের বুনুনিতে চিন্তার ও কর্মের মধ্যে আত্মিক ঐক্যের অভাব থাকায় চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় এই সংস্কার গান্ধীবাদের অসারত্ব প্রমাণ করলেও তাকে পরাস্ত করতে সমর্থ হল না। আমি তখন হাতড়ে ফিরছি এমন একটি মতবাদ যে-মতবাদে চিন্তার সঙ্গে কর্মের বিরোধ নেই, অসংগতি নেই, আড়ি নেই।

এমনি করে হাতড়ে ফিরছি আমি এমন সময় হঠাৎ একদিন একটি বই হাতে পড়ল। আমার ছিল পুরানো বইয়ের দোকানগুলোতে যাওয়ার রোঁতাত। বড়ো ভালো লাগত পথের ধারে দাঁড়িয়ে বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে। কলেজ স্ট্রীটে কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির পিছনে একটি পুরোনো বইয়ের দোকান ছিল। কলেজে পড়বার সময় রোজ একবার সেই দোকানে ঘুরে যেতুম। পরেও যখন ওধার দিয়ে যেতুম একবার সেই দোকানে উকিঝুঁকি না মেরে চলে যেতে মন সরত না। একদিন বিকেলে এই পুরনো বইয়ের দোকানে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটি বই নজরে পড়ল। বইটির নাম—‘দি সোশালিস্ট ফ্যালাসিজ’। একটু উন্টে-পান্টে দেখে বইটি কিনে ফেললুম। কলেজে পড়বার সময় অর্থনীতিতে ছিল আমার ঝোঁক, ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে আমি বি. এ পাস করি। কলেজে নামী জাঁদরেল অধ্যাপকদের কাছে পড়েছি—কয়াজী, সেনগুপ্ত, এরা আমাদের অর্থনীতি পড়াতেন। মার্শাল, পিয়ারসন্ প্রভৃতি যে-সব অর্থ-নীতিবিদদের বই আমরা পড়তুম সে-সব বই এই ধনতান্ত্রিক সমাজের

কাঠামোটিকে অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সত্য বলে মেনে নিয়ে এই সমাজ-ব্যবস্থায় সওদার দাম, মজুরের মজুরী, জমির খাজনা, উৎপাদকের মুনাফা কিভাবে নির্ণয় হবে সেটা আমাদের শেখাত। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সমর্থক ও সাফাইগানেওয়ালারা অর্থ-নীতিবিদদের বই পড়ে এই সমাজ-ব্যবস্থার যথার্থ উৎপাদক যারা সেই চাষী-মজুরদের কিভাবে ঠকানো হয় তার কোনো হদিশ আমরা পাই নি। প্রকৃতির এলাকায় যেমন দেহের আয়তনের বৈষম্য রয়েছে, সব মানুষ তো আর ছ' ফিট উঁচু নয়, কেউ বা ছ' ফিট, কেউ বা সাড়ে পাঁচ, তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনী, গরিব থাকবে এটা স্বাভাবিক, এটা প্রকৃতির নিয়ম! ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার এই হাঙ্গুর সাফাই আমরা অহরহ শুনতুম অধ্যাপকদের মুখ থেকে। সোশালিজম আমাদের পড়ানো হত না আদবেই, তবে সোশালিস্ট মতবাদের প্রহসন করে সেটাকে সোশালিজম বলে চালিয়ে দিয়ে তার বিরুদ্ধে কী কী যুক্তি আছে সেইটে আমাদের শোনানো হত। সোশালিজমের বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তি দেওয়া হত তাদের মধ্যে একটি যুক্তি আজও আমার মনে আছে। যুক্তিটি ছিল এই—‘সোশালিজম’ বলে ধনী শ্রেণী না থাকলে গরিবদের দুঃখ দূর হবে, তা কি কখনো হয়? হিমালয়টা গুঁড়ো করে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিলে, পৃথিবীর উচ্চতা কতটুকু বাড়বে? এই আঘাতে যুক্তি সোশালিজমের বিরুদ্ধে চরম যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করতেন আমাদের অধ্যাপকেরা। বুদ্ধির এমনি মূর্তিমান ভরা-ডুবি ছিলেন আমাদের অধ্যাপকেরা আর এমনি অশিক্ষার ঘানিতে জুড়ে দিয়ে আমাদের বছরের পর বছর ঘুরিয়ে মারা হত। আর একেই বলা হত শিক্ষা-ব্যবস্থা!

সোশালিজম সম্বন্ধে কিছুই সত্যি করে জানতুম না তখন, অধ্যাপকদের রূপায় যেটুকু জানলুম সেটুকু হচ্ছে এই যে সোশালিজম একেবারে দেউলে মতবাদ, ওটা খাপামি ছাড়া আর কিছু-ই নয়। ধনী গরিব থাকবেই ওটা চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়ম। অতএব ধিক্ সোশালিজমকে, শত ধিক্! যারা সোশালিজমের কথা বলে তারা ধিক্ তো বটেই, উপরন্তু তারা নিপাত হোক।

তবুও মনের মধ্যে অসোয়াস্তির আগুন ধিক্ ধিক্ জ্বলতেই লাগল। অধ্যাপকেরা তাঁদের যুক্তির ভিজে গ্যাকরা জড়িয়ে এই আগুন নেবাবার

যত চেষ্টাই করুন-না কেন, এ আগুন নিবোতে পারলেন না। তাঁদের যুক্তির বিরুদ্ধে খাড়া করি এমন যুক্তি আমার জ্ঞানের অঙ্গাগারে ছিল না সেদিন। তবুও মন মানছিল না সেই যুক্তিগুলো। এই অত্যাচার, অনাহার ও হাহাকার এটা মানব-সমাজের চিরন্তন নিয়ম কখনোই হতে পারে না এ কথা বার বার বলছিল আমার মন। জ্ঞানের হাজার-মহল বাড়িতে কত ধরনের বিষয়-বস্তু কত মহল জুড়ে রয়েছে। প্রত্যেকটি বিষয়-বস্তুর নিজস্ব মহল আছে, তার অভিব্যক্তির বিশেষ নিয়মও আছে। তবুও সেই হাজার-মহল বাড়ির প্রত্যেক মহলের সঙ্গে অন্য মহলের যোগ আছে এবং প্রত্যেকটি বিষয়-বস্তুর উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি একটি বিশেষ নিয়মে বিধৃত হলেও সব বিষয়গুলির মধ্যে একটা যোগসূত্রও আছে। বিষয়-বস্তুগুলির টুকরো টুকরো আলাদা আলাদা নিয়মগুলোর মধ্যের এই যে যোগসূত্র, এটা আসলে কি? এটা কি একটা আধিদৈবিক নির্বাক যোগসূত্র? আদবেই তা নয়, এ যোগসূত্র হচ্ছে সম্পূর্ণ আধিতৌতিক, মানবীয় যোগসূত্র। মানব-সমাজের কল্যাণের অথও যোগসূত্রে এই বিষয়গুলির থও জ্ঞানকে গেঁথে নেওয়াই হচ্ছে মানুষের ব্রত। আর এই চেতনাও মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের বহু সংঘাতের ফল। তাই অর্থনৈতিক যুক্তি যদি বৈষম্যের সাফাইও গায়, বহু দুঃখ-লব্ধ মানুষের সামাজিক চেতনা তাকে অস্বীকার করবেই করবে।

‘সোশালিস্ট ফ্যালাসিজ’ বইটি নিয়ে বাড়ি ফিরেই পড়তে শুরু করলুম। প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সমবায় সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপন করবার যত স্বপ্ন মানুষ দেখেছে, কাল্পনিক সোশালিজম্ থেকে বৈজ্ঞানিক সোশালিজম্ পর্যন্ত, সমস্ত মতবাদকে লেখক আমার, যুক্তিহীন প্রমাণ করবার জন্তে এই বইটি লিখেছেন। সোশালিজমের শত্রুর লেখা এই বইখানি পড়ে সোশালিজমের যথার্থতা সন্দেহে আমি নিঃসংশয় হলুম। সোশালিজমের স্বপক্ষের যুক্তি যেগুলো লেখক ভ্রান্ত বলে দেখাতে চেষ্টা করেছেন সেগুলো আমার কাছে অকাট্য অপ্রাস্ত যুক্তি বলে মনে হল। শুরু করলুম সোশালিজম্ সন্দেহে পড়াশুনো। কিন্তু কী বই যে পড়ব সোশালিজম্ সন্দেহে এ-বিষয়ে কিছুই সত্যি করে জানা ছিল না। সেদিনের কথা যখন কখনো কখনো মনে পড়ে তখন আমাদের তখনকার অবস্থা মনে করলে

নিজেদের তারিফ করতে ইচ্ছা করে। সোশালিজম্ সম্বন্ধে কিছুই তখন জানতুম না, আজকের মতো জানার সুযোগও তখন ছিল না। সোশালিজম্ সম্বন্ধে বই তখন এদেশে আসত না বললেই চলে। এমন কাউকে জানতুমও না যার কাছ থেকে এ-বিষয়ে কোনো সাহায্য পেতে পারি। আমরা যারা সেদিন এ পথে এসেছিলুম আমাদের মধ্যে আন্তরিকতার একটা প্রচণ্ড আবেগ ছিল। জানতেই হবে, শিখতেই হবে, নিজেদের তৈরি করতেই হবে কাজের জন্তে, এই ছিল আমাদের প্রাণের কথা। আজকে যেমন মতবাদ রেঁধে বেড়ে পরিবেশন করে দিলেও সেটা একটু কষ্ট করে তুলে খেতেও এ কালের ছেলেমেয়েরা রাজী নয়, আমাদের সময়ে ঠিক এর বিপরীতটা ছিল সত্যি। জানবার তৃষ্ণায় অধীর হয়ে কী পাগলের মতো ছুটোছুটিই না করেছি আমরা, কী আকাশপাতাল হাতড়াতেই না হয়েছে আমাদের! আমেরিকা-ফেরত এক আত্মীয়ের কাছ থেকে জন স্পার্গো বলে এক ভদ্রলোকের লেখা মার্কসের জীবনী পেলুম। এক নিশ্বাসে চুমুক দেওয়ার মতো করে পড়ে ফেললুম বইটা। সেই বইতে পেলুম সোশালিজমের উপর কয়েকটি বইয়ের ফর্দ, মার্কসের ও এঙ্গেলসের লেখা বইগুলোর তালিকা। বইয়ের দোকান, লাইব্রেরি হাতড়ে ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’ জোগাড় করলুম। পড়লুম বটে কিন্তু তার অনেক কিছুই বুঝতে পারলুম না। চিন্তার এত ঠাসবুনি এই ছোট বইটিতে যে ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতি এইগুলির জুতসই জ্ঞান না থাকলে ওর আসল মর্মটি পুরোটা ধরা যায় না, কেমন যেন পিছলিয়ে যায়। কিছুটা কিছুটা বুঝলুম, কিছুটা কিছুটা তলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল। এই সময়ে রুশীয় বিপ্লব সম্বন্ধে লেখা প্রাইসের বইটা হাতে এল। হাতে এল আর একটি বই, নাম তার ‘নারী ও রাজনীতি’। ইতিহাসের অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণ-নীতির সঙ্গে এই বই-ই ঘটালো আমার প্রথম পরিচয়। আমার মন একেবারে বেঁকে বসল, কিছুতেই সে রাজী নয় এই নীতি মানতে। মন রেগে চোঁচিয়ে উঠল, বলল—এও কি কখনো সম্ভব যে মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু ঘটেছে ও ঘটছে তা সবই অর্থ নৈতিক কারণে ঘটেছে? এ কখনোই হতে পারে না, এ নীতি মানুষকে চার পায়ে হাঁটাতে চায়, সেটি কখনো হতে দেব না, সেটা কখনো সত্যি নয়। বইটার

কথা মানতে পারছি নে অথচ বইটা ছাড়তেও পারছি নে। বার বার বইটা পড়লুম আর প্রত্যেক বারই মন ভীষণ রাগ করে চোঁচায়, ভড়কে দেয় আমাকে। রক্তের সঙ্গে মিশে-যাওয়া ধোঁওয়াশ্রয়ী ‘আধ্যাত্মিক’ সংস্কার যে এই নীতির ধাক্কা খেয়ে এ রকম করে চোঁচাবে তাতে আর আশ্চর্য কি? সংস্কার রেগে বুকের মধ্যে আঁচড়াতে লাগল, বললে ফিস্ফাস্ করে— ভগবানকে তুমি মানো না অনেকদিন তা জানি, কিন্তু তাই বলে মানুষের ‘আত্মা’ ‘আধ্যাত্মিক দৃষ্টি’ ‘আদর্শানুরক্তি’ এগুলোকে কি তুমি মানো না? শুধু স্বার্থের খাতিরে, অর্থনৈতিক চাবুকের তাড়নায় মানুষ তার সামাজিক ইতিহাস তৈরি করে আসছে এত দিন, এই কথা তুমি বলতে চাও? চুপ করে রইলুম, আমি নিজেই তখন অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছি, তীর পাচ্ছি না, অণ্ডকে বলবই বা কী, বোঝাবই বা কী! পরে যখন ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ-নীতির যথার্থ ধারণা করতে পারলুম তখন বুঝলুম যে দুর্বুদ্ধি শত্রুর চেয়ে নিবুদ্ধি মিত্র কম ভয়ংকর নয়। দুর্বুদ্ধি শত্রুর চেয়ে কমিউনিস্ট মতবাদের কম ক্ষতি করে নি নিবুদ্ধি মিত্র। জ্ঞানের অভাবে কমিউনিজমের যান্ত্রিক বিশ্লেষণ করে তারা কমিউনিজমকে বিকৃত রূপে ধরে দিয়েছে লোকের সামনে। আমার ভাগ্যদোষে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ-নীতির সঙ্গে আমার পরিচয় এই নীতির এমনি একটি কাঠ-কাঠ যান্ত্রিক বিশ্লেষণ মারফত। কমিউনিজম কিংবা ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ-নীতি এ কথা কখনো বলে না যে একমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থের খাতিরে মানুষ সব-কিছু করেছে কিংবা ইতিহাসের ধারার মূল হচ্ছে নিছক অর্থনৈতিক মূল। এই বিকৃত ধারণার জন্য দায়ী কমিউনিজমের শত্রুদের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার আর কমিউনিজমের নিবুদ্ধি বন্ধুদের কাঠমোলাগিরি।

কমিউনিজমের সঙ্গে আমার পরিচয় যখন সবে শুরু হয়েছে তখন রাশিয়া থেকে সত্যপ্রত্যাগত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হোয়ে গেল একদিন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। বিচিত্রা-ভবনে রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন। আমি তাঁর ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় তাঁর ঘর থেকে একজন গৌরবর্ণ স্থপুরুষ বের হয়ে এলেন। অপ্রত্যাশিত দেখার মতোই হল আমাদের অপ্রত্যাশিত আলাপ। শুনলুম তাঁর কাছে তিনি আফগানিস্থান হয়ে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, সেখানে এক বৎসর থাকবার

পর ইয়োরোপে হয়ে দেশে ফিরেছেন সম্প্রতি। তখনি তাঁকে আমন্ত্রণ জানালুম যত শীঘ্রি সম্ভব একদিন আসতে। শিবনাথ এল, তার কাছ থেকে কোঁচড় ভরে কুড়লুম রাশিয়ার খবর। শিবনাথ লেনিনকে দেখেছিল, তাঁর বক্তৃতাও শুনেছিল সে। ওর কথা শুনে মনে হতে লাগল যে এতদিনে বুঝি একজন লোক পেলুম যে বন্ধ দরজা খুলে নতুন জগতে প্রবেশ করবার মন্ত্র জানে। একদিন কথায় কথায় তার সঙ্গে তর্ক বেধে গেল। অসহযোগ আন্দোলনের ও গান্ধীজির তীব্র সমালোচনা শুরু করল সে, আমি কেন জানি না সহ্য করতে পারলুম না তার সমালোচনা। কথার বাণ কাটাকাটি চলল আমাদের দু'জনের মধ্যে অনেকক্ষণ। তর্কের বিষয় ও কথা-কাটাকাটি ঝাপসা হয়ে গেছে মনে। তবু গান্ধীবাদের সমর্থনে আমি যে তর্ক করেছিলুম তার থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে গান্ধীবাদের সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ তখনো আমি ছিন্ন করে উঠতে পারি নি। তখনো আমার মনের মধ্যে নতুন পথ জেগে ওঠে নি, শুধু তার সম্ভাবনার ইসারা পাচ্ছিলুম আমি মনের মধ্যে। শিবনাথের কাছেই আমার রুশীয় ভাষা শেখবার হাতে খড়ি হল। খুব অল্পদিন তার কাছে পড়েছিলুম কিন্তু তবুও অন্তত এ বিষয়ে সে আমার গুরুগিরি করেছে এ কথা মানতেই হবে। শিবনাথের পথ আর আমার পথ বহুদিন থেকে একেবারে ভিন্ন-মুখিন। পথে চলার সময় আমরা দু'জনে দুজনকে মিষ্টি কথা পরিবেশন করি নি ও আদবেই রেহাই দিই নি, আর সেটা স্বাভাবিকও, বিশেষ করে যখন আমরা দু'জনেই যা ধরি তা সারা মন দিয়ে মুঠো করে আঁকড়ে ধরি। তবু সংঘাতের ধুলো ঝড় তোলবার পর আবার যখন থিতুয়ে যায় পথের উপর, তখন চব্বিশ বছর আগের দিন মনে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে রাগের ধুলোও থিতুয়ে যায় মনে। আমার নিজের কথাই বলছি, কেননা শিবনাথের মনের খবর আমার জানা নেই।

কমিউনিজম্ সম্বন্ধে নানা বই পড়তে পড়তে শ্রেণী-সংঘাতের অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে এল। বুঝলুম তখন বিপ্লবের মানে কী, আর বিপ্লবের শক্তিই বা কোথা থেকে আসে। এতোদিনে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র প্রতিপাদ্য বিষয় আমি ঠিকমতো বুঝতে পারলুম। শ্রেণী-সংঘাতের অপর নামই যে রাজনীতি, রাজনৈতিক ইতিহাস যে আসলে শ্রেণী-সংঘাতের

ইতিহাস, সেটা আমার কাছে পরিস্কার হয়ে গেলো। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল যে একটি শ্রেণীবিশেষের দল, শুধু সেই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করা ও স্বার্থ পুষ্ট করাই যে সেই রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য, এটা যখন বুঝতে পারলুম তখন গান্ধীবাদের আর কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিস্কার হয়ে গেল। গান্ধীবাদের উপর বিশ্বাস হারালেও এত দিন সংশয়ের অঁথে জলে হাবুডুবু খাচ্ছিল আমার মন। এবার সে পৌঁছল গিয়ে কূলে। সবল পায়ে নিঃসংশয় মনে সোজা হয়ে দাঁড়ালুম আমি কমিউনিজমের তীর-ভূমিতে। গান্ধীবাদের সঙ্গে আমার চিরকালের জন্তো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

এমন সময় একদিন ডাক এল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছোটো মেয়ে আমার বর্গদিদির কাছে থেকে। তাঁর দক্ষিণে যাবার সখ হয়েছে, আমার উপর হুকুম হল তাঁকে নিয়ে যেতে হবে। তীরে পৌঁছবার জন্তো নিজের সঙ্গে এত দিন যে লড়াই করে আসছিলুম তাতে ক্লান্তি কুয়াশার মতো আচ্ছন্ন করেছিল আমাকে। দক্ষিণে যাবার সম্ভাবনা ঘটায় খুশি হলুম। নতুন পথে যাত্রা শুরু করবার আগে শরীর ও মন আলো-বাতাসে ধুয়ে নেবার দরকার ছিল। কত ঘোরাই না ঘুরলুম সেবার বর্গদি আর আমি! ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ, মহাবলিপুরম, তাঞ্জোর, মাদুরা, ত্রিচিনোপলি, রামেশ্বরম্, সব ঘুরেছিলুম সেবারে দু'জনে। মহাবলিপুরম্ যে কী ভালো লেগেছিল তা বলে শেষ করতে পারি নে। লোকের বাস নেই বললেই হয়, দূরে জেলেদের গ্রাম, সেখান থেকে তারা আসে মহাবলিপুরমে। মন্দিরের পুরোহিত, লাইট-হাউসের লোক আর জেলেরা, এ ছাড়া জন-মনিষি নেই সেখানে। কয়েকটি মন্দির সমুদ্র লুকিয়ে নিয়েছে ঢেউয়ের আঁচলের তলায়। তীরের উপর বালির আলিঙ্গনে বন্দী ছোট্ট একটি মন্দির। জোয়ারের সময় ঢেউয়ের হাত বাড়িয়ে দেয় সমুদ্র মন্দিরটিকে স্পর্শ করবার আগ্রহে। তীরের উপর পাইনের বন, যেন সমুদ্রের নীল ঢেউয়ের সঙ্গে রেশারেশি করে পৃথিবী সবুজ ঢেউ তুলেছে তীরের বুকে। মনে হয় যেন কত শতাব্দীর স্বপ্ন এই মন্দিরটিকে ঘিরে রয়েছে। সারারাত আমি ঘুমোই নি, নির্জন বালির পথে চাঁদের আলোতে ঘুরে বেড়িয়েছি। এমন একটা স্বপ্নভরা জায়গা আমি আর দেখি নি কোথাও। এখানে

এলে বর্তমানের সব খেই হারিয়ে ফেলে মানুষ। তারপরেও দু'বার আমি মহাবালিপুর্মে গেছি আর দু'বারই আমার মনে হয়েছে যেন আমি বর্তমানের সঙ্গে সব সম্পর্ক-হারা কাহিনীর অবাস্তব-পুরে এসে হাজির হয়েছি।

দক্ষিণের মন্দিরগুলো স্থাপত্য-কলার অপূর্ব নিদর্শন। গোপূরম্ থেকে মন্দিরের গর্ভগৃহে যেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, সে পর্যন্ত প্রত্যেকটি সৃষ্টি একই মূল ভাবের সূত্রে গাঁথা। গোপূরম্ দিয়ে ঢুকেই বিরাট প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের মধ্যে শিবের ষাঁড়ের প্রস্তরমূর্তি। তারপরে কয়েকটি ধাপ উঠে আর-একটি প্রাঙ্গণ, তারপর নাটমন্দির, তারপরে অঙ্ককার গর্ভগৃহ যেখানে বিগ্রহ বিরাজমান। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ধাপের পর ধাপ উঠে মানুষ পৌঁছয় গিয়ে সেই অঙ্ককার ঘরে যেখানে ভগবান আছেন। এই ভাবটিকেই মূর্তি দেবার জন্তে মন্দিরগুলি এই ভাবে তৈরি করা হয়েছে। বিরাট মন্দিরগুলোর অটল গাভীর মনকে অভিভূত করে। স্থাপত্য-কলার নিদর্শন হিসেবে মন্দিরগুলো যতই ভালো লাগুক-না কেন, মাছুরা, তাজোর, ত্রিচিনোপলি প্রভৃতি শহরগুলো যেন ধর্মের শিক দিয়ে তৈরি দম-বন্ধ-করা খাঁচা। সে যে কি এক অসহ্য আবহাওয়া এই শহরগুলোর! মন্দিরগুলো যেন থাবা দিয়ে মানুষগুলোকে টেনে নিয়ে চেপে রেখে দিয়েছে সংস্কারের পাথরের তলায়। ছেলে বুড়ো সবার কপালেই ফোঁটা, সবাই চলেছে মন্দিরের দিকে। মন্দিরে যাওয়া ছাড়া যেন আর কোনো কাজ নেই। জীবনকে এরা যেন একেবারে সঁপে দিয়েছে মন্দিরের হাতে। ধর্মের এই অসহ্য গুমোটে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল, মন্দিরগুলো দেখে কলকাতায় ফিরে এসে বাঁচলুম।

একদিন কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে কলেজ স্কোয়ার-মুখো চলেছি, হ্যারিসন রোড আর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের কোণে ফিরিওয়ালাদের হাতে একটি নতুন কাগজ নজরে পড়ল। পত্রিকাটির নাম 'লাঙল'। নতুন ধরনের নামটি লাগল ভালো। পত্রিকাটি নিয়ে বাড়ি ফিরলুম, পড়ে দেখলুম যে শ্রমিক-কৃষক দলের নাম দিয়ে একটি দল সৃষ্টি হয়েছে, সেই দলেরই মুখপত্র হচ্ছে 'লাঙল'। তখুনি চিঠি লিখলুম 'লাঙলের' অফিসের ঠিকানায়। দলের তরফ থেকে শ্রামসুন্দীন সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে জোড়াসাঁকোয় এলেন।

তার দু'-তিন দিন বাদেই আমি হাজির হলাম গিয়ে 'লাঙলে'র আফিসে। ৩৭ নং হ্যারিসন রোডে একটি মেসের দোতলায় দু'টি ঘর নিয়ে শ্রমিক-কৃষক দলের ও 'লাঙলে'র আফিস ছিল। মনে আছে সেই বিকেল বেলাটা। আমি গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। তখন আমার খালি পা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরনে খদ্দর। ঘরের মধ্যে এক ছোট্ট মানুষ বসে ছিলেন, শরীর তাঁর ক্লশ, মুখ বিবর্ণ। শামসুদ্দীন সাহেব আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি হচ্ছেন মুজফ্ফর আহমেদ। পাশের ঘর থেকে লম্বা রোগা একজন বেরিয়ে এলেন। আলাপ হল, শুনলাম তাঁর নাম নলিনী গুপ্ত। একটি অল্পবয়সী ছেলে সেখানে বসে ছিল, শামসুদ্দীন আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন— এ আমার ছোটো ভাই, হালিম। প্রথম দিন মুজফ্ফরের সঙ্গে আলাপ হোলো। শ্রমিক-কৃষক দলের সম্বন্ধে আলোচনা করলাম দু'জনে। ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত তখন এই দলের সভাপতি, অতুল গুপ্ত সহ-সভাপতি আর হেমন্ত সরকার জেনারেল সেক্রেটারি। স্বরাজ পার্টির তখন নাতিশ্রাস উঠেছে, দেশবন্ধু চলে গেছেন, তাঁর ভক্তগুলীর মধ্যে তক্তাউস দখল করবার জন্তে তখন নখদস্তের খুব জোরালো ব্যবহার চলেছে। সেই সময় হেমন্ত সরকার শ্রমিক-কৃষক দলে যোগদান করেন। দু'-তিন দিন বাদে আবার গেলুম 'লাঙল' আফিসে, সেদিন হেমন্ত সরকার আর নজরুল ইসলাম, এই দু'জনের সঙ্গে আলাপ হল সেখানে। হেমন্ত সরকার ছিলেন দেশবন্ধুর প্রিয় শিষ্য, তাঁর প্রধান সাকরেদ্ বললেও চলে। যেমন ছিল তাঁর খরধার বুদ্ধি, তেমনি বলবার ক্ষমতা, তেমনি রাজনৈতিক চালবাজীর পটুত্ব। এখনকার হেমন্ত সরকারকে দেখে সেদিনকার হেমন্ত সরকারের কোনো ধারণাই কেউ করতে পারবে না। নজরুলের সঙ্গে আলাপ জমে গেল। সেকবিতা পড়ল, গান গেয়ে শোনালে। আমিও তাকে গান শোনালুম। কি ভালোই লেগেছিল নজরুলকে সেই প্রথম আলাপে! সবল শরীর, ঝাঁকড়া চুল, চোখ দু'টি যেন পেয়ালা, কখনো সে পেয়ালা খালি নেই, প্রাণের অরুণ রসে সদাই ভরপুর। গলাটি সারসের গলার মতো পাংলা নয়, পুরুষের গলা যেমন হওয়া উচিত তেমনি, সবল, বীর্য-ব্যঞ্জক। গলার স্বরটি ছিল ভারী, গলায় যে স্বর খেলত খুব বেশি তা বলতে পারি নে, কিন্তু সেই মোটা গলার স্বরে ছিল যাহ। ডেউয়ের আঘাতের মতো,

ঝড়ের ঝাপটার মতো তার গান আছড়ে পড়ত শ্রোতার বুকে। অনেক চিকণ গলার গাইয়ে-র চেয়ে নজরুলের মোটা গলার গান আমার লক্ষ্যগুণ ভালো লাগত। আমি তাকে ঠাট্টা করে বলতুম— অমন কাংশাবিনিন্দিত সুরে গান নাই-বা গাইলে নজরুল? সে দু'হাত দিয়ে তার গলাটিকে বেড়ে ধরে হেসে বলত— কেন? এতখানি গলা রয়েছে, তবু তুমি আমাকে গান গাইতে মানা করছ? এই বলে হা হা করে হেসে উঠত। প্রাণ ছিল তার ঐ হাসির মতোই সরল প্রবল ও দরাজ। এক ধরনের লোক আছে তাদের চেহারা কথাবার্তা হাবভাব সব ফ্যাকাশে। গোধলির করুণ রঙে নিজেদের জাহির করবার কি অশ্রান্ত চেষ্টা! এইটেই নাকি কবি ও ভাবকের ট্রেডমার্ক! ডুইংকমে আর মেয়েমহলে এই ট্রেডমার্ক থাকলে নাকি খাতির অবশ্যস্বাবী! এই অসহ্য মুখ-মেয়ে-দেওয়া মিঠে ভাব নজরুলের আদবেই ছিল না। প্রবল হতে সে ভয় পেত না, নিজেকে মিঠে দেখাবার জন্যে সে কখনো চেষ্টা করত না। রবীন্দ্রনাথের পরে এমন শক্তিশালী কবি আর আসে নি বাঙলা দেশে। এমন সহজ-গতি, আবেগের আগুন-ভরা কবিতা বাঙলা সাহিত্যে বিরল। সত্যেন দত্তের কবিতা এর তুলনায় আড়ষ্ট। একটি কৃত্রিম ছন্দ-সচেতনতা সব সময়েই রসাস্বাদনে বাধা ঘটায় সত্যেন দত্তের কবিতায়। মনে হয় ভাবটিকে সচেতন ভাবে ছন্দের সাজ পরানো হয়েছে। নজরুলের কবিতায় কৃত্রিমতার দুর্গন্ধ আদবেই নেই, মনের হিমাদ্রি থেকে ভাবের জমাট বরফ কল্পনার সূর্যালোকে গলে নেমে এসেছে দুর্বীর ধারায়। ভাব নিজের ছন্দ নিজেই তৈরি করে নেমে এসেছে, ছন্দ সৃষ্টি করবার জন্যে তাকে প্রয়াস করতে হয় নি। 'লাঙলে' বের হল নজরুলের 'নারী' কবিতাটি। একদিনের মধ্যে 'লাঙল' সব বিক্রি হয়ে গেল, সেই সংখ্যাটা আমাদের আবার ছাপতে হোলো। নজরুলের কবিতাই ছিল 'লাঙলে'র প্রধান আকর্ষণ। যে-সব প্রবন্ধ ছাপা হত সেগুলোর মধ্যে কমিউনিস্ট মতবাদের ছোঁওয়া কিছু কিছু থাকলেও উগ্র জাতীয়তাবাদেই ঠাসা থাকত প্রবন্ধগুলি। তা ছাড়া কাঁচা মনের ছাপও কম থাকত না লেখাগুলোতে। চালকেরা যে কি রকম কাঁচা ছিলেন তার একটি মজার উদাহরণ দিই। শ্রমিক-কৃষকদলের মুখপত্রে সূভাষচন্দ্রের কোষ্ঠীর ফলাফল-বিচার ছাপানো হয়েছিল! আন্তরিকতা ছাড়া আমাদের

সত্যি করে আর কোনো সম্ভল ছিল না সে দিন। আমি যোগ দিলুম এই দলে। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ‘লাঙলে’র জন্তে আশীর্বচন জোগাড় করবার ভার পড়ল আমার উপর। একদিন সকাল বেলা রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে পেশ করলুম আমাদের আর্জি। তিনি তৎক্ষণাৎ লিখে দিলেন :

“জাগো, জাগো বলরাম, ধরো তব মরু-ভাঙ্গা হল,
প্রাণ দাও, শক্তি দাও, স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।”

‘লাঙলে’র প্রচ্ছদপটে তাঁর আশীর্বচন থাকত। এর কিছুদিন পরে আমরা পত্রিকার নাম বদল করে তার নাম রাখলুম ‘গণবাণী’। মুজফ্ফর হলেন পত্রিকার সম্পাদক। এই ‘গণবাণী’তেই আমি ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’র অনুবাদ ছাপাই। লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের সেই প্রথম যুগের ‘গণবাণী’ গোষ্ঠীর একজন। নৃপেন এই সময়েই গর্কির ‘মা’ বইটির অনুবাদ শুরু করে আর তার কিছুটা অংশ সর্বপ্রথম ছাপা হয় গণবাণীতে। উনিশশো ছাব্বিশ সাল গড়িয়ে এল। স্থির হল দলের প্রথম কনফারেন্স কৃষ্ণনগরে করা হবে। কলকাতা থেকে মুজফ্ফর, ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত, অতুল গুপ্ত, কুতুবদ্দীন আহম্মদ ও আমি কৃষ্ণনগরে গেলুম। হেমন্ত ও নজরুল তখন কৃষ্ণনগরেই থাকতেন। কনফারেন্সের জন্তে গান লেখবার ফরমাস করা গেল নজরুলকে। তাকে একটা ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আদায় করলুম আমরা দু’টি গান—‘ধ্বংস-পথের যাত্রীদল’, আর ‘ওঠরে চাষী জগৎবাসী ধরু কসে লাঙল’। বাঙলা-সাহিত্যে এই ধরনের গান ছিল না এর আগে, নজরুলই তার পথকার। কৃষ্ণনগর সেদিন মোঁচাকের মতো মুখর। শুধু যে আমাদের শ্রমিক-কৃষক দলের কনফারেন্স হচ্ছিল তা নয়, সেই একই সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে রাজনৈতিক কনফারেন্স ডাকা হয়েছিল কৃষ্ণনগরে। সরোজিনী নাইডু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বীরেন শাসমল প্রভৃতি কংগ্রেসী নেতারা সবাই সেবার হাজির কৃষ্ণনগর কনফারেন্সে। আমাদের কনফারেন্স হল কৃষ্ণনগর টাউন হলে আর জনসভা টাউন হলের মাঠে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক কনফারেন্স হল কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে।

ইতিহাস এখানেও রসিকতা করতে ছাড়ল না। রাজবাড়িতে কংগ্রেসের

রাজনৈতিক কনফারেন্সের দিকে আঙুল দিয়ে কংগ্রেসের আসল রূপ দেখিয়ে দিল সকলকে। সকালবেলা আমাদের কনফারেন্স শুরু হলো। দলের গঠনতান্ত্রিক নিয়মাবলী ও কর্মসূচী গৃহীত হল এই কনফারেন্সে। অতুল গুপ্ত দলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। বিকেলবেলা টাউন হলের মাঠে জনসভা শুরু হল নরেশ সেনগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে। তাঁর আর অতুল গুপ্তের কলকাতা ফেরার জরুরি দরকার ছিল বলে নরেশবাবু আমাকে সভার সভাপতি করে দিয়ে চলে গেলেন। জনসভায় সেই আমার প্রথম আবির্ভাব। আমার যা অবস্থা! ম্যালেরিয়া জরের কাঁপুনি লাগে কোথায় আমার কাঁপুনির কাছে! চেয়ারে বসে আছি মনে হচ্ছিল যেন চেয়ার থেকে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাব মাটিতে। মিটিংএ বলা দূরে থাকুক, ইস্কুলে পড়বার সময় ইস্কুলের তর্ক-সভায় কিছু বলতে আমার শরীরের অর্ধেক রক্ত শুকিয়ে যেত। ইস্কুলে যখন পড়ি তখন আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়ত। তার নাম সুবোধ দাসগুপ্ত। সুবোধ কোমরে হাত দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে খুব নাটকীয় ধরণে বক্তৃতা করত। আমি অবাক হয়ে তার বক্তৃতা শুনতুম আর ভাবতুম এও কি সম্ভব! কি অসাধারণ ক্ষমতা সুবোধের, আমার মুখে একটি কথা জোগায় না, আর সুবোধ কিনা অনর্গল বক্তৃতা করে যায়! আমি তর্ক-সভায় বক্তৃতা করতে উঠলেই মাথার মধ্যে যেন ঝাঁ ঝাঁ পোকা ডাকছে এমন মনে হত। যা-কিছু বলব বলে ঠিক করেছিলুম সব যেতুম ভুলে, মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ, হাত-পা বরফের মতো ঠাণ্ডা, বুড়োর হাতের লাঠির মতো সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে অস্থির আর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরগুলোর উপর বার বার আছড়ে পড়ত, মনে হত যেন পাঁজরগুলো ঠেলে ঠুলে হৃৎপিণ্ডটা বাইরে ঠিকরে পড়বে। আমি যে কখনো সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে পারব এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। কৃষ্ণনগরের মাঠে আমার সেই প্রথম বক্তৃতার কথা আমি কখনো ভুলব না। কী যে ছ' কথা বলেছিলুম তা আমার আদর্শেই মনে নেই। তবে আমার অবস্থা দেখে বোধ হয় শ্রোতাদের করুণা হয়েছিল। চারদিক থেকে 'গান গান' ধ্বনি উঠল, আমিও বাঁচলুম। ছ'টি গান গেয়ে কোনো মতে নিজের প্রাণ রক্ষা করে বসে পড়লুম। নজরুলও সেই মিটিংএ ছিল, সে বক্তৃতাও দিল, গানও

গাইল। কনফারেন্সের কাজ শেষ হলে আমি আর কুতুবদ্দীন গেলুম নবদ্বীপ দেখতে। কুতুবদ্দীনকে ধুতি চাদর পরিয়ে নিয়ে গেলুম, কি জানি নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের রক্ত যদি মুসলমানকে দেখে গরম হয়ে ওঠে। ললিতা সখীর নাম অনেকদিন থেকে শুনে আসছিলুম, তাঁকে দেখবার কৌতুহল ছিল মনে। আমি কুতুবকে নিয়ে তাঁর আস্তানায় হাজির হলুম গিয়ে। বারাণ্ডায় বসে আছি কিছুক্ষণ এমন সময়ে শাড়ী-পরিহিত একটি শ্রুলকায় লোক এসে আমাদের সামনে বসলেন। অঙ্গে কাঁচুলি ও শাড়ী, হাতে চুড়ি, চুল মেয়েদের মতো করে কপালের দু' পাশে পাতা কাটা। হাতের কজ্জি চওড়া, বাহু'টি আর যাই হোক মৃণাল বলে ভ্রম হবার কোনো উপায় নেই। আগেই শুনেছিলুম যে ললিতা সখী হবার আগে তিনি কুস্তি করতেন আর ললিতা সখী হবার পরেও একবার দাঙ্গার সময়ে লাঠি হাতে রাস্তায় নেমে বহু লোকের মোহড়া নিয়েছিলেন। বাহু'টি দেখে এ-বিষয়ে সন্দেহ করবার অবকাশ রইল না। কুতুবকে নির্বাক হয়ে বসে থাকতে বলে আমি শুরু করলুম আলাপ ললিতা সখীর সঙ্গে। শুধালুম তাঁকে যে তাঁর ললিতা সখী নাম নেওয়ার অর্থ কি এই যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ললিতা সখীর যে সম্বন্ধ ছিল তিনি নিজের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সেই অনুরাগের বন্ধন অন্তরে অনুভব করেন? তিনি বললেন যে ঠিক তাই, তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে সেই সখিভাব অনুভব করেন। বললুম যে তার জন্তে শাড়ী পড়বার প্রয়োজন ছিল কি? যেটা অন্তরের অনুভূতি তাকে এ ধরনের বাহ্যিক রূপ দেবার দরকার কি ছিল? ললিতা সখি বললেন, আমি ছেলেমানুষ, আমি ছেলেমানুষ, আমি কি জানি, আমার গুরুকে জিজ্ঞেস করুন। এর পর যে প্রশ্নই করি-না কেন এই একই জবাব তিনি দিতে লাগলেন। বুঝলুম আমার প্রশ্নের তাড়ায় খোলার মধ্যে মাথাটি ঢুকিয়ে নিয়েছেন ভদ্রলোক, আর জবাব পাওয়া যাবে না।

কলকাতায় ফিরে এলুম। দলের তাণ্ডে লক্ষ্মীর পদ্মের পাপড়ির টুকরোও কোনো অনুকূল বাতাসে পড়ে না উড়ে এসে। দমকা হাওয়ার মতো আসে যায় 'গণবাণী'। মুজফ্ফর নলিনীদের ভরা-পেট খাওয়া খুব কমই জোটে, অনাহারের পালা লেগেই আছে প্রতি মাসে। আমার হাতেও টাকা নেই কিছু। সহকর্মীদের উপবাস, কাজের ক্ষতি, আমাকে

অস্থির কোরে তুলল। হঠাৎ মাথায় এল গানের আয়োজন করে অর্থ সংগ্রহ করলে তো হয়! উঠে পড়ে লেগে গেলুম তোড়জোড়ের কাজে। এলবার্ট হলে ‘বসন্ত উৎসব’ অনুষ্ঠিত হল। নজরুল ইসলাম, নলিনীকান্ত সরকার ও আরো অনেকে গান গাইলেন। আমিও ছিলাম সেই গায়কদের মধ্যে। যৎসামান্য হলেও কিছু টাকা এল, অনাহার ও উপবাসের হাত থেকে কিছুদিনের মতো রেহাই পেল মুজক্করেরা। ‘গণবাণী’ আবার দেখা দিল রাস্তার মোড়ে। তার অল্প দিন পরেই নানা ঋতুর গানের ফুল গের্ণে নিয়ে তৈরি করলুম সুরের মালা। তারি নাম দিলুম ‘ঋতুচক্র’। এবারে গানের আসর বসল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। হলের উপর-নীচ ভরে গেল লোকে। দেড় হাজারের চেয়েও বেশি টাকা পেয়েছিলাম সেবার। ঋতুচক্রের কথা মনে হলেই মনে পড়ে রেবার নাচ। আমাদের দলের মধ্যেও কেউ জানত না যে রেবা নাচবে সেদিন সন্দের আসরে। রেবার বাবার অনুমতি চাইতেই তিনি দিয়ে দিলেন। এমনি উদার ও নির্ভীক লোক ছিলেন রেবার বাবা। কোন্ গানের সঙ্গে রেবা নাচবে সেটা ঠিক করে নিলুম রেবাতে আমাতে। উৎসবের শেষ গান—‘যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে’—গুরু হতেই রেবা গানের দল থেকে বের হয়ে এসে উদ্ধার মতো স্টেজের মাঝখানে, গানের হালকা ছন্দের সঙ্গে গুরু করে দিল চপল নৃত্য। প্রকাশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বাঙলা দেশে রেবার আগে কোনো ভদ্রঘরের মেয়ে নৃত্য করে নি। রবীন্দ্রনাথও তখন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের দিয়ে নৃত্য অনুষ্ঠান করান নি। এর প্রায় বছরখানেক বাদে ‘নটীর পূজা’য় রবীন্দ্রনাথ নৃত্যর অবতারণা করেন। এ বিষয়ে রেবা পথকারিণী। সে-ই সর্বপ্রথমে পথ দেখিয়েছে। এর জন্তে তাকে কম বিক্রপ ও অপমান সহ্য করতে হয় নি। অনুষ্ঠানের পরেই ‘সঞ্জীবনী’ থেকে গুরু করে সব সংবাদপত্রগুলি আমার ও রেবার বিরুদ্ধে বিবোধগার গুরু করে দিল। তার উত্তরস্বরূপ আমি আবার একটি নৃত্যগীতের আসর করলুম। এবার উৎসব হল আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ির প্রাঙ্গণে। ‘নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি’ এই গানটির সঙ্গে নাচল চিত্রা, নন্দিতা আর স্মিতা। নীতিবাগীশদের কাঠমোল্লাইগিরির উত্তর দিলুম আমি সেদিন এমনি করে। নৃত্যের

অস্থগ্ৰাণ একটির পর একটি করে আমি এদের ধাক্কা দিয়ে যাব এই ছিল আমার সঙ্কল্প। তার স্বল্পকাল বাদে রঙ্গমঞ্চে ভদ্রঘরের মেয়েদের নৃত্যের প্রবর্তন করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। নীতিবাগীশদের দাপট ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল তাদের মনের ভীকু অন্ধকারের মধ্যে।

ছোট্ট আমাদের দলটি, মতবাদও তার উগ্র জাতীয়তাবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়, তবুও কংগ্রেসী নেতাদের বিরূপতা ও বিরুদ্ধতার অন্ত ছিল না। সেই প্রবল বিরুদ্ধতা উপেক্ষা করে আমরা ক'টি লোক একটি নতুন সামাজিক আদর্শ প্রচারের কাজে লেগে গিয়েছিলুম। কুষ্টিয়া শহরে একটি কন্ফারেন্স হল। বহু জেলে সেই সভায় যোগদান করল। অতুলচন্দ্র গুপ্ত সেই কন্ফারেন্সের সভাপতিত্ব করেন। নজরুল, হেমন্ত সরকার ও আমি যোগদান করেছিলুম সেই কন্ফারেন্সে। টেরারিস্ট দলগুলির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে কিছু লোক এই সময়ে আমাদের দলের দিকে সরে আসেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দলের মধ্যে তাঁদের টেনে নেওয়া হয়। এই সময় বাঙলা দেশের বিভিন্ন টেরারিস্ট দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করবার মতলব আমার মাথায় আসে। চট্টগ্রাম, নদীয়া, ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলুম, উদ্দেশ্য ছিল এই-সব দলগুলির সাহচর্যে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়া। টেরারিস্ট দলগুলির পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ এত অসম্ভব রকম বেশি ছিল যে আমার চেষ্টা দলীয় ঈর্ষার পাথরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়ল। তবুও এই পরিচয়ের ফলে টেরারিস্ট দলগুলি থেকে কিছু লোককে আমাদের দিকে টেনে আনবার সুযোগ আমরা পেয়েছিলুম।

শ্রমিক-কৃষক দল গঠন করবার উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে টেরারিজম ও কংগ্রেসের আওতা থেকে সরিয়ে গণ-আন্দোলনের জোয়ারের মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া। দেশের তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা যা ছিল তাতে স্বাধীনতার তৃষা-কাতর মধ্যবিত্তকে কংগ্রেসের মরীচিকার মায়া থেকে বাঁচিয়ে বিপ্লবের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরে নিয়ে আসবার পথে শ্রমিক-কৃষক দল ছিল প্রথম সরাইখানা। আমরা অন্তত শ্রমিক-কৃষক দলকে এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র হিসেবে দেখেছিলুম। বিপ্লবের আসল হাতিয়ার—কমিউনিস্ট দল-তৈয়ারির দিকে আমাদের পুরো

নজরই ছিল। শ্রমিক-কৃষক দলের রাজনৈতিক আবরণের তলায় কমিউনিস্ট দল গঠন করব। এই ছিল আমাদের স্বপ্ন। আমরা করেছিলুমও তাই। বোম্বে, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, রাজপুতনা এ-সব জায়গায় দু'-একটি করে লোক ছিল যারা কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র কেসের পরে কমিউনিজমের কাছে ঘেঁসে এসেছিল। মুজফ্ফর, নলিনী, ডাঙ্গ, ওসমানী এঁরা সকলেই সেই প্রথম কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ও সবাই দীর্ঘ মেয়াদের পর মুক্তি পেয়েছিলেন। এঁরা তো ছিলেনই, আরো কিছু নতুন লোক এসে আমাদের সঙ্গে জোটে। এই নতুন লোকদের মধ্যে ছিল একজন, তার নাম ছিলো বাগরহট্টা। কলকাতায় এসে বাগরহট্টা জোড়াসাঁকোয় আমার ওখানে ওঠে। তার কথা শুনে মনে হত যে বিপ্লবের আর আদবেই দেরি নেই! ঝাঁকে ঝাঁকে কমিউনিস্ট পঙ্গপাল উড়ে এসে ক্যাপিটালিস্টদের মুনফাধর্মী সমাজের ক্ষেত উজাড় করে দিল বলে! তার উৎসাহের প্রবল ধাক্কায় বাস্তবের মাটিতে পা রেখে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছিল। কিছুদিন পরে আমাদের কাছে বাগরহট্টা সম্বন্ধে যে খবর পৌঁছল তার থেকে বুঝতে পারলুম যে তখনকার গভর্নমেন্টের গোয়েন্দা-বিভাগের রক্তবারিধারার শিকনে বাগরহট্টায় প্রবল উৎসাহের তরু মঞ্জরিত হয়েছিল।

ইউরোপের সঙ্গে আমাদের যোগ ছিল তখন পণ্ডিচেরীর রাস্তা দিয়ে। আর সেই যোগ কতটুকুই বা ছিল! কচিং কখনো মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিঠি এসে পৌঁছত আর সেই চিঠি পাঠ করতুম আমরা রুদ্ধ নিশ্বাসে। রায়ের লেখা দু'-একটি পুস্তিকা আর তাঁর চিঠি এই ছিল আমাদের সম্বল। আমরা তখন ছিলাম আশ্চর্য রকম কাঁচা, কিন্তু আমাদের একটা সোভাগ্য ছিল; কমিউনিজম সম্বন্ধে নিজেদের স্বল্প জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত সচেতন ছিলাম। আর এই সচেতনাই নিবুদ্ধিতার অপঘাত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিল আমাদের। এ যুগের আধুনিকেরা যে উৎকট কাঁচা-পাকামি রোগে অহরহ ভুগে থাকে সেই সর্বনেশে নির্লজ্জ রোগে আমরা কখনো ভুগি নি।

হঠাৎ একদিন হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। কিছুকাল অন্তর অন্তর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বজন-বিদিত নীতি। ধর্মের দোহাই দিয়ে, সাম্প্রদায়িক

নামে মানুষ যে কি রকম আচম্কা পশু বনে যেতে পারে তা দেখলুম।
 শুনলুম মুসলমান চাকর পঁচিশ বছর হিন্দু মনিবের ওখানে কাজ করবার পর
 মনিবকে খুন করল নিজের সম্প্রদায়ের লোক ডেকে এনে। শুনলুম মাড়োয়ারী
 ধনী তার ত্রিশ বছরের পুরোনো মুসলমান কোচোরানকে বাড়ির মধ্যে ডেকে
 নিয়ে গিয়ে খুন করল। বহুকাল থেকে আবদুল ভিস্তি আমাদের বাড়িতে
 কাজ করত। মশকে জল ভরে ড্রেন নর্দমা ধোলাই করা ছিল তার কাজ।
 বুড়ো আবদুল রোজ সকালে আসত। মশকের মুখ খুলে হাত দিয়ে চিপে
 ধরে তার জল ছিটানোর কায়দা দেখতে ভারী ভালো লাগত। আমার
 উপর তার স্নেহ ছিল, আমাকে দেখলেই তার মুখ হাসিতে কুঁকড়ে যেত।
 আমাকে সে মাঝে মাঝে মশকের মুখ চিপে ধরে জল ছিটোতে দিত। তার
 খাটুনি বাড়ত, আবার তাকে ভরতে হত মশক, তবু সে খুশি মনে মিটাতে
 আমার আবদার। দাঙ্গার সময় একদিন সকালে আবদুল এসে মাটিতে
 আছড়ে পড়ল। পাড়ার সব লোক অনেক কাল থেকে তাকে জানত।
 তবুও সেদিন রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে সে যখন
 আমাদের বাড়িতে আসছিল, তখন হিন্দুরা তাকে ধরে দু'টো কানের কিছু
 অংশ কেটে নিয়েছে। রক্ত গাড়িয়ে পড়ে তার কাঁচাপাকা দাঁড়িকে রাঙিয়ে
 দিয়েছে। আবদুলের কান্না শুনে দৌড়ে এলুম নীচে। যা শুনলুম তাতে
 দুঃখে লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হল। বুড়ো আবদুল, পল্লীর
 প্রতিটি লোকের চেনা সে, রাস্তায় কত লোক তার সঙ্গে হেসে কথা কইত।
 আজ হঠাৎ এতদিনের পরিচয় সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল চীনে মাটির
 বাসনের মতো! সাম্প্রদায়িক হানাহানি আবদুলের আর-সব পরিচয় লোপ
 করে দিল নিমেষে, শুধু একটি মাত্র পরিচয় তার রয়ে গেল যে সে মুসলমান!
 তার কান ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে, লোক সঙ্গে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম।
 দিনরাত হাজার আওয়াজ আসে, বিশেষ করে নিরুন্ম রাত্তিরে। একদিন
 দুপুরে ভীষণ হাল্লা উঠল আমাদের বাগানের পাঁচিলের ও-ধারে সিংহী
 বাগানে। ত্রিশ-চল্লিশজন মুসলমান হিন্দুদের তাড়া খেয়ে পাঁচিল টপ্কে
 লাফিয়ে পড়েছে আমাদের ভিতর বাড়ির বাগানে। দারোয়ানরা লাঠি হাতে
 দৌড়লো তাদের মারবার জন্তে। দরওয়ানদের ধমকে সরিয়ে দিয়ে আমি
 তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে বসালুম আমাদের একতলার বারান্দায়।

বাগানের পাচিলের ওদিকে তখন ভীষণ হল্লা শুরু হয়েছে। গিয়ে দেখি প্রায় দু' তিন শো লোক জড়ো হয়েছে। আমাকে দেখে চিৎকার শুরু হলো— মুসলমানদের বের করে দাও নইলে আমরা জোর করে বাড়িতে ঢুকব। হাতের বন্দুকটা দেখিয়ে তাদের বুঝিয়ে দিলুম যে পাচিল টপ্কে ঢুকলে তাদের কি অবস্থা হবে। কিছুক্ষণ হট্টগোল করে তারা সব চলে গেল। আনজুমানকে টেলিফোন করে গাড়ি আনিয়ে তাদের পাঠিয়ে দিলুম। তার দুদিন বাদে 'হানিফী'তে বের হলো যে ঠাকুরবাড়ির সৌম্যেন্দ্রনাথ অনেক মুসলমানকে বাড়িতে আটক করে ফেলেছিল, নেহাৎ খোদাতাঙ্গার কৃপা ছিল বলে এই মুসলমানেরা অনেক কৌশল করে তার হাত থেকে বেঁচে ফিরেছে। 'হানিফী'র সম্পাদক আমাদের শ্রমিক-কৃষক দলের আফিসে মাঝে মাঝে আসতেন। পরে দেখা হতেই জিজ্ঞেস করলুম তাঁকে যে আমার সংস্কে যা লিখেছেন তাঁর কাগজে সেই খবরটি কোথা থেকে জোগাড় হলো! তিনি হেসে বললেন আনজুমান খবর দিল আপনি অনেক ক'টি মুসলমানকে বাঁচিয়েছেন। অবিশিষ্ট সংস্কে সংস্কে বলেও দিল যে খবরটিকে বিকৃত করে কাগজ বের করতে, তাই করেছি ব্যবসার খাতিরে। অবাক হোয়ে গুনলুম তাঁর কথা। ব্যবসার খাতিরে জঘন্য মিথ্যে সত্য হয়ে গেলো! আর সেই মিথ্যে পরিবেশন করা হলো হাজার হাজার লোককে, তাদের মনে ঢেলে দেওয়া হলো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ, সব শুধু ব্যবসার খাতিরে! কী চমৎকার সমাজ-ব্যবস্থাতেই না আমরা বাস করছি! গণবাণীর এক বিশেষ সংখ্যা বের করলুম এই সময়ে। হিন্দু-মুসলমান সমস্তার উপর লিখলুম আমি আর মুজফ্ফর। একদিন বিকেলে ৩৭ নং হারিসন রোডে দলের আফিসে বসে আছি এমন সময় রাস্তা থেকে চীৎকার শোনা যেতে লাগলো— কালী মাইকি জয়। বারাণ্ডায় বের হয়ে দেখি একদল কলেজের ছেলে হকি স্টিক, লাঠি, খাটের পায়্যা, যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে চলেছে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের দিকে। নেমে গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলুম তারা চলেছে কোথায়। গুনলুম ঠন্ঠনে কালীবাড়ি মুসলমানেরা আক্রমণ করবে খবর এসেছে। তারা সেই কালীবাড়ি রক্ষা করবার জন্যে চলেছে। বললুম কালীবাড়ি রক্ষা করুক ভালো কথা, কিন্তু এই জঘন্য খুনোখুনি বন্ধ করবার কোনো উপায় তারা ভেবেছে

কি? তারা শুধোলে, আপনি কি বলেন? বললুম, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ছেলেদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি করা দরকার। তারা রাস্তায় রাস্তায় পাহারা দেবে আর গুণ্ডা, খুনী অত্যাচারীদের কঠোরভাবে দমন করবে। এ ছাড়া দাঙ্গা বন্ধ করবার উপায় নেই। তারা শুনে আমার কথা, কিন্তু উত্তরে বললে যে ও-সব কথা শোনবার সময় এখন নয়। আগে মুসলমানদের সায়েস্তা করা যাক, পরে ও-সব কথা ভাবা যাবে। ‘জয় মা কালী,’ ‘কালী মাইকী জয়’ চিৎকার করতে করতে তারা চলে গেল। মাস খানেক ধরে এই বীভৎসতার স্রোত বইলো কলকাতার রাস্তাগুলিতে। লর্ড লিটনের গভর্নমেন্ট কিছুই করল না, পুলিশও কোনোরকম বাধা দিল না দাঙ্গাকারীদের। লর্ড লিটন দার্জিলিংয়ের তোফা আরাম ছেড়ে কলকাতায় নেমে এলেন না। একমাস দাঙ্গা চলবার পরে তিনি কলকাতায় এলেন। একদিন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে দেখা হলো। মিস ম্যাকলাউড আমাকে স্নেহ করতেন। তিনি থাকতেন বেলুড় মঠে, আমি প্রায়ই যেতুম তাঁর কাছে। কথায় কথায় বললুম তাঁকে গভর্নমেন্টের উদাসীনতার কথা, শত শত লোক প্রাণ হারাচ্ছে দাঙ্গায়, আর লর্ড লিটন দার্জিলিংয়ে বসে বরফের হাওয়া খাচ্ছেন। তিনি বললেন, তুমি একবার লর্ড লিটনের সঙ্গে দেখা করে সবটা বল না কেন তাঁকে? বললুম, লর্ড লিটনের সঙ্গে দেখা করে কি হবে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি তিনি, তারাই তো এই দাঙ্গা লাগাচ্ছে। তাদের এজেন্টের সঙ্গে দেখা করে লাভ কি? মিস ম্যাকলাউড-এর সঙ্গে লর্ড লিটনের খুব ভাব ছিল। বেলুড়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে লিটনের দেখার ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। আমার কথা শুনে তিনি চুপ কর রইলেন, কিছু বললেন না। কয়েকদিন বাদে লর্ড লিটনের সেক্রেটারির কাছ থেকে একটি চিঠি পেলুম, আপনি যদি অমুক দিন এসে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেন তো তিনি খুশি হবেন। আমার ইচ্ছে ছিল না, তাই লিখে পাঠালুম, আমি কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছি এখন দেখা করার সুবিধে হবে না। কয়েকদিন বাদে আবার একটা চিঠি এল লিটন সাহেবের সেক্রেটারির কাছ থেকে। সেদিন দুপুরে খালি পায়ে খদ্দর গায়ে হাজির হলুম গিয়ে গভর্নমেন্ট হাউসে। লর্ড লিটনের সঙ্গে আধ ঘণ্টা কথা হল। বললেন,

তাকে, অল্প সময় পুলিশের জুলুমের অন্ত থাকে না আর এখন দবকারের সময় পুলিশ কেমন নিষ্ক্রিয়, তাদের সামনে হত্যা চলছে তারা দাঁড়িয়ে দেখছে। তিনি চুপ করে সব শুনলেন, শেষে বললেন, পুলিশের সম্বন্ধে আপনার মত আমি মানতে পারলুম না। সে তো জানাই ছিল যে সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ট লর্ড লিটন এটা মানতে পারবেন না। ইচ্ছে করলে তো দু' ঘণ্টার মধ্যে এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে দিতে পারতেন তিনি, তিনিই তো এই দাঙ্গাকে এক মাসের উপর চলতে দিলেন। এখন কোন্ মুখে তিনি তাঁর নিজের কুকর্মের নিন্দে করেন! পর দিন বেলুড়ে গিয়ে মিস ম্যাকলাউডকে জানালুম সব। যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল একদিন তেমনি হঠাৎ একদিন দাঙ্গা বন্ধ হয়ে গেলো। বোঝা গেল উম্কানে-ওয়ালা ও লাগানেওয়ালাদের মনস্কায পূর্ণ হয়েছে। হিন্দু মুসলমান এক হয়ে চলছিল, এখন তাদের ভাগ করে দেওয়া হল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কাঁটার বেড়া তুলে।

একদিন সকালে নলিনী এল জোড়াসাঁকোয়—বললে, ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে একজন কমরেড প্রায় দু' মাস হল কলকাতায় এসেছে। এ দু' মাস সে আমাদের সঙ্গে দেখা করে নি, শুধু ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছিল। এখন সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। তার পরের দিন ব্রিটিশ কমরেডটিকে সঙ্গে নিয়ে নলিনী এল জোড়াসাঁকোয়। শুনলাম কমরেডটির নাম ক্যাম্বেল। ক্যাম্বেল বললে যে পুলিশের নজর এড়াবার জন্তই সে এই দু' মাস আমাদের সঙ্গে দেখা করে নি। এই দু' মাস সে কিশোরী ঘোষ, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নিছক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করেছে। প্রায় রোজই ক্যাম্বেল জোড়াসাঁকোয় আসত। বাগানের ধারের আমার একতলার ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের আলোচনা চলত। ইংলণ্ডে তখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে সংখ্যালঘুদের আন্দোলন (মাইনরিটি মুভমেন্ট) চালাচ্ছিল ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি। সেই আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল ক্যাম্বেল। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে অনেক কিছু জানলুম ও শিখলুম তার কাছ থেকে। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কী উপায়ে আমরা যোগাযোগ রাখতে পারি সে বিষয়েও আমাদের আলাপ হোলো কিছুদিন। হঠাৎ

একদিন সকালে নলিনী হৃদয়ঙ্গম হয়ে ছুটে এল আমার কাছে। শুনলুম ক্যাম্বেল সকালে গ্রেপ্তার হয়েছে তার বাড়ি থেকে, আমাদের আফিসও থানাতল্লাসী করেছে পুলিশ। আমি আর নলিনী গেলুম ব্যাংকশাল স্ট্রীটের ফৌজদারী আদালতে। আমি জামিন হয়ে ক্যাম্বেলকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলুম। ক্যাম্বেলের কাছে শুনলুম যে ভাটপাড়ার চটকল মজদুর ইউনিয়নের সেক্রেটারি কালিদাস ভট্টাচার্যের কাছে সে তার পাসপোর্ট রেখেছিল। ভাটপাড়ার ইউনিয়নের আফিস তল্লাসী কোরে পুলিশ পেয়েছে সেই পাসপোর্টটি আর জাল পাসপোর্ট নিয়ে ভারতবর্ষে আমার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করেছে। তার আসল নাম ক্যাম্বেল নয়—এলিসন, সেটাও জানলুম তখন। তারপরেও এলিসন প্রায় মাসখানেক কলকাতায় ছিল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পুলিশের মোটর তার পেছনে পেছনে ঘুরত, সে কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে দেখবার জন্যে। আমরা দু'জন প্রায়ই একসঙ্গে বের হতুম আর পুলিশের চরেরা ছুটত আমাদের পিছু পিছু। অনেকবার আমরা চরদের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়েছি দু'জনে। দেখতুম, আমাদের খুঁজে হয়রান হয়ে ছোট্টাছুটি করছে চরের দল। একদিন দুপুরে এল এলিসন, আমার ঘরে ইজিচেয়ারে বসে খুব হাসতে শুরু করে দিলে।

যা শুনলুম তাতে আমারও হাসি চাপা দায় হোলো। এলিসনের পেছনে পেছনে পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়ালো জোড়াসাঁকোর গলির সামনে। চর দু'টি এলিসনকে গলিতে ঢুকতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুঁজেছে। এলিসন অমনি ঘুরে গিয়ে তাদের গায়ের কম্বল দু'টো ধরে দিলে টান। ঘুম গেল ভেঙে, ঝিমুনি গেল থেমে, তা'রা দু'জনেই মোটর থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুট, কম্বল দু'টো নিয়ে চলে এলো এলিসন। ট্রফি হিসেবে কম্বল দু'টি দেখাতুম সকলকে। পরে আমার বুড়ো টেরিয়ার ক্যাক্সির বিছানায় পুলিশের কম্বলের সদব্যবহার হল। মাসখানেক বাদে এলিসনকে বন্দে নিয়ে গেলো। দু'বছর জেলে থাকার পর তাকে নির্বাসিত করল ভারতবর্ষ থেকে। মস্কোয় আর বার্লিনে তার সঙ্গে আমার ফের দেখা হয়েছিল।

‘কালিকলম’ গোষ্ঠীর মধ্যে আমাকে টেনে আনল আমার বন্ধু স্তবোধ রায়। গল্প-লেখক ও সমালোচক হিসেবে সে সখ্যাতি পেয়েছিল রসিক-

সমাজে। কৰ্নওয়ালিশ মার্কেটের দোতলায় ছিলো ‘বরদা এজেন্সি’। এই বইয়ের দোকানের স্বত্বাধিকারী শিশিরবাবুর আর্থিক সাহায্যে মাসিক পত্রিকা ‘কালিকলম’ জন্মলাভ করে। প্রেমন মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মুরলীধর বসু আর সুবোধ রায় এই চারজন তরুণ সাহিত্যিকের যৌথ সম্পাদনায় পত্রিকাটি বের হয়। শালের উন্টো পিঠটার মতো জীবনের যে দিকটা সেলাই বের-করা সে দিকটার ছবি সর্বপ্রথম এঁরাই এঁকে ধরেন সবার সামনে। সমাজের নীচের তলার লোকদের জীবনের কাছে ঘেঁষে এসে, নিবিড়ভাবে সেই জীবনকে দেখে ও অনুভব করে এঁরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন তার চারিত্রিকতা হোলো রিয়ালিজম্। কী অপূর্ব গল্প আর কবিতাই না সে সময়ে লিখেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়! শৈলজানন্দ তাঁর প্রতিভাকে তখনো মজুরো খাটাবার কাজে লাগান নি। এমনি আমাদের দেশের দুর্ভাগা যে সত্যিকার কলাবিদ একে-তো অতি বিরল, এল একজন প্রতিভাবান গল্প-লেখক সে এমনি করে আত্মহত্যা করল। নজরুলও লিখত ‘কালিকলম’ পত্রিকায়। দিকু নামে তার দুটি অপূর্ব কবিতা এই সময় ছাপা হয় ‘কালিকলমে’। আমি লিখলুম ‘নরনারী’ নামে দু’টি প্রবন্ধ। হাওড়ায় সাহিত্যসভায় পঠিত ‘সাহিত্য’ প্রবন্ধটিও প্রকাশিত হল। স্বরচিত গান ও কেন্দুলী মেলায় যেসব বাউলের গান সংগ্রহ করেছিলুম তাও কিছু কিছু ছাপালুম। ‘বরদা এজেন্সির’ সামনের ছাদে আমার বৈঠক বসত। সুবোধ, প্রেমন, শৈলজানন্দ, নজরুল, মুরলীধর ও আমি আলাপ-আলোচনায় গানে গল্পে মসৃণ হয়ে কত সন্ধ্যা কাটিয়ে দিয়েছি সেখানে। আমার ‘নরনারী’ প্রবন্ধ দু’টি খেপিয়ে দিল নীতিবাগীশদের। সমালোচনার যে ছুরি দিয়ে এঁরা আমাকে টুকুরো টুকুরো করতে চেষ্টা করলেন, সে ছুরি ছিল অসম্ভব ভোঁতা। তাই নিছক ব্যথা দিল এদের সমালোচনা, বিঁধতে পারল না আমাকে। আমার ‘সাহিত্য’ প্রবন্ধটি খেপিয়ে দিলো বন্ধু নজরুলকে। এই প্রবন্ধে সাহিত্যিক রস সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে নজরুলের দু’একটি কবিতার স্থূলতা, মাংস-বহুলতা ও রস-বিকৃতির সমালোচনা করেছিলুম। কবিতা যে দেহের এ্যানাটমি শেখাবার জন্যে নয় ওর জন্যে যে মেডিকেল কলেজে যাওয়াই প্রশস্ত, এই প্লেস্ট্রুঁক ছিল আমার সমালোচনায়। নজরুল উঠলো ক্ষেপে,

আমাকে ব্রাহ্ম বলে বিদ্রূপ শুরু করলে। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের সেই ছাদের মজলিশে ছিলাম আমি, স্ববোধ আর নজরুল। আর কে কে ছিলেন তা ঠিক মনে নেই। নজরুলের সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক বেধে গেল। রসের সংঘম সে মানতে রাজী ছিল না। রসের সংঘমকে সে নীতিবাগীশের আনুষ্ঠানিক সংঘমের নামান্তর মাত্র বলে তর্ক করতে লাগল। রসের গাদ বাদ দেওয়া যে রসেরই খাতিরে আর রস-সৃষ্টির জন্তে যে সেটার একান্ত দরকার, এটা সে কিছুতেই মানতে রাজী হল না। এই স্থলতাই শেষ পর্যন্ত নজরুলের কবিতার সমাধি রচল। বিশ্ব-সাহিত্যের কথা দূরে থাক, নিজের দেশের সাহিত্যের খবরও সে খুবই কম রাখত। একবার প্রায় জোর করে বললেই হয় রবীন্দ্রনাথ তাকে কালিদাসের কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন। মনের ইন্টেলেকটুয়াল পরিধি খুব সংকীর্ণ হওয়াতে কবিত্বের তরু বিচিত্র উপাদানের মধ্যে শিকড় মেলে দিতে পারল না। একটু গভীরে গিয়েই সে ধাক্কা খেল অজ্ঞানতার পাথরে।

ইয়োরোপ থেকে ফিরে আসবার পরে একদিন চলেছি হেঁটে বিবেকানন্দ রোড দিয়ে। হঠাৎ পিছন থেকে কে একজন আমাকে জড়িয়ে ধরল। ফিরে দেখি নজরুল। অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। চুল তৈল-মসৃণ, গায়ে ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবী, সিল্কের চাদর, পরণে চিকণ ধুতি, হাতে আংটি। বিশ্বাস করা শক্ত ছিল যে এ নজরুল। হায় রে, বজ্র পরলো বাবুর সাজ, ভুলল তার গুরু গভীর গর্জন, শুরু করল নকল করতে কিনা নৃপুরের ধ্বনি! ঝড় কিনা সাজলো ঝালর-দেওয়া টানা-পাথার সাজে! ভুলল কিনা সে দিগন্তের কপোল স্পর্শ করবার তৃষ্ণা ড্রইংরুমচারিগীদের কপোল পরশ করবার লোভে! আমাকে অমন করে তাকিয়ে থাকতে দেখে নজরুল বলল—কেন তাকিয়ে আছ অমন করে? বললুম, এই দেখা না হলেই ছিল ভালো। যে নজরুলকে আমি জানতুম, ভালোবাসতুম, যে নজরুল ছিল আমার বন্ধু, সে এ নয়। এ নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানির গোলামির তক্মা পরেছে চোখে মুখে সর্বাস্থে। বাজারে কদর হোক না কেন তার গানের, বেশীর ভাগ গান গাওয়ার মতো ভাসছে জলের উপরে, মনের গভীরতাকে স্পর্শই করে না। লক্ষ্মীর পাণ্ডাদের বায়নার জালে সরস্বতীর পূজারী যদি ধরা দেয় তাহলে তার এই অবস্থাই হয়। তাকে মনে করিয়ে

দিলুম বহুকাল আগের এক সকালের কথা। সেদিন সকালে আমি আর নজরুল দু'জনে গিয়েছিলেম রবীন্দ্রনাথের কাছে। নজরুলকে তার স্বরচিত গান শোনাতে বললেন রবীন্দ্রনাথ। নজরুল গাইলো 'চল-চঞ্চল বাণীর ঢল', 'ধ্বংস-পথের যাত্রীদল' আর 'শিকল পরা ছল'। রবীন্দ্রনাথ খুশি হলেন গান শুনে। নজরুল চলে যাবার পর আমাকে বললেন, নজরুলের নিজস্ব একটি জোরালো ধরন আছে। সেদিন দু'চারটি কথার পর নজরুলকে বললেন, শুন্ছি তুমি নাকি মন-জোগানো লেখা লিখতে শুরু করেছ? বিধাতা তোমাকে পাঠিয়েছেন তরোয়াল হাতে, সে তরোয়াল কি তিনি তোমার হাতে দিয়েছেন দাড়ি চাঁচবার জন্তে? রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি নিয়ে নজরুল একটি কবিতা লিখেছিল। তার কবিতা প্রমাণ করল যে সে রবীন্দ্রনাথের কথার অর্থ ধরতে পারে নি। তাব পরে আর একবার মাত্র দেখা হল নজরুলের সঙ্গে। হেমন্ত সরকার নিমন্ত্রণ করেছিলেন আমাকে আর নজরুলকে তাঁর বাড়িতে। গল্প হল, গানও হল কিন্তু দু'জনেই বুঝলুম যে সুর আমাদের আলাদা হয়ে গেছে, মিলছে না কোথাও। সেই আগেকার দিনের মজলিশের কথা মনে পড়ল। কত জায়গায় নলিনীকান্ত সরকার, নজরুল আর আমি গান গেয়েছি। কত দুপুর, কত সন্ধ্যা কাটিয়েছি আমরা গানে গল্পে মশগুল হয়ে। সেদিনের সুরের থেই একেবারে হারিয়ে গিয়েছিল। আমাদের সেই শেষ দেখা। এত বড়ো শক্তিমান কবি, এত সে দিয়েছে দেশকে আর তার কিনা ভালো করে চিকিৎসা হল না অর্থের অভাবে! এমন একজন ডাক্তার জুটল না এই দেশে যে নজরুলের চিকিৎসা করবে অর্থের খাতিরে নয়, নজরুল যা দিয়েছে আমাদের তারি জন্তে ভালোবাসার কৃতজ্ঞতায়। চলতে চলতে 'কালিকলম' থেমে গেল একদিন অর্থাভাবে। তবুও স্বল্প-আয়ু এই পত্রিকা একটি তার জুড়ে দিয়ে গেল বঙ্গ-সাহিত্য-বীণাপাণির বীণায়, যার সুর পরবর্তী কালে সাহিত্যিকদের সৃষ্টির পথ দেখিয়েছে। এই সময়ে একবার আমার ডাক পড়লে হাওড়ায় সাহিত্যসভায়। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ছিলেন সেই সভার সভাপতি। আমি পাঠ করলুম সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ। 'কালিকলম' পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল। এই প্রবন্ধে আমি সমালোচনা করি কালিদাসের কবিতার। দীনেশ সেন মহাশয়

সেদিন আমাকে তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত করলেন। মহাকবি কালিদাসের সমালোচনা করবার ধৃষ্টতা রাখে কিনা এক যুবক! এই ছিল তাঁর বক্তব্যের সারাংশ। তিনি যে আমাকে শিশুকাল থেকে দেখেছেন সে বিষয়েও অনেক কিছু শোনালেন। শুধু আমার বক্তব্যের খণ্ডনে কী যুক্তি আছে সেটা কাউকে জানতে দিলেন না। আজও আমি কালিদাস সম্বন্ধে সেই একই মত পোষণ করি। অপরূপ বর্ণনা আছে তাঁর কাব্যে, কিন্তু বেশির ভাগ কবিতায় মাংস নিয়ে এত বেশি ঘাঁটাঘাঁটি আছে যে মনকে পীড়া দেয় সে মাখামাখি, তৃপ্তি দেয় না। দেহ ও মনের মধ্যে রসের অনির্বচনীয় সেতু রচনা করতে পারেন নি মহাকবি, ‘ঋতু-সংহারে’ তো নয়ই, এমন-কি, ‘মেঘদূতে’ও নয়। খুব অল্পই কবিতা আছে যাতে রসের সিঞ্চে দেহ মন এক হয়ে গেছে অন্তর্ভূতির অনির্বচনীয় লোকে।

আমার দিনগুলি তখন এমনি করেই কেটেছে। গান, সাহিত্য, বাঁশি, রাজনীতি, সব নিয়েই আমি তখন ভরপুর। আমার প্রাণশক্তি ছিল অপরিাপ্ত, অন্তরের নিঃস্বতার ক্লান্তি আমি কখনো অনুভব করি নি। বাগানের ধারের আমার একতলার দক্ষিণের ঘরে দিনরাত আনাগোনা চলত বন্ধু বান্ধবদের। কত ধরনের লোক আসত, রাজনীতির বন্ধুরা, সাহিত্যের সাথীরা, গানের দোসরেরা। আমার গানের মজলিস ছিল তখন রেবা লীলা প্রভৃতি বন্ধুদের বাড়িতে আর আমার পিস্তুতো ভাই দাদা মহীমোহনের গুথানে। বউঠাকরুন ছিলেন মজলিসী লোক, হাসিখুশি মানুষটি। আমাদের অনেক উৎপাত সহ্যতেন, নিজে হাতে রেঁধে আমাদের খাওয়াতে তিনি বড়ো ভালোবাসতেন। তাঁর তেতলার ছাদে বসত আমাদের গানের আসর। কৃষ্ণচূড়ো গাছটির লাল ফুল ছুঁতো এসে ছাদের কোণ, যেন গান শোনার কৌতুহলে সে ঝুঁকে রয়েছে ছাদের দিকে। বিকেলের শেষ আলো মিলিয়ে যেত সন্দের আবছায়ায়, সন্কেতার জল্জল্ করত আকাশে। আমি গানের পর গান গেয়ে যেতুম সুরের নেশায় ভরপুর হোয়ে। সে আসরের নিত্য সাথী ছিলেন বড়ো বউঠাকরুন আর মেজ বউঠাকরুন। মাঝে মাঝে আসতেন দাদা মহীমোহন আর তিলোত্তমা।

সেবার ভাদ্রমাসে আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ির প্রাঙ্গণে হোলো ‘শেষ বর্ষণ’। লালবাড়িতে (বিচিত্রা ভবনে) থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ঘরের পাশে বিরাট কদমগাছ ফুলে ফুলে ভর্তি। প্রতিদিন নতুন গান তৈরি হচ্ছে। দিনের মধ্যে কতবার দৌড়ে আসত তাঁর ভৃত্য বনমালী আমাকে তলব করতে। তাঁর কাছ থেকে গানগুলো শিখে নিয়ে অন্তদের শিখিয়ে দিতুম। এই সময় একটি মুসলমান ‘ওস্তাদের কাছে আমি শিক্ষা করছিলুম দরবারী সংগীত। কয়েকটি সুর লাগলো ভালো, শোনালুম সেই গানগুলো রবীন্দ্রনাথকে। সেই সুরগুলির চাঁচে ঢেলে তিনি তৈরি করলেন — ‘অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে বাজে’ ; ‘কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল’ আর ‘বন্ধু রহ রহ সাথে।’

একদিন গভর্ণমেন্ট হাউস থেকে সংবাদ এল বেলজিয়ামের রাজা এলবার্ট ও তাঁর রানী কলকাতায় এসেছেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের গীতানুষ্ঠান দেখতে আসতে চান। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নিমন্ত্রণ করলেন ‘শেষ বর্ষণে’র একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে। সেদিনকার উৎসবে আমি যোগ দিলাম না। রাজা রানী আর লার্টসাহেবকে গান শোনাব আমি ! কাকা রবীন্দ্রনাথ আমাকে ডেকে বললেন যে সেদিনকার অনুষ্ঠানে আমার যোগদান না করাটা ভালো দেখাবে না। আমার আপত্তির কারণ তাঁকে জানিয়ে দুপুর থেকেই আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলুম। অনেক রাতে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন এলবার্ট ও তাঁর রানী চলে গেছেন, উৎসব শেষ হয়ে গেছে। ‘বিসর্জন’ নাটকের অভিনয়ের আয়োজন শুরু হল বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যে আমি জয়সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করি। তাঁর ইচ্ছে ছিল যে তিনি নিজে নেবেন রঘুপতির ভূমিকা। তিনি নিজে আমাকে তালিম দিয়েছিলেন কয়েকদিন। পরে বনেদী পরিবারের পারিবারিক জীবনে ঈর্ষার যে পঙ্কিল স্রোত বয় সেই স্রোত মুখর হল আমাকে ঘিরে। আমি সরে দাঁড়ালুম। রবীন্দ্রনাথ নিজে নিলেন জয়সিংহের ভূমিকা আর দিনেন্দ্রনাথ রঘুপতির। অভিনয়ের দিক থেকে বিসর্জন আমার মনে বিশেষ কোনো দাগ রেখে যায় নি। রঘুপতির ভূমিকায় দিনেন্দ্রনাথের আর গুণবতীর ভূমিকায় আমার কাকী সংজ্ঞা দেবীর অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য। জয়সিংহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয় আমার বিশেষ ভালো লাগে নি। তিন দিন অভিনয়

হয়েছিল এম্পায়ার থিয়েটারে আর তিন দিনই আমি আটক ছিলাম স্টেজের মধ্যে। অভিনেতাদের কথার খেই ধরিয়ে দেবার ভার ছিল আমার।

টেরারিস্ট দলগুলির সঙ্গে আমার যোগাযোগের কথা আমি আগেই বলেছি। ঢাকায় গিয়ে শ্রীসঙ্ঘের অনিল রায়, লীলা নাগ (বর্তমানে লীলা রায়) ও অন্য অন্য দলের লোকদের সঙ্গে আমি দেখা করি। ডাঃ ভূপাল বসু তখন ঢাকাতেই আত্মগোপন করে ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও আমার দেখা হল। কলকাতায় তখন টেগার্টের অপ্রতিহত দাপট। তাকে সরাবার জন্তু নানা দলের নানা প্রচেষ্টা চলেছে। আমি নিজে টেরারিস্ট দলভুক্ত কখনো ছিলাম না। কিন্তু এই দলগুলির বহু কর্মীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই এদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ যখন বললেন যে জোড়াসাঁকো বাড়িতে আমার একতলার ঘরে আমি যদি ওদের বোমা তৈরি করতে দিই তাহলে তাদের কাজের খুব সুবিধে হয়, আমি রাজী হলাম। রবীন্দ্রনাথ কিংবা আমার পিতা কি স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন যে তাঁদের বাড়িতে বোমা তৈরি করা হচ্ছে টেগার্টকে মারবার জন্তে! কয়েকদিন ধরে আস্তে আস্তে জিনিসপত্রের সঞ্চিত হল আমার ঘরে। বুড়ো হরিচরণ অনেক কাল থেকে আমাদের বাড়িতে ফরমাস মাসিক পিতলের নানা জিনিস তৈরি করে দিত। তাকে দিয়ে পিতল ঢালাই করিয়ে বোমার খোল তৈরি করিয়ে দিলাম ছেলেদের।

রাত্তির বেলা দু'তিনটি ছেলে এসে হাজির হত, এটা ওটা মিশিয়ে তারা তৈরি করত বোমা, আমি সাহায্য করতুম সাধ্যমত। ঘরের মেজেতে আর আমাদের হাতে লাগল হলুদে ছাপ। বাকুদের গন্ধ ঘরের প্রত্যেকটি জিনিসকে এমন করে জড়িয়ে ধরল যেন সেই নাছোড়বান্দা গন্ধ ঘর ছেড়ে যেতে রাজী নয়। এলিসন তখনো কলকাতায়, সেও ঘরের কোণে ইজিচেয়ারটিতে হেলান দিয়ে বসে আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখত। এমনি করে কিছু কিছু জিনিস তৈরি হল, বাড়ি থেকে চলেও গেল তৈরি জিনিসগুলো। জাহাজের একটি লোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিলাম একজন বন্ধু মারফৎ। তার কাছ থেকে রিভলবার সংগ্রহ করে যোগান দিলাম এই ছেলেদের। টেগার্টকে মারবার জন্তে যে দল যা-কিছু সাহায্য চেয়েছে আমি তাই দিয়েছি তখন। রোজ রাত্তিরে ছেলেরা আসত

জোড়াসাঁকোয়, নিশ্চিতি রাতে শুরু হত বোমা তৈরির কাজ। একদিন রাত্রিরে ঘরে আমরা তিন-চারজন। বোমা তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে, ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি। তখন রাত প্রায় দশটা। এমন সময় ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলো নলিনী, বললেন হ্যারিসন রোডে আমাদের দলের আফিস থানাতল্লাসী করছে পুলিশ, সেখান থেকে জোড়াসাঁকোয় আসবার খুবই সম্ভাবনা আছে। মুহূর্তের জ্ঞান মনে হল যেন শরীর অবশ হয়ে গেছে। এত রাত্রির, এত জিনিসপত্রের চারদিকে ছড়ানো, এখন করি কি! তখুনি দারোয়ানকে দিয়ে ট্যাক্সি ডাকিয়ে ট্যাক্সিতে সব জিনিসপত্র উঠিয়ে চলে গেলুম স্টাণ্ডের দিকে গঙ্গার ধারে। চলন্ত ট্যাক্সি থেকেই সব জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিলুম গঙ্গার দিকে। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এলুম। পুলিশ কিন্তু এল না সে রাত্রিরে। এলে কিন্তু রক্ষে ছিল না, আমাদের হাত আর ঘরের মেঝে সাক্ষী দিত আমাদের বিরুদ্ধে।

এই সময়ে আমার আলাপ হয় সন্তোষ মিত্রের সঙ্গে। সন্তোষ তখন কিছুটা ঘোঁসে এসেছে আমাদের শ্রমিক-কৃষক দলের দিকে। যুগান্তর দল থেকে বের হয়ে এসে সে তখন নিজের একটি দল তৈরি করেছে। সংগঠন করবার ক্ষমতা ও রাজনৈতিক কটনীতির দক্ষতা সন্তোষের ছিল। সুভাষচন্দ্র ও যতীন সেনগুপ্তর মধ্যে তখন নেতৃত্ব নিয়ে যে লড়াই চলছিল তাতে সে ছিল সেনগুপ্তর পক্ষে। সন্তোষ প্রায়ই আসত জোড়াসাঁকোয়, সঙ্গে আসত তার বন্ধু ও সহকর্মী ধীরেন। ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় ধীরেন প্রাণ হারায় কলকাতার রাস্তায়। সন্তোষ তখনো ব্যক্তিমূলক সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসবান ছিল। আমি তাকে কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করে দিয়েছিলুম তখন। অর্থের অভাবে সব দলগুলিই পঙ্গু হয়ে ছিল আর অর্থ ছাড়া অস্ত্র জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। অর্থ জোগাড় করবার নানা ফন্দি আঁটতে লাগল সন্তোষ। একদিন এসে বললেন যে সে একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান জুটিয়েছে। আমি সহি করে নিলে সে টাকা দিতে প্রস্তুত আছে। বললুম, আমার সহিতে সে দেবে কেন? ঠাকুরদাদা, পিতা সবাই রয়েছেন, আমার তো কোন অধিকারই নেই সম্পত্তিতে। সন্তোষ বললে যে জোড়াসাঁকো বাড়ি দেখিয়ে লোকটির কাছ থেকে টাকা ধার করা শক্ত হবে না। মনে খটকা থাকলেও আমি রাজী হলুম।

একদিন সকালে সন্তোষ সেই লোকটিকে নিয়ে হাজির করলে আমার কাছে। কেন জানি নে সে নিজেই রাজী হল না টুকা দিতে, আমিও বাচলুম। সন্তোষ প্রায়ই আসত, বাগানে ঘাসের উপর বসে আমরা দু'জনে জল্পনা কল্পনা করতুম। আমি গান গাই, বাড়িতে অভিনয় হলে সেই অভিনয়ের আসরে যাই, এইটে সন্তোষ আদবেই পছন্দ করত না। মনে আছে তখন 'নটীর পূজা' অভিনয় হচ্ছে আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ির প্রাঙ্গণে। সেই দিনই বিকেলে সন্তোষ এসে হাজির। বললুম তাকে, আজ আমাকে ছুটি দিতে হবে। আজ বাড়িতে 'নটীর পূজা' অভিনয়। সে ক্ষুব্ধ হল, আমাকে ভৎসনা করে বললে—এ কি বিপ্লবীর উপযুক্ত কাজ! অভিনয় দেখবে, গান শুনবে, এ সবেই সময়। আজ! বললুম, এসুখটিক দুর্বলতার আরকে ভিজে মন যখন নরম সঁগাৎসঁগাতে হয়ে গিয়েছিল তখন আমি নিজেই এ-সব বর্জন করেছি নিজের মনকে ঋজু, দৃঢ়, বীৰ্যবান করবার জন্তে। আজ আমার এই বর্জনের প্রয়োজন নেই। আজ গান, কবিতা, অভিনয়, কোনোকিছুর সাধ্য নেই আমাকে বিপ্লবের পথ থেকে সরায়। বরঞ্চ যখনি গান শুনি, অভিনয় দেখি, কবিতা পাড়ি তখনই মনের মধ্যে বিদ্রোহ ফণা তুলে গর্জায়, সংকল্প প্রবল হয়ে ওঠে যে কবে সকলের জন্তে এই আনন্দ পরিবেশন করা সম্ভব হয়ে উঠবে! তখন এই সমাজ-ব্যবস্থাকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দেবার জন্তে মনের আকাশে বিদ্রোহের কালো মেঘ ঘনীভূত হয়। সন্তোষ স্বীকার করল না আমার যুক্তি, আরো কঠিন বাক্যবাণ ছুঁড়তে লাগল আমাকে আঘাত করবার জন্তে। টেরারিস্ট ঐতিহ্যে মনের টুঁটি চেপে সমস্ত রস চুঁইয়ে দিয়ে তাকে কঙ্কাল করবার জোর নির্দেশ ছিল। বিপ্লবের শিখায় মনকে জ্বালিয়ে নেবার আগে এই গুরুতা-সাধনার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু যখন মালা বদল হয়ে গেল সেই শিখার সঙ্গে তখন গুরুতার উপর ঝোক এই দুর্বলতাকে চিরস্তন বলে মনে নেওয়ার সামিল। আমি এই দুর্বলতাকে অপরাধেয় বলে মানতে আদবেই রাজী ছিলাম না। সন্তোষ আমাকে প্রীতির চোখে দেখত, তা'ছাড়া আমার চেহারায় ও হাবভাবে তখন বোধ হয় রসের দুর্বলতার ছাপ কিছু কিছু ছিল যা দেখে সে শঙ্কিত হয়ে আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করত। আমার মন কিন্তু তখন নিঃসংশয়ভাবে

গ্রহণ করেছে বিপ্লবকে। গান, কবিতা, কোনো-কিছুকে ভয় করবার কোনো কারণ ছিল না তার। আমি তখন ইয়োরোপে যখন হিজলী বন্দী-নিবাসে, মরল সন্তোষ যাতকদের গুলিতে।

‘নটীর পূজা’ অভিনয়ের কথা বলছিলুম। সে যে কী অপূর্ব অভিনয় তা যে না দেখেছে তা’কে বোঝানো শক্ত। ‘ডাকঘর’ অভিনয়ের পণে এমন অভিনয় আর হয় নি। রাণা মেজেছিল মালতী, শ্রীমতী মেজেছিলো গৌরী আর বৌদ্ধ ভিক্ষু মেজেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন অভিনয় করেছিল মালতী, তেমনি অভিনয় করেছিল গৌরী। যখন আমাদের ফটকের মধ্যে দিয়ে প্রভু বুদ্ধের জয়স্তুতি করতে করতে রবীন্দ্রনাথ প্রাস্তরে এসে ঢুকলেন আর সেখান থেকে স্টেজে উঠে গেলেন তখন প্রবল ভাবের জোয়ারে আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। গৌরী তার পায়ের কাছে প্রণতা, তিনি আশীর্বাদ করছেন বৌদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করে— সে ছবি আমি ভুলতে পারব না এ জীবনে। রবীন্দ্রনাথের অভিনয় আমার এই শেষবারের মতো দেখা। তার অল্পদিন পরে আমি ইয়োরোপে চলে যাই।

দলের কাজ এগোচ্ছিল নেহাৎ মন্দাক্রান্তা ছন্দে। প্রবল বিরূপতা ও বিরুদ্ধতার উজান ঠেলে আমাদের এগোতে হচ্ছিল। তার উপরে লেগেই ছিল অর্থাভাবের মহামারী। যে সামান্য টাকা সংগ্রহ করেছিলুম ‘বসন্ত উৎসব’ ও ‘ঋতু চক্র’ করে, সে টাকায় কত দিনই বা চলে? জেল থেকে বের হয়ে আসবার পর নলিনী আর মুজফ্ফর দু’জনেরই শরীর ভালো ছিল না। তাদের চিকিৎসাও হচ্ছিল না উচিতমতো। খাবার যা জুটছিল তা খেয়ে সুস্থ লোকেও সুস্থ থাকতে পারে না। কী কষ্টই যে করেছে মুজফ্ফর আর এরা তা বলে শেষ করা যায় না। অনেকদিন হল মুজফ্ফর আর আমি সরে গেছি পরস্পরের থেকে। তার চলার ছন্দের সঙ্গে আমার চলার ছন্দের আদপেই মিল নেই। রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে সে আর আমি পরস্পর-বিরোধী শক্তি। আমি স্টালিনবাদ ও স্টালিনবাদীদের ঘোর শত্রু। স্টালিনবাদকে আমি হিটলার ও নাৎসীবাদের চেয়ে কম হিংস্র বলে মনে করি না। আর মুজফ্ফর এই স্টালিন ও স্টালিন-বাদেরই উপাসক। তবুও পঁচিশ বৎসর আগের সেই দিনগুলোকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। আর সেই কারণেই আমাদের দু’জনের মধ্যে সেদিন যে

প্রীতির সম্বন্ধ ছিল তার শিকড় মনের মাটি থেকে একেবারে উপড়ে ফেলে দেওয়াও সম্ভব নয়। মুজফ্ফর হয়তো পেরেছে; আমি পারি নি।

শ্রমিক-কৃষক দলের দ্বিতীয় কনফারেন্স করবার আয়োজন হতে লাগল। ১৯২৭ সালের গোড়ার দিকে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে আমাদের কনফারেন্সে হয়। আমি ছিলাম অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সেই কনফারেন্স দলের নিয়মাবলীর কিছু অদল বদল করা হল আর আমি নির্বাচিত হলাম দলের জেনারেল সেক্রেটারি। কনফারেন্সের শেষ দিনের অধিবেশনে শকলংওয়ালা এসে বক্তৃতা দিলেন। কনফারেন্সের দু' দিন আগে শকলংওয়ালা কলকাতায় এসে পৌঁছান। আমাদের কাছে খবর পৌঁচেছিল তাঁর কলকাতায় আসবার। মুজফ্ফর আর আমি ঠিক করলাম যে আমরা দু'জনে রামরাজাতলায় গিয়ে শকলংওয়ালার সঙ্গে দেখা করব। সেখান থেকে হাওড়ায় আসতে যে সময়টুকু লাগবে তার মধ্যে আমাদের বক্তব্য তাঁকে জানিয়ে দেব আর আমাদের কনফারেন্সে আসবার জন্তে তাঁকে অনুরোধ করব এই ছিল আমাদের বাসনা। রামরাজাতলায় গিয়ে বসে মেলের জন্তে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিনলুম আমরা থার্ড ক্লাসের টিকিট। তার উদ্দেশ্যে ওঠবার মতো টাকার মই ছিল না আমাদের। ট্রেন এল, সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় শকলংওয়ালা ছিলেন। আমরা দু'টিতে উঠলাম তাঁর কামরায়, শুরু করলাম কথাবার্তা। ট্রেন ছেড়ে দিতে না দিতে উঠল এসে টিকিট চেকার। দু'টি থার্ড ক্লাস টিকিট বের করে দিলুম আমরা, কত দণ্ড হল মনে নেই। তবে সে যাই দণ্ড হোক-না কেন সে দণ্ড চূকাবার মতো সামান্য পরস্যাও আমাদের পকেটে ছিল না। আমি আর মুজফ্ফর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি দেখে শকলংওয়ালা আমাদের অবস্থা বুঝলেন। পকেট থেকে একটি নোট বের করে চেকারের হাতে দিয়ে বললেন—আমি এদের ডেকেছিলাম। লজ্জায় আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার সামিল, কোথায় শকলংওয়ালাকে অভ্যর্থনা করতে এলাম, আর শেষে কিনা তাঁরই পকেট ছিঁড় করলাম আমরা দু'জনে! আমরা যে কী নিঃস্ব ছিলুম তা এর থেকেই বোঝা যাবে। ট্রেন এসে হাওড়ায় থামল। বিপিন পাল মহাশয় এগিয়ে এসে শকলংওয়ালাকে অভিনন্দন জানালেন। বড়বাজারের পুরুষোত্তম রায় একদল

মজুর নিয়ে হাজির ছিল প্ল্যাটফর্মে। আমাদের সহকর্মীরা হাজির ছিল লাল নিশান নিয়ে। শকলংওয়াল লাল নিশানটি টেনে নিয়ে গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে নিশান দোলাতে লাগলেন। কী ভিড় তখন কলকাতার পার্কে পার্কে, টাউন হলে শকলংওয়ালার বক্তৃতা শোনবার জন্মে। কী অসাধারণ ছিল তাঁর বক্তৃতার ক্ষমতা! ছোট্ট মানুষটি, হাসি-মাথা মুখ, দরদ-ভরা চোখ দু'টি। কিন্তু যখন বলতে শুরু করতেন তখন মনে হত যেন আগুনের ঝরনা ঝরে পড়ছে। সেদিন রাত্তিরে আমাদের কনফারেন্সে তিনি প্রায় ঘণ্টা খানেক বক্তৃতা দিলেন। ভারতবর্ষে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে ঝড় তুলে দিয়ে চলে গেলেন শকলংওয়াল। তাঁর আগে গান্ধীবাদকে এরকম খোলাখুলি আক্রমণ কেউ করে নি আমাদের দেশে। ১৯২৭ সালে শকলংওয়ালার সঙ্গে আমার আবার দেখা হল মস্কোতে। নভেম্বর-বিপ্লবের দশম বার্ষিক উৎসবে যোগদান করতে তিনি এসেছিলেন। তার পরে বার্লিনে তাঁর সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে। তখন থেকে আমাদের চিঠিপত্র বিনিময় শুরু হয়, দেশে ফিরে আসবার পরেও তাঁর কাছ থেকে প্রায়ই চিঠি পেতুম। তাঁর মৃত্যুতে আমি একজন বন্ধু হারালুম, আর কমিউনিস্ট-আন্দোলন হারালো একজন একনিষ্ঠ কর্মী।

টেরারিস্ট-আন্দোলনের সঙ্গে আমার যোগ থাকে মুজফ্ফর এটা পছন্দ করত না। তার ভয় ছিল যে আমি হয়তো এই নিফল রোম্যান্টিসিজমে গা ভাসিয়ে দেব কমিউনিজমের পথ থেকে সরে গিয়ে। এ ভয়ের কোনোই হেতু ছিল না। টেরারিস্ট দলের কর্মীদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, সততা, সাহস ও দেশের প্রতি ভালোবাসা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমার শ্রদ্ধা ছিল মানুষগুলির উপর, বিশ্বাস কিন্তু কখনো ছিল না তাদের ব্যক্তিমূলক ত্রাসবাদের পন্থার উপর। গান্ধীবাদ থেকে আমি সোজাসুজি কমিউনিস্ট মতবাদে পৌঁছই। গণ-আন্দোলনের সংস্পর্শে এসেই আমার রাজনৈতিক চেতনার জন্মলাভ ও বিকাশ। সে চেতনা ব্যক্তিমূলক ত্রাসবাদের সংকীর্ণতার কাছে কখনো আত্মসমর্পণ করে নি। গণ-শক্তির বিরাট বিস্তৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর টেরারিজমের অতি সংকীর্ণ পরিধির মোহে ধরা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। টেরারিস্ট দলগুলির সঙ্গে আমার যোগাযোগের দু'টি

কারণ ছিল। রাজনৈতিক ব্যবসাদার এরা কখনো নয়। এদের যদি টেনে নিতে পারা যায় আমাদের শ্রমিক-কৃষকদলে, এরা যদি আমাদের মতবাদ গ্রহণ করে তা হলে আমাদের দল শক্তিশালী হয়ে উঠবে এই ছিল আমার বিশ্বাস। টেরারিস্ট দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কলে কিছু লোককে টেনেও নিতে পেরেছিলুম আমাদের দলে। তার বিপদ যে ছিল না তা নয়। টেরারিস্ট দলগুলির সঙ্গে আমার এই ঘনিষ্ঠতা পুলিশের মনে আমাদের দল সম্বন্ধে সন্দেহ জাগাতে পারে এই আশঙ্কাও যথেষ্ট ছিল, হলও তাই। জোড়াসাঁকোর গলির মোড়ে আর আমাদের আফিসের নীচে গোয়েন্দা বিভাগের চরেরা ভন্ডনাতে লাগল সকাল সন্ধে। আমার সম্বন্ধে পুলিশের সন্দেহ ক্রমশই ঘন হয়ে উঠল। প্রচোতকুমার ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের বাড়ির কোনো যোগাযোগ ছিল না। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইংরেজ শাসকদের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন বটে তবুও তাঁদের চরিত্রে আর-একটা দিক ছিল যার জন্তে তাঁরা স্বধীসমাজে সম্মান পেয়েছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংগীত বিষয়ে তাঁদের অনুরাগ ছিল গভীর, অনুরাগও ছিল। বঙ্গ সাহিত্যের বহু ছঃস্থ সাধকদের তাঁরা সাহায্য করেছিলেন ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। প্রচোতকুমার ঠাকুর উত্তরাধিকারী স্বত্রে পেয়েছিলেন শুধু ইংরেজ শাসকদের উপর সীমাহীন ভক্তি আর তাঁবেদার-স্বলভ আনুগত্য, আর কিছু নয়। আমরা কখনো প্রচোতকুমারের ওখানে যেতুম না, তিনিও আসতেন না। এই ধরনের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা আমাদের পরিবারের স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। গভর্নেন্ট হাউসে আসা যাওয়ায় আর রাজকর্মচারীদের খাতির করার কাজেই প্রচোতকুমার ঠাকুরের দিন কাটত। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট ছিল প্রচোতকুমারের দোস্তুদের অন্ততম। বাগানবাড়ির প্রমোদ-উৎসবে টেগার্ট কখনো বাদ পড়ত না। আমার কার্যকলাপ সম্বন্ধে টেগার্ট প্রচোতকুমারকে বলে, আর সে যে আমাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবে তাও জানায়। আমার জ্যাঠামহাশয় গগনেন্দ্রনাথকে সব কথা জানিয়ে দেন : প্রচোতকুমার। আমি তখন কুমিল্লায়, কুমিল্লা থেকে ফিরে এসে দেখি বাড়ির শাস্ত্র আবহাওয়ার সরোবরে কে যেন পাখরের টুকরো ফেলেছে, চঞ্চল হয়ে উঠেছে

আবহাওয়া। আমার পিতা আমাকে ডেকে সব কথা বললেন। বুঝলুম ব্রিটিশ সিংহী তার ল্যাজের ঝাপটায় আমাকে লোহার গারদের পেছনে পাঠাবার মতলব করেছে। দলের আফিসে এসে মুজফ্ফর আর নলিনীকে ব্যাপারটা সব জানিয়ে দিলুম। দু'টি পথ খোলা ছিল তখন, গরাদের পেছনে চলে যাওয়ার সরু সড়ক আর দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সুদূর ও অজানা রাস্তা। স্থির করলুম যে দেশ ছেড়ে ইয়োরোপে যাবার জন্তে চেষ্টা করে দেখা যাক। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তখন আমাদের কোনো যোগ ছিল না বললেই চলে। মাঝে মাঝে মানবেন্দ্রনাথ ঝায়ের চিঠি আগুনের ফুলকির মতো উড়ে এসে পড়ত আমাদের হাতে আর কচিং কখনো নানা আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরে থবর এসে পৌঁছত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির থেকে। শুধু অকুরাগের মালমশলা দিয়ে বিপ্লবপন্থীর দল তৈরি করা যায় না, তারি গঠনে অনেক রকমের উপাদান লাগে। সে-সব তখন আদপেই ছিল না আমাদের। যদি সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়ে সেই-সব উপাদান সংগ্রহ করে আনতে পারি, নিজেকে তৈরি করতে পারি ভারতবর্ষের বিপ্লবের কাজের জন্তে তা হলে অনেক এগিয়ে যাবে আমাদের কাজ, এই ছিল আমার ধারণা। মুজফ্ফর ও নলিনী সায় দিল আমার মতে। শুধু শুধু জেলে আটক থেকে কি হবে? যদি রাশিয়ায় চলে যাওয়ার কোনো পথ খোলা থাকে তো তার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। এই হল আমাদের তিনজনের সিদ্ধান্ত। বাড়ি এসে পিতাকে বললুম যে আমি যদি ইয়োরোপ চলে যাই তা হলে কেমন হয়? ইয়োরোপে যাওয়ার পেছনে যে কী উদ্দেশ্য গোপন রয়েছে তা অবিশ্তি তাঁকে জানালুম না। তিনি তখনই সায় দিলেন। বোধ হয় আশ্বস্ত হলেন ভেবে যে জেলের হাত থেকে আমি বেঁচে গেলুম, হয় তো এও ভাবলেন যে ইয়োরোপে গেলে আমার মনের ধারা অন্য পথ দিয়ে বয়ে যেতেও পারে। আমার চলে যাওয়া তাঁর পক্ষে মর্যাস্তিক হবে জেনেও তিনি শুধু আমাকে জেলে থেকে বাঁচাবার জন্তে সম্মতি দিলেন। লেগে গেলুম আমি যাবার জন্তে তোড়জোড় করবার কাজে। আমার মতো লোকের পক্ষে পাসপোর্ট পাওয়া দুর্লভ ছিল। আজও যেমন সেদিনও তেমন পাসপোর্ট নির্ভর করত পুলিশের রিপোর্টের উপর। পুলিশ কমিশনার আর গোয়েন্দা-

বিভাগ দেশ শাসন করত, ইংরেজ গভর্নর উঠত বসত এদেরই ইঙ্গিতে। পুলিশ কমিশনর টেগার্ট ছিল বাঙলা গভর্নমেন্টের কায়েদে আজম। পাসপোর্টের জন্তে দরখাস্ত পেশ করবার কয়েকদিন পরেই তলব এল লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টারসেতে হাজির হতে পাসপোর্টের জন্তে। পাসপোর্ট পেয়ে গেলুম, বুঝলুম আমাকে জেলে না পূরে দেশ থেকে সরিয়ে দিতে চায় টেগার্ট। পরে বোধ হয় তার আপসোসের অন্ত ছিলনা, কোন ভুলে সে পাসপোর্ট দিল আমাকে! ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাস, সব আয়োজন সারা করে আমি তৈরি। জাহাজ ধরবার জন্তে আমাকে কলম্বো যেতে হবে। কাপড়ের টুকরোর উপর দলের হুকুমনামা তৈরি হল। দল যে আমাকে মস্কো পাঠাচ্ছে তার প্রতিনিধিস্বরূপ, সেটা লেখা ছিল সেই কাপড়ের টুকরোতে। সেই টুকরোটি টুপির মধ্যে ঢুকিয়ে সেলাই কোরে নিলুম। মুজফ্ফর, নলিনী আর আমি, আমাদের ত্রয়ীর বৈঠক বসত প্রায় রোজই। আমার সহকর্মীরা আমার চেয়ে কম উত্তেজিত ছিল না আমার যাওয়ার সম্বন্ধে। দিন ঘনিয়ে এল, জাপানী জাহাজে যাব ঠিক করেছিলুম। সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট ছিল আমার। একটি পরিচিত যুবক ইয়োরোপে যাবার জন্তে খুব উদগ্রীব ছিল, কিন্তু কিছুতেই বাড়ির অমত কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। আমার সেকেন্ড ক্লাস টিকিট বদলে তৃতো থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনে তাকেও সঙ্গে নিলুম। যাবার দিন যত ঘনিয়ে আসতে লাগল তত বাড়তে লাগল অস্থিরতা আমার মনের মধ্যে। যে বিরাট অজানা সমুদ্রে আমি ঝাঁপাতে চলেছিলুম তার ঢেউকে আমার কোনো ভয় ছিল না। অজানা কখনো আমাকে ভয় দেখাতে পারে নি। আমি বুঝতে পারছিলুম যে এবার আমার চরম ছাড়াছাড়ি হবে অতীতের সঙ্গে। সেই অতীতের উপর যেখানে ছুরি পড়বে সেটা বিঁধবে গিয়ে আমার পিতার বুকে। আমার চলে যাওয়া তাঁর পক্ষে হবে মৃত্যুদণ্ড। তবু উপায় ছিল না। আগে প্রতিদিন বিকেল বেলা তিনি বেড়াতে বের হতেন। বাড়ি ফিরতেন রাত আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ। কিছুকাল থেকে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ছিল, বাড়ি থেকে খুব কদাচিৎ বের হতেন। ক্রমশ যেন সব-কিছু ছেড়ে নিজেকে একলা করে নিচ্ছিলেন। আমার ইয়োরোপ যাবার

আগে তিনি প্রায়ই আমাকে ডেকে নিতেন তাঁর ঘরে। চুপটি করে শুয়ে থাকতেন কোঁচে, আমি বসে থাকতুম তাঁর মাথার কাছে তক্তপোষে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন দু'চারটি কথা। বুঝতে পারছিলুম তিনি নিজেকে প্রস্তুত করছেন। যাবার দিন এল, বৈশাখের সে এক রৌদ্র-দগ্ধ দিন। বিকেলের গাড়িতে মাদ্রাজ যেতে হবে, সেখান থেকে যেতে হবে কলম্বো জাহাজ ধরতে। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলুম। ইয়োরোপ সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। প্রণাম করে বিদায় নেবার আগে যে কথাটি বলেছিলেন সেটি আজও মনে আছে—গুরু পেছনে ছুটিসু নে। তোর ভিতরে যে গুরু আছেন তাঁকে জাগ্রত কর। তখন দেখবি লোক আপনি আসবে তোর কথা শুনতে। পিতা তাঁর ঘরে কোঁচে বসেছিলেন, তাঁর কাছে এসে বসলুম। তিনি দু'তিনবার বললেন—তুমি তো দু-এক বছরের মধ্যেই ফিরে আসবে, তাই না? আশ্বাস দিলুম তাঁকে, কিন্তু তখন বুঝতে পারি নি কেন তিনি এ কথা বারবার আমাকে শুধোলেন। পরে বুঝেছিলুম যে এ পারের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ শেষ হতে বেশি দেরি নেই এটা তিনি বুঝেছিলেন। তাই বোধ হয় তাঁর একান্ত ইচ্ছে ছিল যে আমার সঙ্গে তাঁর যেন দেখা হয় শেষ থেয়ার আগে। প্রণাম করলুম, কিছু বললেন না। শুধু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এলেন দেউড়ী পর্যন্ত। গাড়িতে উঠলুম, ফিরে দেখলুম তখনো তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন— শীর্ণ মুখ, চোখ দুটি শান্ত, বেদনায় ভরা। সব-কিছুর মধ্যে থেকেও মানুষ যে কেমন করে একলা হয়ে যায় তা তাঁর দিকে তাকিয়ে বুঝলুম। একলার এমন অসহ ও নিবিড় রূপ আমি আর কখনো দেখি নি। এ জীবনে সেই শেষ বারের মতো তাঁকে দেখলুম।

একদিন বিকেলে কলম্বো থেকে জাহাজ ছাড়ল। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে দেখলুম ভারতবর্ষের তীর আশ্তে আশ্তে মিলিয়ে গেল ঢেউয়ের মধ্যে। মনে হতে লাগল সারা ছুনিয়ায় কেউ যেন নেই, শুধু আমি আর এই পাগল নীল ঢেউগুলো। একটা অসহায় নিঃসঙ্গতা আচ্ছন্ন করল আমাকে। শুধু মনের চোখে ভাসতে লাগল বৈশাখের সেই বিকেল বেলাটি। দেউড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন বুড়ো মানুষটি, চারিদিকে চলাচল,

শুধু একা তিনি যেন পাথর হয়ে গেছেন। এ পৃথিবীর হয়েও তিনি যেন এ পৃথিবীর সঙ্গে সব দেনা-পাণ্ডনার সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছেন। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছি রেলিং ধরে। সমুদ্রের নোনা হাওয়া কাপ্টা মারছে চোখে মুখে, বিজ্রপের হাসির মতো আঘাত করছে আমাকে এসে। আমিও যেন পাথর হয়ে গেছি। নীল সমুদ্রের বুক চিরে জাহাজ এগিয়ে চলল অন্ধকারের দিকে।

সেদিন সেই বৈশাখী অপরাহ্নে আমাকে ঘিরে শুধু ঢেউ আর ঢেউ। তীর নেই, আশ্রয় নেই, শুধু ফেনার মুকুট-পরা ঘন-নীল ঢেউ, শুধু অশ্রাস্ত ভেসে চলা, শুধু ঢেউয়ের চূড়ায় ছলে মরা। আমার বকের মধ্যেও সেদিন তীর নেই। যে তীরের সঙ্গে দড়াদড়ির সম্পর্ক চুকিয়ে ভেসে পড়লুম সেই তীরের বন্ধন ছিন্ন করার তীব্র বেদনার বাষ্পে বকের ভিতরটা তখন অসাড়। একটি তীর ফেলে এলুম পিছনে, সামনে তীর কিন্তু তার অনিশ্চিত আহ্বান আলো-ঝলমল প্রকাশ নিয়ে স্থম্পষ্ট ছিল না সেদিন আমার মনের মধ্যে। আমার জীবন সেদিন তীরহারা, দু'কূল কূল-হারা। সামনের তীর পাবার তীব্র ব্যাকুলতা মনকে হয়রান করে মারছিল, এক মুহূর্তের জন্তেও রেহাই দিচ্ছিল না আমাকে। বুঝছিলুম যে, হয় মরিয়া হয়ে এগিয়ে যেতে হবে ঢেউ কেটে, নয় তলিয়ে যেতে হবে, ডুবে মরতে হবে। জাহাজের রেলিং ধরে আমি দাঁড়িয়েই রইলুম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তীর থেকে দূরে-চলে-আসা দুটি পাখি অনেকক্ষণ জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছিল, সন্ধের অন্ধকারে তারা আশ্রয় নিল জাহাজের মাস্তুলে। তাদের আশ্রয় ছিল, আমার সেদিন কোনো আশ্রয় ছিল না মনের মধ্যে, ছিল শুধু ঢেউ আর লোনা জল বকের পাথরের তলায়।

রাত হল, খাবার ঘণ্টা বাজল, নীচে চলে গেলুম ডেক থেকে। আমি জাপানী জাহাজে ইয়োরোপ যাওয়ার বন্দোবস্ত করেছিলুম। আমার মনে ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে তীব্র বিরূপতা ছিল। যে ব্যবহার আমরা পেতুম তাদের কাছ থেকে তাতে আত্মসম্মান বজায় রেখে কোনো ভারতবর্ষীয়ের পক্ষে ওদের সঙ্গে দেখা সম্ভব ছিল না। আমাদের বাড়িতে অনেক ইয়োরোপীয়েরা আসতেন, তাঁরা কিন্তু আমাদের দেশে যে জাতের ইয়োরোপীয়দের সাধারণত দর্শন মেলে, ক্লাইভ স্ট্রিটের সেই সওদাগর জাতের ইয়োরোপীয় ছিলেন না। তাঁরা আমাদের দেশকে ভালোবাসতে পেরেছিলেন বলেই আমাদের বাড়িতে আসতেন। তাঁরা বণিকবৃত্তি করবার জন্য আমাদের দেশে আসেন নি। মানব-সংস্কৃতির বিশ্বজনীনতায় একান্ত বিশ্বাসী তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির ধারার সংগম সাধনের জন্যে গভীর আকুলতা নিয়ে আমাদের দেশে এসেছিলেন। এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন প্রভৃতি ইয়োরোপীয়েরা আমাদের পরিবারের জীবনে গভীর আত্মীয়তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। আমরা ধন্য হয়েছিলুম তাঁদের পেয়ে। ভৌগোলিক অপদেবতার দেওয়া জাতীয়তার কলঙ্ক-টিপ তাঁরা নিঃশেষে মুছে ফেলেছিলেন। এই মহান ইয়োরোপীদের কাছ থেকেই জাতীয়তাবাদের অপদেবতার নোংরামি ও ফাঁকি ধরতে শিখেছি আমি। বিশ্বমানবতার উপলব্ধি মানুষকে যে অকল্পনীয় রূপ দেয় তা এইসব মানুষকে দেখে আমরা শিখেছি।

ক্লাইভ স্ট্রিট মার্কা যে-সব সাধারণ ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে দৈববশে দেখা হয়ে যেত, জাতীয় ঔদ্ধত্য ও ভারতবর্ষীয়দের প্রতি অবজ্ঞা তাদের চোখমুখ হাবভাব থেকে ঠিকরে পড়ত। সে অবজ্ঞা সহ করেও ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ব্যারিস্টার আর আই. সি. এস. কাল সাহেবের দল 'ক্যালকাটা ক্লাব' প্রভৃতি ক্লাবে ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে মেশবার জন্যে লালায়িত হয়ে ভীড় জমাত।

ইয়োরোপীয়েরাও কিন্তু এদের প্রাণ থেকে ঘৃণা করত। এত পদলেহনের পরেও এদের নিজেদের গভীর মধ্যে টেনে নিত না কখনো। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কালো সাহেবেরা তাতেই খুশি। খেতাবদের বুটের ধুলো যতটুকু পায় তাতেই তারা ধন্য মনে করত নিজেদের। আমাদের বাড়িতে ইঙ্গ-বঙ্গ

সমাজের এই সাহেবিয়ানা আর বিবিয়ানা কখনো ফটক পার হতে পারেনি। এই মর্যাদাহীন নকলনবিশিষ্টতার প্রতি আমাদের ঘৃণার অস্ত ছিল না। সাহেব আর মেমরা পাছে আমাদের খালি পা দেখে বিকল হয়ে পড়েন সেই উৎকর্ষায় ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কালো সাহেবরা মোজা পরে পা ঢাকবার জন্য আকুলি-বিকুলি করে মরত। এই রকমই একটি কালো ও ধলো সাহেব-মেমদের মজলিশে মোজা-বিহীন চটি-পরা পায়ে হাজির হয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কী ভূমিকম্পের সৃষ্টি করেছিলেন তা বলা যায় না। গান্ধীজির টানে অসহযোগ আন্দোলনের সড়কে যখন আমি নেমে এসে দাঁড়াই তখন বেশভূষার একটু যে বিশেষ ভঙ্গী ও চিকনতা ছিল আমাদের পরিবারে সেটাও ত্যাগ করি। খালি পা, হাঁটু পর্যন্ত খদরের ধূতি, গায়ে খদরের চাদর— এই ছিল আমার বেশ। এই বেশেই ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ড্রইংরুমে অনেকবার হাজির হয়েছি। সেই হাজির হওয়ার মধ্যে বিদেশী সাহেব-বিবিদের একটু রাগিয়ে দেবার মতলব যে ছিল না তা বলতে পারি নে। চৌরঙ্গীর রাস্তায়, ফুটবল খেলার মাঠে, ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি আর ঘুঁসোঘুঁসি লেগেই থাকত। ইয়োরোপের সঙ্গে সত্য পরিচয় হবার পরে আমি বুঝলুম যে ভারতবর্ষে যে-সব ইয়োরোপীয় পঙ্গপাল আমাদের ক্ষেতের ধান উজাড় করবার জন্যে আসত তাদের দিয়ে ইয়োরোপীয়দের বিচার করা তাদের প্রতি কী ঘোর অবিচার করা। এমনি ভুলই ইয়োরোপের লোকেরা করে থাকে যখন যেসব ধনী ভারতবাসীরা মদ খেতে ও নৃত্য করতে ইয়োরোপে যায় সেই অর্ধপশু-মানুষ জীবগুলিকে দেখে মনে করে যে ভারতবর্ষের সমস্ত লোকই বোধহয় এমনি অদ্ভুত জন্তু।

ইয়োরোপীয় জাহাজে যাব না বলেই কলকাতা থেকে কলম্বো গিয়ে জাপানী জাহাজ ধরলুম। মনে বিশ্বাস ছিল যে জাপানীরা এশিয়ার লোক, এরা এশিয়ার লোকদের প্রতি নিশ্চয় ভালো ব্যবহার করবে, এরা অস্ত্র ইয়োরোপীয়দের কাছে মাথা নীচু করবে না। ছোটোবেলায় রুশ-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস পড়ে মন ভারি খুশি হত। জাপানীরা ইয়োরোপীয়দের হারিয়ে দিয়েছে, মনে হত বুঝি সেটা আমারই জিত। ইংরেজদের প্রতি মনের বিদ্বেষ আর তাদের তাড়াতে না পারার অসহায়তা এই দুই যেন মনের সব ক্ষোভ মিটিয়ে নিত জাপানীদের জয়লাভে। ইয়োরোপ ও

ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে তখন আমার সত্য পরিচয় ঘটেনি। পরাধীনতার বেদনার বিষে মন তখন জর্জরিত। কমিউনিজমের সঙ্গে তখন আমার পরিচয় এত অল্প যে জাতীয়তাবাদের পাক থেকে আমার মনকে তখনো সম্পূর্ণ উদ্ধার করতে পারি নি।

জাহাজে থার্ড ক্লাসের যাত্রীদের মধ্যে একজন ইংরেজ, দুটি জার্মান, দুটি ইটালীয় গায়ক-গায়িকা, জাপান থেকে তারা ইটালীতে ফিরে যাচ্ছে, আমরা দুটি ভারতবাসী আর বাদবাকী সব জাপানী। দু-এক দিনের মধ্যেই জাপানীদের আচরণ আমাকে বিস্মিত করল। খাবার টেবিলে ইটালীয় পুরুষটি যেভাবে হুকুম দিত সেটা যে কি করে জাপানী খানসামারা সহ্য করত তা ভেবেই পেতুম না। একটি জাপানী বৃদ্ধা আমার পাশেই বসতেন। একদিন ইটালীয় পুরুষটি রুঢ়ভাবে তাঁকে ছুনদানটি এগিয়ে দিতে বলল। একজনও জাপানী পুরুষ প্রতিবাদ করল না তার, আমি করলুম আর আমার সঙ্গে তার হাতাহাতি হওয়া ছাড়া আর সব হল সেদিন দুপুরে, ইটালীয় পুরুষটি ছিল আবার আমার ক্যাবিনের অংশীদার। রাত্তিরে ক্যাবিনের পাখা নিয়ে লড়াই চলত আমাদের মধ্যে। সে ঘুরিয়ে নিত পাখা তার দিকে, আমি উঠে ঘুরিয়ে দিতুম আমার দিকে, আবার সে উঠত, আবার আমি উঠতুম, সারারাত চলত আমাদের লড়াই। ইংরেজটি ছিল এনজেনিয়ার, অনেক বছর চীনদেশে কাজ করেছে। চীনের বিপ্লবের টেউ তাকে চীনের তীর থেকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছে, ফেলে দিয়েছে মাঝ দরিয়ায়। সে চলেছে ফিরে ইংল্যান্ডে, চীনের বিপ্লবীদের উপর রাগে আক্রোশে সে প্রতিদিন গজরাত। তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব জমে গিয়েছিল, যত পারতুম চীনদেশের খবর নিতুম তার কাছ থেকে। খুশিতে মন ভরে যেত চীনের বিপ্লবীদের কথা শুনে। জার্মান দুটি ছিল সার্কাসের লোক। পৃথিবীর নানাদেশে সার্কাস দেখিয়ে বেড়িয়েছে কয়েক বছর। এখন ফিরে চলেছে দেশে। শরীর-সর্বস্ব লোকেরা "সব দেশেই যেমন হয় এরাও তেমনি। ডেকের উপর লাফাত, লোহা ধরে ঝুলত, শরীর নিয়েই থাকত বিভোর হয়ে। বেশির ভাগ সময়টা আমি কাটাতুম ডেকে। জাহাজের খোলার মধ্যে যেখানে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ক্যাবিন সেখানে ঢুকলে দম বন্ধ হয়ে আসত। জাহাজের সেই দিনগুলো

ভোলবার নয়। মনটা তখন রয়েছে নিরুন্ম হয়ে, হাত-পা এলিয়ে পড়ে। ডেকের উপরে আমার প্রতিদিনকার সাথী ছিলেন স্রেই বৃদ্ধা জাপানী মহিলা। ছোট্ট মানুষটি, হাঁটুর উপর ভর দিয়ে চুপটি করে বসে থাকতেন দূর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। ইংরেজী জানতেন না। তাই হাত দিয়ে ইশারায় কথা বলতেন আমার সঙ্গে। সন্কে হয়ে আসত, আকাশ আর সমুদ্র দিশেহারা নীলে একরঙা হয়ে যেত মিশে। ঝোড়ো বাতাস আনত নীল সমুদ্রের ছোঁওয়া। আমি গানের পর গান গুনগুনোতুম, বৃকের মধ্যে অশান্তির যে ঝোড়ো বাতাস তাকে শান্ত করবার জন্তে। এমন করে জাহাজের দিনগুলি কাটছিল, মনে হচ্ছিল যেন যুগযুগান্ত চলে গেছে। কবে যে আমি কূল থেকে ভেসে পড়েছি তার হিসেবই হারিয়ে ফেলেছি। সবে তখন তীরের সঙ্গে সন্ধক চুকিয়ে ভেসেছি। বৃকের মধ্যে ক্ষত তখন বড্ড তাজা, স্মৃতির লোনা হাওয়ায় ছোঁওয়ায় জ্বলছে তখন বৃকের ক্ষতটা। এডেন হয়ে জাহাজ থামল গিয়ে পোর্ট সেডে। তারপরে সমুদ্র গেল হেরে বালির সমুদ্রের কাছে। স্নেহজ্বালের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল জাহাজ। হৃদিকে ধুধু করছে মরুভূমি, হিংস্র বালির জ্বালাময়ী গুহ্রতা দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঝে মাঝে খালের ধারে যেখানে বালি তোলার কাজ চলেছে সেখানে মেয়ে-পুরুষ মজুরদের ভীড়। তা' ছাড়া জনমনিষির চিহ্ন নেই। নিঃসঙ্গ মরুভূমি সূর্যের আলোতে ধুধু করে জ্বলছে। কচিং কখনো দেখা যায় বহু দূরে চলছে বালি রঙের উটের দল। মরু-ডাকিনী যেন ঘূর্ণি হাওয়ায় বালি উড়িয়ে তাদের তৈরি করেছে! সারাদিন জাহাজ চলেছে সরু খালটির মধ্য দিয়ে, মরুভূমির আগুনে জাহাজ উঠেছে তেতে! অসহ্য গরম সারাদিন, আবার সন্কে হতে না হতে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকে। সূর্য যেন আলোর সঙ্গে সঙ্গে তার সব উত্তাপটুকু মুছে নিয়ে যায় মরুভূমির বুক থেকে। চাঁদের আলো নেমে আসে মরুভূমির বুকে। বালি আর চাঁদের আলো মিশে একাকার, সমস্ত মরুভূমি হয়ে যায় চাঁদের আলো। তার কদিন পরেই ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে একদিন বিকেলে জাহাজ পৌঁছল গিয়ে মার্সেলে। জাহাজ থেকে নাবব নাবব করছি, এমন সময় জাহাজের এক জাপানী অফিসার এসে বললেন— আপনি তো প্যারিসে যাচ্ছেন, এই বৃদ্ধাও সেখানে যাবেন। আপনি যদি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান

তো বড়ো ভালো হয়। তখুনি রাজী হলুম। দলে দলে জাপানী পুরুষ মেয়ে নেবে গেল জাহাজ থেকে, সবাই যাচ্ছে প্যারিসে, একজনও কিন্তু বৃদ্ধাকে নিয়ে যেতে রাজী হল না! ইয়োরোপের নকলনবিশ আধুনিক জাপানের চেহারা দেখে নিলুম ভালো করে। বৃদ্ধাকে নিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে রওনা দিলুম, পরদিন সকালে পৌঁছলুম গিয়ে প্যারিসে। অস্থস্থ ছেলেকে দেখবার জন্যেই বৃদ্ধার প্যারিসে আসা, যে বোর্ডিং হাউসে ছেলেটি থাকত সেইখানে আমরা উঠলুম। আমার সঙ্গে যে ছেলেটি গিয়েছিল তাকে পাঠালুম পরিচিত দু-একটি লোকের খোঁজ নেবার জন্যে। একলা ঘরে কখনো বসছি, কখনো পায়চারী করছি অসহায় নিঃসঙ্গতায় মন ও শরীর নিঃশ্বাস, অথচ মনের অস্থিরতা বসতে দিচ্ছে না চুপ করে। এমন সময় দরজা খুলে বৃদ্ধা এসে হাজির, আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে চললেন। বুঝলুম ছেলের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে। দোতালায় ছোট্ট একটি ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। ঘরটি যেমনি ছোট্টো তেমনি অন্ধকার। উঠানের দিকের জানালা দিয়ে যে ক্ষীণ আলোটুকু ঘরে ঢোকে, তা জানলা পার হয়েই দেউলে হয়ে যায় ঘরের অন্ধকারের ধাক্কায়। তাই ঘরটিতে দিনরাত জালিয়ে রাখতে হয় বিজুলী বাতির আলো, ঘরের একধারে খাট— তারি সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম আমি আর বৃদ্ধা। নজর পড়ল শুধু একজোড়া চোখ শীর্ণমুখের ফ্রেমে বাঁধা। চোখ দুটিকে ধরে রাখবার জন্যে যতটুকু নইলে নয় ততটুকু রেখে আর সব রেখা যেন মুছে শেষ করে দিয়েছে মুখখানি। কাপড়ের তলায় শরীর নজরেই পড়ে না। আমাকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধার কী কান্না। ছেলেটিরও চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমার হাত তার রক্তশূণ্য শীর্ণ হাত দিয়ে ধরে ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে বললে— আমার মা কি বলছিলেন জানো? তিনি বলছিলেন যে তুমি তাঁর ছেলে। উত্তেজনায় যক্ষ্মারোগীর জ্বর উত্তপ্ত চোখদুটি যেন আরো বড়ো হয়ে গেল। জ্বলতে লাগল কালো হীরের টুকরোর মতো। তারপর সে ক’দিন প্যারিসে ছিলুম রোজই একবার ছেলেটির কাছে গিয়ে বসতুম। প্যারিস থেকে বার্লিনে যাবার কিছুদিন পরে প্যারিসে যে বোর্ডিং হাউসে ছিলুম তার মালিকের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলুম। বৃদ্ধা আমাকে জানাতে বলেছেন যে তাঁর ছেলে মারা গেছে। তিনি জাপানে ফিরে

গেছেন। এই ঘটনার দু-তিন বছর বাদে রবীন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীয়বার জাপানে যান তখন টোকিওর হোটেলে একজন বৃদ্ধা এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, বলেন— জাহাজে একটি ভারতীয় ছেলের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়, যে তাঁকে তাঁর অসুস্থ ছেলের কাছে নিয়ে যায় প্যারিসে। তারও পদবী ছিল ‘টাগোর’ হয়তো বা সে আপনার আত্মীয়, যদি হয় তো এই সিন্ধের টুকরোটুকু তিনি যেন তার হাতে পৌঁছে দেন। লাল সিন্ধের টুকরোটি রবীন্দ্রনাথ পৌঁছে দেন আমার মার কাছে, আর খবরটি শুনেছিলুম তাঁর নিজের মুখ থেকে বার্লিনে।

প্যারিসে এসেই মহম্মদ আলির খোঁজ করতে লাগলুম। সে ছিল কমিনটার্নের কর্মচারী, মস্কো যাবার জন্তে ভারতবর্ষ থেকে কেউ প্যারিসে এলে তার মস্কো যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করে দেওয়া ছিল মহম্মদ আলির কাজ। একদিন বিকালে মহম্মদ আলির সন্ধানে হাজির হলুম গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির আফিসে। আফিসে আমার ঠিকানা দিয়ে দিলুম, মহম্মদ আলিকে দেবার জন্ত একখানি ছোট চিঠিও লিখে রেখে এলুম। আফিস থেকে বের হয়ে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছি, হঠাৎ দেখি আট-দশজন লোক আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কথায় বললুম তারা ভিটেকটিভ, আমার পাসপোর্ট দেখতে চায়। সঙ্গে পাসপোর্ট ছিল না, তাই নাম আর বোর্ডিং হাউসের ঠিকানা দিয়ে রেহাই পেলুম। এমন করে তারা আমাকে ঘিরে ধরেছিল যে মনে হয়েছিল যে শকুনির মতো ছোঁ মেরে আমাকে নিয়ে ফেলে বুঝি পুলিশের আড্ডায়। দুদিন বাদে মহম্মদ আলি এসে উপস্থিত হল। আমার আসার খবরটা মস্কোতে পৌঁছে দিতে বললুম তাকে। বার্লিনে যাদের সঙ্গে দেখা করতে হবে তাদেরও ঠিকানা নিয়ে নিলুম তার কাছ থেকে। (১৯২৮ সালে আমি যখন মস্কোতে তখন মহম্মদ আলিও এল মস্কোতে।) কমিনটার্নের দপ্তরে খবরের কাগজ কেটে কেটে টুকরো সংকলনের খাতা ভর্তি করার কাজে সে নিযুক্ত হলো। এই কাজই সে করছিল যখন আমি মস্কো ছেড়ে আসি। পরে লোকমুখে শুনেছিলুম যে স্টালিনের রক্ত-লোলুপতা তাকেও রেহাই দেয়নি।

এইসব গুরুগম্ভীর ব্যাপারের মধ্যে একটি হালকা ঘটনাও ঘটল

একদিন সন্ধ্যাবেলা। আমাকে ধরে নিয়ে গেল বন্ধুরা সোরব ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের নৃত্য-আসরে। প্রকাণ্ড ঘর শত শত তরুণ-তরুণীর হাস্যে মুখর, কোঁতুক-লীলায় উচ্ছল। সবাই নাচের বেশ-ভূষায়। গলাবন্ধ কোট কলকাতায় নিউ মার্কেটের দর্জির তৈরি চোঙার মতো ট্রাউজার আর ভারী জুতো পরে সেই আসরে মূর্তিমান বেসুরোর মতো হাজির হলেম আমি, ঘরের এক প্রান্তে একটি কোণে যেখানে কারো নজরে পড়বো না এমন একটি জায়গা বেছে বসলুম গিয়ে। ঠিক করে ছিলুম কিছুক্ষণ নাচ দেখে সরে পড়ব। দেশে থাকতে স্ত্রী-পুরুষের এই যুগ্ম-নৃত্য আমি অনেকবার দেখেছি। আধুনিক ইয়োরোপীয় বল-নাচকে আমি নৃত্য বলেই মনে করি না। ওর উদ্দেশ্য গতির ছন্দের ব্যঞ্জনা নয়, যৌন-উত্তেজনার রসদ যোগানোই হচ্ছে ইয়োরোপের আধুনিক যুগ্ম-নৃত্যের উদ্দেশ্য। আমার মনে তীব্র বিরূপতা ছিল এই ধরনের নৃত্যের উপর। গতির ছন্দকে প্রাণের লীলাকে মাংস ঘাঁটাঘাঁটির অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করা কেন? রসকে মাংসের কারবারে লাগানো কেন? সোজাসুজি মাংসের কারবারে যে কোথায় বাধছে তা তো দেখছিলেন। তা ছাড়া আমার এই কসরৎ করা শরীরটা আর যে কাজেই লাগুক, নাচের পক্ষে যে সেটা একান্ত বেমানান তা আমি ভালো করেই জানতুম। বেথাপ্লা বোঝবার মতো ছিটে ফোটা রস-বোধ দান করে বিধাতা আমাকে অনেক উত্তট অপঘাত থেকে বাঁচিয়েছেন। ঘরের কোণে নাচ দেখছি, এমন সময় একজন বন্ধু একটি ফরাসী মেয়েকে নিয়ে হাজির হলেন। আলাপের পরেই মেয়েটি প্রস্থ করলেন কেন আমি চুপ করে এক কোণে বসে। বললুম—নাচতে জানি না, তরুণী বললেন ও, এই ব্যাপার! তা নাচ জানবার তো বিশেষ দরকার নেই, আপনি আমার পা ফেলার দিকে নজর দিয়ে পা ফেলবেন তাহলেই হয়ে যাবে, উঠে পড়ুন। আমি ওজর দেখিয়ে বললুম পায়ে আমার ভারী জুতো, ও পরে নাচব কী করে। তরুণীটি নাছোড়বান্দা, বললেন, কিছু যায় আসবে না, আপনার পায়ের দিকে আর কে তাকাচ্ছে? ওজরের পর ওজর করে চললুম কথার বায়ব্য-অস্ত্র দিয়ে সব ওজরই কাটিয়ে দিতে লাগল

মেয়েটি। নিজের উপর ধিক্কার হল; সোজা বলে দিলেই তো হত যে এই ধরনের নাচ আমি ঘৃণা করি। বন্ধুটি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবারে বললেন—এত সাধাসাধি করছে, না নাচাটা অভদ্রতা হবে। উঠো পড়ো। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালুম। মেয়েটি শেখালেন কেমন করে একটি হাত তার কোমরে লতিয়ে দিয়ে আর একটি হাত দিয়ে তাঁর হাত ধরে দাঁড়াতে হয়। বললেন, এবারে নাচের সুর বাজতে শুরু করলেই আমি তালমাফিক পা ফেলব। আপনি আমার পা ফেলার অনুযায়ী পা ফেলবেন। মহাবিপদ, তাঁর পা ফেলাটি মনে মনে আন্দাজ করা ছাড়া তো উপায় নেই, মাথা নীচু করে তাঁর পা ফেলা দেখে দেখে নাচব নাকি! বেজে উঠল বাজনা, সঙ্গিনী ঘুরতে শুরু করলেন তারি তালে তালে। অসহায় রাগে গর্জাতে গর্জাতে আমিও ঘুরতে শুরু করলুম। তিন-চার পাকের পর আর বেশি ঘুরতে হল না। একবার সঙ্গিনীটি ছুঁপা পেছিয়ে গেলেন, আমাকে এগোতে হল তাঁর দিকে ছুঁপা। হঠাৎ আত্ননাদ ও আমাকে ঈষৎ ধাক্কা। চমকে উঠে পিছু হঠে দেখি তরুণীর স্রাটিনের জুতার ডগায় আমার জুতার চিহ্ন। বুঝলুম আমার বে-তালা পায়ের তালটি পড়েছে গিয়ে তরুণীটির স্রাটিনের জুতা পরা কোমল পায়ে। এই বিরাট বপুর ভারটি কোমল পায়ের আঙুলে যে কেমন মিষ্টি লেগেছে তা বুঝতেই পারলুম। লজ্জায় সংকুচিত হয়ে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে এসে বসলুম চোঁকিতে। চোখে তাঁর ভৎসনা ও রোষ। অহুযোগেও তারই আভাস। বার বার ক্ষমা চাইলুম, কিন্তু মনে মনে বললুম দোষ কি আমার? আনাড়ির উপর অত্যাচার করে তুমিই তো ঘটালে অনর্থ। সে সুন্ধের মতো আর নাচা হলো না মেয়েটির। আমারও সেই প্রথম ও শেষবারের মতো নাচ।

প্যারিসে দিন সাত আট কাটিয়ে গেলুম বার্লিনে। কী আশ্চর্য প্রভেদ এই দুটি শহরের চেহারায় ও হাবভাবে! প্যারিস সুন্দর, অগোছালো, নোংরা, বিলাসী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ। বার্লিন ধূসর, গোছালো পরিষ্কার, কর্ম-কঠোর রুজুমতি। প্যারিস যেন নটী, তার চেহারায় রসের দুর্বলতার ছাপ সুস্পষ্ট। বার্লিন যেন ধ্যানী তপস্বী, তার দৃষ্টি, চেহারা

সব যেন জ্বলছে ধ্যানের আগুনে। অন্তরে যে কি যেন খুঁজে ফিরছে
পাগলের মতো, সেই ভয়ংকর খুঁজে ফেরার রুদ্ধতা তার চোখে
মুখে। প্যারিসের চেহারার দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে তার
 সৃজনী শক্তি তলানিতে এসে পৌঁচেছে। অন্তরে সে দেউলে তাই
 এতো ঘটা বাইরে। বার্লিন, সে সৃষ্টির বীর্ষে ভরা, অন্তরে তার অহরহ
 সৃষ্টিপরীক্ষা চলেছে তার রস ও চিন্তার অফুরন্ত মিশ্রণে। তাই শুধু
 বাইরেরটাকে সাজাতে গোছাতে সে ব্যস্ত নয়। মে মাসে বসন্তের
 দিনে বার্লিনে এসে পৌঁচেছিলুম। বার্লিনে এসেই মহম্মদ আলি যাদের
 ঠিকানা দিয়েছিল লেগে গেলুম তাদের খুঁজে বের করবার কাজে।
 ভাষা জানি না, রাস্তাঘাট চলা যে কী মুশ্কিল! কাগজে ঠিকানা
 লিখে একে ওকে দেখাতে দেখাতে কোনো মতে গিয়ে পৌঁছলুম
 একদিন বিকেলে একজনের কাছে। তারপর সকলের সঙ্গে দেখাশোনা
 সহজ হয়ে গেল। ‘হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশন’ বলে ভারতীয়দের একটি
 প্রতিষ্ঠান ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা অ্যাসোসিয়েশনের মজলিসে গিয়ে
 হাজির হলুম। আলাপ হল অনেকের সঙ্গে। এইরকম করে পরিচয়ের
 পরিধি বেড়ে চললো।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই বার্লিন ছিল ভারতীয় বিপ্লবীদের কেন্দ্র।
 বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মৌলীনা বরকতুল্লা, চম্পকরাম পিলাই, রাজা মহেন্দ্র
 প্রতাপ, আচারিয়া প্রভৃতি বহু বিপ্লবী বার্লিনকে কেন্দ্র করে কাজ করতেন।
 ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে যে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন
 বিপ্লবীরা সেই আন্দোলনকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবার জন্য প্রাণপণ
 চেষ্টা করেছিলেন বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বার্লিনের ভারতীয় বিপ্লবীরা।
 নানা দিকে ছড়িয়ে তাঁরা কাজ করতেন, আবার সবাই এসে জুটতেন
 বার্লিনে। মহেন্দ্র প্রতাপ আফগানিস্থানে গিয়েছিলেন ভারতবর্ষের
 স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্তে আফগানিস্থানের সাহায্য পাবার আশায়।
 একটি সামরিক ভারতীয় গভর্নমেন্ট ঘোষণাও করেছিলেন তিনি কাবুল
 থেকে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ গিয়েছিলেন পার্শ্বিয়ায়, কেউ গিয়ে-
 ছিলেন আমেরিকায় গদর পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্তে।
 বীরেন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এই-সব প্রচেষ্টার প্রাণস্বরূপ। ভারতবর্ষের

বাইরে বিশেষ করে ইয়োরোপের যে-সব ভারতীয় বিপ্লবীরা কাজ করতেন, তিনিই ছিলেন তাঁদের নেতা। দেশে থাকার সময়েই তাঁর নাম অনেকবার শুনেছি অনেকের মুখ থেকে। মনে আছে রবীন্দ্রনাথও একবার বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের খুব তারিফ করেছিলেন। বার্লিনে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল চট্টোপাধ্যায়ের। বীরেন চট্টোপাধ্যায় যখন এদেশ থেকে চলে যান তখন হয় আমি জন্মাই নি, নয় অত্যন্ত শিশু। তাই তাঁকে এদেশে জানবার সুযোগ আমার হয় নি। তাঁর পরিবারের আর সকলকে কিন্তু আমি জানতুম শিশুকাল থেকে। বীরেনের বাবা ডাঃ অঘোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমার খুব মনে পড়ে। আমার পিতার সঙ্গে অঘোরনাথের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। মাথায় হায়দ্রাবাদী পাগড়ী। পরতেন কালো আচকান। বুকের উপর ছড়িয়ে থাকত একরাশ সাদা দাড়ি, কণ্ঠস্বর গুরুগম্ভীর কিন্তু স্নেহেতে ভরা। বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের মা, ভাইদের ও বোনদের সকলকে আমি জানতুম। এবারে তাঁর সঙ্গে আলাপের সুযোগ ঘটল।

একদিন দুপুরবেলা 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লীগের' অফিসে গেলুম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মুনসেনবার্গ এই লীগের কর্তা হলেও চট্টোপাধ্যায়ই সব কাজ চালাতেন। বার্লিনের ফ্রিডরিক স্ট্রাসেতে ছিল লীগের অফিস। দরজায় ঘণ্টা বাজাতে দরজা খুললেন এক বৃদ্ধ, রঙ তাঁর শ্যামলা, মাথায় শাদার অভিযান কালো চুলগুলোকে বিরল করে এনেছে। মুখখানিতে অস্বস্ততার ছাপ, চোখ দুটি বুদ্ধির আলোতে প্রদীপ্ত। এই বৃদ্ধই যে বীরেন চট্টোপাধ্যায় তা বুঝতে দেরি হল না। সেদিন দুপুরে অনেকক্ষণ দুজনে আলাপ করলুম। তারপর প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা হত। ঘনিষ্ঠদের মধ্যে সকলে তাঁকে চট্টো বলে ডাকত, আমিও তাঁকে ডাকতুম তাই বলে। চট্টো ছিলেন বহুভাষাবিদ ও অতি বুদ্ধিমান লোক। ছোটো মজলিস জমাতে তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার ছিল। যেমন সরস তেমনি ধারালে' ছিল তাঁর কথা, কিন্তু বড়ো আসরে এলেই চট্টো একেবারে মৌনীবাবা! কোনো সভায় কেউ তাঁকে কখনো মুখ খোলাতে পারে নি। অ্যাগ্‌নেস স্নেডলীর কাছে শুনেছিলুম একবার তিনি অনেক অহুন্নয় বিনয় করে

চট্টোকে রাজী করিয়েছিলেন বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে। বক্তৃতার দিন ঘরভর্তি লোক সকলে অপেক্ষা করে আছে বক্তার, চট্টোর দেখা নেই। ইয়োরোপ ভারতবর্ষ নয় সেখানে চারটের মিটিং পাঁচটায় শুরু হওয়া সম্ভব নয়। কোনো বক্তা কিম্বা নেতা ঐ অভদ্রতা করবার সাহসই রাখে না ইয়োরোপে। বক্তাকে শালীনতা শেখার উপায় ইয়োরোপের শ্রোতার ভালো করেই জানে। অ্যাগ্নেসই চট্টোর বক্তৃতার বন্দোবস্ত করেছিলেন। তাই তাঁর যা অবস্থা সেটা সহজেই অনুমেয়। শেষে অ্যাগ্নেস্ নিজে বক্তৃতা দিয়ে নিজের প্রাণ আর মান বাঁচান।

১৯৩৩ সালে জার্মানীতে হিটলারী শাসন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই চট্টো জার্মানী ছেড়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় চলে যায়। স্টালিন তখন নিজের ডিক্টেটারিকে নিরঙ্কুশ করবার জন্যে প্ল্যান অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর রুশীয় ও অগ্ন্যদেশীয় বিপ্লবী কমিউনিস্টদের হত্যা করে চলেছে।

এই রকমই একটি নরমেধ যজ্ঞে চট্টোকে বলি দিল স্টালিন। দেশে ফিরে আসবার জন্যে চট্টোর গভীর ব্যাকুলতা ছিল। তাঁর সে আশা আর মিটল না। আত্মপ্রতিষ্ঠালোলুপ নরঘাতক ডিক্টেটরের হাতেই তাঁকে মরতে হল।

বার্লিনে পৌঁছবার কয়েকদিন পরেই আলাপ হল অ্যাগ্নেস্ স্বেডলির সঙ্গে। দেশে থাকতে তাঁর লেখা দু-একটি প্রবন্ধ মাঝে মাঝে নজরে পড়েছে, তার বেশি তার সম্বন্ধে আর কিছু জানতুম না তখন। পরে অ্যাগ্নেসকে যখন বন্ধুরূপে পেলুম তখন বুঝতে পারলুম যে তিনি কী অসাধারণ ও মহৎ লোক। মজুরের মেয়ে অ্যাগ্নেস্, কি অসম্ভব দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন কেটেছে। মাতাল বাপ মাকে প্রায়ই মারত, নিজে মজুরী খেটে যে ছোটো ভাইকে তিনি মানুষ করেছিলেন সে ভাইটি রাস্তার ড্রেন সাফ করতে গিয়ে ড্রেনের মধ্যেই বেকায়দায় পড়ে মারা যায়। এত দুঃখও কিন্তু তাঁর জীবনকে তিতো করে দিতে পারে নি। দুঃখের আঘাতে সরে গিয়েছিলো ছোটো আমির পাথর বুকের ভিতর থেকে, শত শ্রোতে উৎসারিত হয়েছিল তাঁর প্রাণে মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসার

উৎস। হুঃখ তাঁর মুখখানিকে ভেঙেচুরে গড়ে নিয়েছিল নিজের মনমতো করে। চোখ দুটি ব্যথার আগুনে সদাই উজ্জ্বল। ক্লান্ত হাসি দরদে ভরপুর। এমন খাঁটি মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি আমার জীবনে। বার্লিনের সমস্ত ভারতীয়দের তার যেন অ্যাগ্নেসের, যারই অস্থখ হোক তার সেবা, টুকিটাকি সব কিছু করবার তার অ্যাগ্নেস্ সব সময়ই গ্রহণ করতেন। অথচ বহু পরিশ্রম করে তাঁকে নিজের জীবিকা উপার্জন করতে হত। আর তার শরীরও খুব স্বস্থ ছিল না। অ্যাগ্নেসের পেড়াপিড়িতে হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভায় ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্বন্ধে আমি বক্তৃতা দিই। সেই সভায় হাজির ছিলেন সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দলের শ্রমিক নেতা ফুর্টওয়াঙ্গলার। তার কয়েক মাস আগেই তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন ভারতবর্ষের মজুরদের সম্বন্ধে ও মজুর আন্দোলন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্য। জার্মানীর রাজনৈতিক অবস্থা ও জার্মানীর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধে এ সময়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না বললেই হয়। শত কাজের মধ্যে অ্যাগ্নেস্ প্রায় সন্ধ্যাবেলাই সময় দিতেন আমাকে। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আমি একটা মোটামুটি ধারণা করে নেই ইয়োরোপের আর জার্মানীর রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধে। এক-একদিন সন্ধ্যাবেলা চট্টোও এসে যোগ দিতেন আমাদের আলোচনায়। দেশ ছাড়বার কিছুকাল আগে ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সংঘের (Indian Journalist Association) সম্পাদক খ্যাতনামা শ্রমিক নেতা কিশোরীলাল ঘোষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কিশোরীবাবু প্রায়ই জোড়াসাঁকোয় আসতেন, স্বাধীনতা আন্দোলন ও বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্বন্ধে আমরা দুজনে আলাপ-আলোচনা করতুম। তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না। নিছক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলবার দিকেই ছিল তাঁর ঝোঁক, তবুও আমার মতো একরোখা কমিউনিস্টকে তিনি হাসিমুখে বরদাস্ত করতেন। দেশ ছাড়বার সময় কিশোরীবাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করি। ইয়োরোপ থেকে ভারতবর্ষে খবর পাঠাবার জন্য ইয়োরোপে একটি ‘নিউজ এজেন্সি’ গঠন করবার জন্য আমাকে চেষ্টা করতে বলেন কিশোরীবাবু। বার্লিনে পৌঁছেই কিশোরীবাবুর অনুরোধ আমার মনে পড়ে। রয়টার প্রভৃতি ডাকাতে প্রতিষ্ঠান যে-সব

খবর জোগাত ভারতবর্ষে সেইসব ঝুটো খবরে আমাদের মন মায় দিত না, তৃপ্ত হত না, তাই আমাদের নিজের একটি নিউজ এজেন্সি করবার কল্পনা কিশোরীবাবু করেছিলেন। মস্কো যাবার জন্তে তখন আমি রোজ দিন গুনছি। তাই এই কাগজের ভার আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না আর আমার যোগ্যতাও ছিল না। অ্যাগ্নেস্কে তাই এই কাজের ভার দিই আর কিশোরীবাবুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপন করে দিই মস্কো চলে যাওয়ার আগে। মস্কোতে থাকার সময় অ্যাগ্নেস্কে চিঠি নিয়মিত পেতুম। ১৯২৮ সালের প্রায় শেষাংশে, এমন সময় চীনে যাবার পথে অ্যাগ্নেস্ এলেন মস্কোতে। একদিনের কথা আমি ভুলব না কখনো। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে তখন ভারতবর্ষে প্রচণ্ড বিক্ষোভ চলেছে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। একদিন খবর এল লাহোরে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে মিছিলের উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে! সেই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন লাল লাজপৎ রায় তিনি লাঠির আঘাতে আহত হন ও তাতেই তার মৃত্যু ঘটে। কমিনটার্নের দপ্তরে খবরের কাগজে পড়ে অ্যাগ্নেস্কে যখন এই খবর দিলুম, মনে হল যেন অ্যাগ্নেস্ পাথর হয়ে গেছেন। মুখ থেকে যেন শেষ রক্ত-বিন্দু চুঁয়ে পড়ে গেছে, শুধু চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল অবিরাম ধারে। লাল লাজপৎ রায় যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন থেকে অ্যাগ্নেস্ লালাজীকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতেন। অ্যাগ্নেস্ কিছুদিন লালাজীর সেক্রেটারি হিসেবেও কাজ করেছিলেন। প্রায় মাসখানেক মস্কোতে থেকে অ্যাগ্নেস্ চলে গেলেন চীনে। ‘গণবাণীর’ জন্ত নিয়মিত লেখা পাঠাতে লাগলুম বার্লিন থেকে। মস্কো পৌঁছবার আগে নিজেকে কিছুটা তৈরি করে নেবার জন্ত উঠে পড়ে লেগে গেলুম। যত কমিউনিস্ট সাহিত্য জোগাড় করতে পারলুম সব উজাড় করে পড়ে চললুম। স্বপক্ষে একান্ত কাঁচা থাকায় লজ্জা থেকে ত্রাণ পাবার জন্তে নিজেকে তখন এতটুকুও রেহাই দিই নি খাটুনি থেকে। অস্পষ্ট ধারণার ধূস্রলোকে এতদিন বিরচন করছিলুম, এবারে মনে হতে লাগল যে বৈজ্ঞানিক ধারণার মাটির ছোঁওয়া পাচ্ছে মন মাঝে মাঝে। একদিন বিকেলে কমিউনিস্ট মিছিল বের হল বার্লিনে। এই প্রথম কমিউনিস্ট মিছিল দেখলুম আর এত বিরাট

মিছিলও এর আগে কখনো দেখি নি। লক্ষ লক্ষ লোক চলেছে, মেয়ে-পুরুষ সবাই চলেছে বিপ্লবের গান গাইতে গাইতে। রোজা লুকসেমবুর্গ, কার্ল লিবক্নেখট আর লেনিনের বিরাট প্রতিকৃতি বহন করে চলেছে শোভাযাত্রীরা। সেদিনই প্রথম শুনি বিপ্লবের সেই বিখ্যাত জার্মান গান। পরে যা অনুবাদ করেছিলুম— ‘ও ভাই যাত্রী আলোকের পানে মুক্তির পানে চল’। হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে ‘লালফ্রন্ট’। লক্ষ লোক চলেছে কিন্তু কী আশ্চর্য শৃঙ্খলা, কী সচেতন নিষ্ঠা আদর্শের প্রতি। পরে এর চেয়েও বৃহৎ মিছিল অনেকবার দেখেছি মস্কোতে। কিন্তু এই প্রথম দেখার বিস্ময় ও আনন্দ মনকে যেমন সাড়া দিয়েছিল এমন আর কখনো দেয় নি। এত দীর্ঘকাল পরেও সেই বিকেলবেলাটি অগ্নান হয়ে আছে স্মৃতির মঞ্জুষায়। দেশে ফিরে আসার পর অনেক মিছিলে যোগদান করেছি, তখন বার বার মনে পড়েছে ইয়োরোপে যে-সব মিছিল দেখেছি সেই-সব মিছিলের কথা, আর বড়ো লজ্জা পেয়েছি। আমাদের দেশে মিছিলে কেউ চলে একে বঁকে, কেউ চলতে চলতে দল ভেঙে বাইরে চলে যায়, কেউ পান চিবোয়, কেউ চৌচৌর কোণে সিগারেট কামড়ে চলে, কেউ হাসে, কেউ চলে পাশের লোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে। মনে হয় যেন চৈত্র সংক্রান্তির সন্ডের মিছিল চলেছে। না আছে এদের মুখে দৃঢ়তার চিহ্ন, না ফোটে এদের মুখে আদর্শের প্রতি অহুরাগ ও নিষ্ঠার আলো। এ মিছিল কি পথের দু’পাশের পথিকদের মনে আগুনের ছোঁওয়া দিতে পারে কখনো! মনেই হয় না যে যারা নয়া দুনিয়া আনবার জন্তে পথে বের হয়েছে তারা চলেছে

একদিন চট্টো এসে খবর দিলেন যে আমার মস্কো যাবার সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। ভিসাও তৈরি, দু-তিন দিন পরেই আমাকে জাহাজ ধরতে হবে স্টেটিন থেকে। আমার পাসপোর্টে যাতে সোভিয়েট-রাশিয়ায় যাওয়ার কোনো প্রমাণ না থাকে তার জন্ত বার্লিনের সোভিয়েট এম্বাসি একটা সম্পূর্ণ আলাদা কাগজে আমাকে ভিসা দিয়ে দিয়েছিল। একদিন বিকেলে লেনিনগ্রাড-যাত্রী জাহাজ ছাড়ল স্টেটিন থেকে। ছোট জাহাজটি যেন পুতুলখেলার জাহাজ, ফাস্ট ক্লাসে মাত্র তিন-চারটি ক্যাবিন, যাত্রীদের মধ্যে এক বৃদ্ধা জার্মান মহিলা, লেনিনগ্রাডের জার্মান কান্সালের মা, ছেলের কাছে বেড়াতে চলেছেন, আর আমি। জাহাজটি যেন পুতুলখেলার



বালিনে—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে



লেখক ও রবীন্দ্রনাথ—মস্কো

জাহাজ, চেহারাটিও তার তেমনি নিরীহ ভালো মানুষটির মতো। বল্‌টিক্‌ সমুদ্র ঠিক তার উল্টো, যেমন দুর্দান্ত তেমনি পাগলা। এক মুহূর্তের জন্তোও চূপ করে থাকতে জানে না। দিনরাত দোলানির অস্ত নেই। ‘লিথুয়েনিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্‌থেনিয়ার ধার দিয়ে ফিনল্যান্ডের গা ঘেঁষে চলল জাহাজ, তৃতীয়দিন বিকেলবেলা পৌঁছলুম গিয়ে লেনিনগ্রাডে। বৃদ্ধা জার্মান মহিলা জেটিতে নেমেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন; আমি কোথায় যাব, আমার জন্ম কেউ এসেছে কিনা! বোকার মতো বলে ফেললুম—কমিনটার্নে যাব। কমিনটার্নের কেউ নিশ্চয় আসবে আমাকে নিতে। বৃদ্ধার মুখের ভাব বদল হয়ে গেল এক নিমিষে। জাহাজে প্রথম দিন থেকেই তিনি আমাকে দখল করে নিয়েছিলেন। বসে বসে সেলাই করতেন আর আমার উপর হুকুম করতেন ভারতবর্ষের গল্প শোনবার জন্তো। আমি কমিউনিস্ট এইটি বোঝবার সঙ্গে সে-সুব বদল হয়ে গেল। আর একটি কথা না বলে বৃদ্ধা চলে গেলেন। একটি লোক এগিয়ে এল আমার দিকে, আমার নাম জিজ্ঞেস করলে, নাম শুনে তার সঙ্গে যেতে বললে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল, বলে গেল সন্ধ্যাবেলা সে মস্কো যাবার ট্রেনে তুলে দিতে আসবে।

হোটেলের ঘরে একা বসে বসে ভাবছিলুম—কাটলুম তো আমার সমস্ত দড়াদড়ি অতীতের তীরের সঙ্গে, বিপ্লবের এই কামারশালায় নিজেকে তো নিয়ে এসে ফেললুম নিজেকে ভেঙেচুরে পুড়িয়ে তৈরি করে নেবার জন্তো। এখন যদি সেই কামারশালায় এমন কিছু নজরে পড়ে যা গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখন কি হবে? কমিউনিজমের আদর্শকে আমি মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছি, তাই বলে কামারশালাকে দেবতা বানিয়ে যন্ত্রকে আদর্শের জায়গায় বসিয়ে পূজা করে নিজেকে ঠকাতে আমি কিছুতেই রাজী নই। কালেক্‌টিভের দোহাই দিয়ে আমি কখনো কল বনে যেতে পারব না। ভক্তিরসে মজে চট করে কিছু বলে যাওয়া—সে সহজিয়া সাধনার পথ আমার পথ নয়, যে ধাপ্পাতে আমার মন তৈরি সে নোওয়ায় বটে কিন্তু সেটা বিচারের কাছে নতি স্বীকার, অন্ধ ভক্তির বোমার হুমকিতে নোওয়ায় না সে কিছুতেই। ভয় হতে লাগল যদি এখানেও বিপ্লবের দোহাই দিয়ে নির্বিচার গ্রহণের অপদেবতা পূজা দাবি করে, যদি এখানেও বিচারকে নির্বাসনে পাঠায় ক্ষমতা-মাতাল নতুন

গোঁড়ামি? তখন কি হবে? এমনি সব অনিশ্চিত আশঙ্কা তোলপাড় করেছিল সেদিন বুকের মধ্যে। মস্কো রওনা দিলুম-রাতের গাড়িতে। মনে হচ্ছিল ট্রেনটা যেন একটা কালো ক্রুদ্ধ দানব, দুই হাতে চেপে ধরে ঠেলে নিয়ে চলেছে আমাকে। মস্কো তো তীর নয়, মস্কো হচ্ছে বিপ্লবের ফুটস্তু চেউ। সেই চেউয়ের মধ্যে ফেলে দেবার জগ্গেই কি নিয়ে চলেছে আমাকে? জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখছিলুম, মনে হচ্ছিলো আকাশ, পৃথিবী সব যেন ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, শুধু আমিই যেন চলেছি বিশ্ব-জোড়া ঝড়ের ধাক্কায় চেউয়ের দিকে এগিয়ে।

জুন মাসের সে এক রোদ্দ-বলমল সকালবেলা। ট্রেন পৌঁছল গিয়ে এক বিরাট স্টেশনে। ক্যুপের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ট্রেনের কনডাক্টর বললে—মস্কোভা। বুঝলুম মস্কোয় এসে পৌঁছেছি। একটি লোকও পরিচিত নয়, ভাষাও জানি নে। মনে ছিল ঠিকানা—হোটেল লুক্স, রাস্তার নাম তেভেরস্কায়া। স্টেশনের বাইরে এসে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে চললুম হোটেল লুক্স। বড়ো চওড়া রাস্তা পার হয়ে ঢুকল গাড়ি এক মাঝারি গোছের রাস্তায়। দুধারে দোকান, বড়ো বড়ো কাঁচ-দেওয়া জানালা দিয়ে দোকানের ভিতরটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দোকানের ভিতরে, রাস্তায় অগুনতি লোকের ভীড়। রাস্তায় বাড়িগুলো মাথায় সমান নয়—প্রকাণ্ড উঁচু একটা বাড়ির পরে মাথায় খাটো দোতলা একটা বাড়ি, তারপরেই একটা আকাশ-ছোয়া বাড়ি। ইয়োরোপের রাস্তার মতো একরঙা বৈচিত্র্য-হীন রাস্তা নয়। সেখানে একটি রাস্তার সব বাড়িগুলো যেন একই ছাঁচে ঢালা। এ যেন আমাদের চিৎপুর রাস্তা। প্রকাণ্ড বাড়ির পাশে ছোটো বাড়ি তার নিজস্ব বিশেষ অস্তিত্ব নিয়ে নিঃসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে আছে। ফুটপাথের ধারে সূর্যমুখী ফুলের বীচি বেচছে ফেরিওয়ালারা। গাড়ি গিয়ে থামল একটি প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে। গাড়োয়ান হেঁকে বলল—হোটেল লুক্স। জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে গাড়ি বিদায় করে ঢুকলুম হোটেলের ভিতরে। সৈনিকের-বেশধারী একটি লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে কাকে চাই। জানালুম চাই কমরেড লোহানীকে। আমাকে অপেক্ষা করতে বলে টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বললেন। কিছুক্ষণ বাদে নেমে এলেন এক ভদ্রমহিলা। সৈনিক-বেশধারী লোকটি আমাকে দেখিয়ে দিল। ভদ্র-

মহিলা এগিয়ে এলেন আমার কাছে— নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন— আমি মাদাম লোহানী। বললুম— লোহানীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি রুশীয় ভাষায় যা উত্তর দিলেন তার বেশির ভাগই আমার বোধগম্য হল না। তাকিয়ে রইলুম তাঁর দিকে। তখন জার্মান ভাষায় বললেন— কমরেড লোহানী এখন এখানে নেই, তিনি কমিন্টার্নের দপ্তরে গেছেন। চলুন, আমি আপনাকে নিয়ে যাই সেখানে। ঘোড়ার গাড়ি করে চললুম সেখানে দুজনে।

রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে মিশল একটি বড়ো রাস্তার সঙ্গে। গাড়ি ঘুরলো ডান দিকে, পাথরে বাঁধানো রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলল লাফিয়ে লাফিয়ে। পাটকিলে রঙের বিরাট উচু পাঁচিল নেমে গেছে নদীর ধারের রাস্তা পর্যন্ত। পার্কের ধারেই প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি— কমিন্টার্নের দপ্তর। ছোট্ট দরজা দিয়ে ঢুকলুম বাড়ির মধ্যে। ভিতরে ঢুকতেই প্রবেশ পথের বাঁ দিকের দেয়ালের ছোট্ট জানলা থেকে একজন জিজ্ঞেস করলে আমরা কাকে চাই। মাদাম লোহানী উত্তর দিলেন। অফিসর টেলিফোন জুড়লেন, মাদাম কথা বললেন। দুটি ছাড়পত্র তৈরি হল আমাদের জন্তে। প্রবেশ পথের শেষ প্রান্তে আর একটি দরজার কাছে একজন গ্রহরী বসেছিল। তাকে ছাড়পত্র দেখিয়ে ঢুকলুম আমরা বাড়ির ভিতরে। সিঁড়ি দিয়ে তেতালায় উঠে গেলুম। একটি ঘরের দরজায় মূহূ করাঘাত করে মাদাম লোহানী আমাকে নিয়ে ঢুকলেন সেই ঘরে। ঘরের একপ্রান্তে জানলার ধারে টেবিলের সামনে বসেছিলেন একটি ছোট্ট-খাট্ট লোক। মাদাম লোহানী তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। লোহানীর কথা আমি অনেক শুনেছিলুম বীরেন চট্টোপাধ্যায় আর অ্যাগ্‌নেস স্মেড্‌লীর কাছে থেকে বার্লিনে।

সিরাজগঞ্জের একটি মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান পরিবারের ছেলে লোহানী। লগুনে যান ব্যারিস্টারী পড়বার জন্তে। সেখানে তাঁর আলাপ হয় বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কোথায় রইল লোহানীর ব্যারিস্টারী পড়া, ভোজ খাওয়া আর নেচে বেড়ানো! এমনি ছিল চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বের জাহ্ন। লোহানী লগুন ছেড়ে প্যারীতে চলে আসেন, সেখান থেকে বার্লিনে এসে বীরেনের সঙ্গে যোগ দেন। বার্লিনকে কেন্দ্র করে

ভারতবর্ষীয় বিপ্লবীরা তখন যে বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানে शामिल হন লোহানী।

লোহানীর বুদ্ধি ছিল তরোয়ালের মতো ধারালো। ফরাসী, জার্মান ও রুশীয় ভাষায় তাঁর দখল ছিল, পড়াশুনো ছিল যথেষ্ট, রসিকও ছিলেন তিনি। এত গুণ সব ব্যর্থ হয়ে গেল, তাঁর ব্যক্তিত্ব নিস্পত্ত থেকে গেল তাঁর চরিত্রের একটি মাত্র দোষে। প্রত্যেক বিপ্লবীর যেটা একান্ত থাকা দরকার, চরিত্রের সেই নির্লোভ অনমনীয়তা সেটি আদবেই ছিল না লোহানীর। বুদ্ধির দ্বারা বিচারের দ্বারা যে মতবাদকে গ্রহণ করেছে বিপ্লবী সাময়িক ও ব্যক্তিগত সুবিধের জন্তে তাকে কখনো ত্যাগ করবে না, ছোটো করবে না, চরিত্রের এই অটল ভূমিতেই বিপ্লবী আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। তবেই সে পথ চলতে পারে আদর্শভ্রষ্ট না হয়ে। অতলস্পর্শী সুবিধাবাদের অবতার ছিলেন লোহানী। ভূপেন দত্ত, অ্যাগ্নেন্স স্বেডলী আর লোহানীকে নিয়ে বীরেন চট্টোপাধ্যায় মস্কো যান ভারতীয় বিপ্লবীদের তরফ থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যোগ স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে। ভারতবর্ষের বিপ্লব-আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁদের মতামত লিপিবদ্ধ করে চট্টোপাধ্যায় লেনিনের কাছে পাঠিয়ে দেন। সেই খসড়ার প্রাপ্তি স্বীকার করে লেনিন চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লেখেন ও একটি নির্দিষ্ট দিনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। চট্টোপাধ্যায়কে লেখা লেনিনের সেই চিঠি আমি দেখেছি। বার্লিনে থাকাকালীন চট্টোপাধ্যায় আমাকে দেখিয়েছিলেন সেই চিঠি।

লেনিনের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায়ের দেখা কিন্তু ঘটলো না। বৈপ্লবিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক গতিতে কূটনীতির কারসাজি ও চক্রান্তের নমুনা এই প্রথম নয়। মানব রায় এর কিছুদিন আগে মেক্সিকো থেকে মস্কো এসে পৌঁছেন। বরোদিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় মেক্সিকোতে। বরোদিনই তাঁকে মস্কো নিয়ে আসেন। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল তার বছরখানেক আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরাধীন ভারতের একজনও প্রতিনিধি নেই কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে এটা কেমন সোয়াস্তি দিচ্ছিল না বলশোভিক নেতাদের। মানবেন্দ্রনাথ রায়কে মেক্সিকো থেকে মস্কোতে আমদানী করেন বরোদিন এই অভাব মিটানোর মতলবে। মস্কোতে চট্টোপাধ্যায়ের আগমন বরোদিন একেবারেই ভালো চোখে দেখেন নি। চট্টোপাধ্যায়কে যদি

লেনিন স্বীকার করে নেন ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতিনিধি হিসেবে, ভারতের বিপ্লবের ধারা সম্বন্ধে চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত 'থিসিস' যদি লেনিন গ্রাহ্য করেন, তা হলে এক ভারতীয় বিপ্লবীকে মেক্সিকো থেকে নিয়ে এসে হাজির করবার জন্তে বরোদিন যে তারিক পাচ্ছিলেন সে তো আর থাকে না। তাই কী করে লেনিনের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ বানচাল করে দেওয়া যায় আর চট্টোপাধ্যায়কে ঠেলে ফেলে দিয়ে তাঁর নিজের হাতের লোক মানব রায়কে কেমন করে এগিয়ে দেওয়া যায় এরই জন্তে উঠে পড়ে লেগে গেলেন বরোদিন। লেনিনের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায়ের দেখাসাক্ষাৎ সব ঠিক হয়েও যে বন্ধ হল সেটা বরোদিনের কারসাজিতেই। মাসখানেক মস্কোতে অপেক্ষা করে লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে অসমর্থ হয়ে চট্টোপাধ্যায় তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে বার্লিনে ফিরে আসেন।

আগেই বলেছি যে লোহানী মস্কো গিয়েছিলেন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। লোহানী যখন দেখলেন যে মানব রায় বরোদিনের সাহায্যে হারিয়ে দিয়েছেন চট্টোপাধ্যায়কে, মানব রায়কেই বুলশেভিক নেতারা তৃতীয় ইন্টার-ন্যাশনালের ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন, অমনি লোহানী চট্টোপাধ্যায়কে ত্যাগ করে ভিড়ে গেলেন মানব রায়ের দলে। নিজের সুবিধে বাদ দিয়ে আর কি আছে সুবিধাবাদীর উপাস্ত! আমার সঙ্গে যখন লোহানীর দেখা তখন তিনি মানব রায়ের অমুচর হিসেবে কমিন্টার্নে কাজ করছেন।

লোহানীর কাছ থেকে শুনলুম যে মানব রায় শীঘ্রি চীন থেকে মস্কোতে এসে পৌঁছবেন। তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা হবে। আপাততঃ আমাকে দুটো রিপোর্ট দাখিল করতে হবে কমিন্টার্নে—একটি ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন সংক্রান্ত রিপোর্ট আর অন্যটি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট। আমাকে সেই রিপোর্ট দুটি তৈরি করতে বললেন লোহানী। অল্প আলাপের পর লোহানী বললেন—চলুন, আপনাকে পেত্রভ্‌স্কির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। পেত্রভ্‌স্কি যে কে তা আমার জানা ছিল না তখন। পরে জানলুম যে তিনি হচ্ছেন কমিন্টার্নের বৃটিশ বিভাগের সেক্রেটারি। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির সব ভার তখন ছিল বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির উপর।

পেত্রভঙ্কিকে তাই এক কথায় নাবালক ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অছিরা অছি বলা যেতে পারে। ভারত-ইংলণ্ডের কমিউনিস্ট বিপ্লবের একছত্র নায়ক এ হেন পেত্রভঙ্কির কাছে আমাকে হাজির করলেন লোহানী। পার্টির দাখিলাপত্র যেটি আমি মাথার টুপির মধ্যে সেলাই করে নিয়ে এসেছিলাম সেটা দিলাম পেত্রভঙ্কির হাতে। পেত্রভঙ্কি হেসে বললেন— আপনি ভারতবর্ষে থেকে নিরাপদে এটা নিয়ে আসতে পেরেছেন এতদূর? দু-চারটি কথার পর লোহানীকে বলে দিলেন হোটেল নিয়ে গিয়ে আমার থাকার সব বন্দোবস্ত করে দিতে। লোহানীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এলুম ফের তেভেরস্কায়ায়। হোটেল লুক্স পার হয়ে আরো কিছুটা এগিয়ে পুস্কিন বুলভারের কাছাকাছি এসে দুজনে উঠলুম গিয়ে ব্রিস্টল হোটেল। দোতলায় একটি ছোট ঘরে আমার স্থান হল। লোহানী চলে গেলেন। আমার ঘরের জানালাটি ছিল উঠানের দিকে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম জনমানুষশূন্য উঠান। উঠান যেন নিরালায় আপনমনে রোদ পোহাচ্ছে। উঠানের এক কোণ দিয়ে দেখা যাচ্ছিল কাছের ও দূরের বাড়ির উচু-নীচু মাথাগুলো ঝলমল করছে সোনালী রোদে। বিকেলবেলা লোহানী এলেন একজন রুশীয় ভদ্রলোককে সঙ্গে করে। শুনলুম তিনি স্টালিনের সেক্রেটারিদের মধ্যে একজন, নাম তার টিভেল। ছিপছিপে লোকটি, পাতলা মুখে বেমানান নাকটি তার ইহুদীত্বের নিঃসংশয় প্রমাণ দিচ্ছিল। টিভেলের কথাবার্তা তাঁর চেহারার মতোই ধারালো কিন্তু তবুও তার চেহারায় কী যেন একটা ছিল যাতে মন সায় দিচ্ছিল না। আমার মন বলছিল এ লোকটিকে বিশ্বাস করা যায় না।

পরে যখন টিভেলের পুরো পরিচয় পেলুম তখন বুঝলুম যে বাঙালী লোহানীর রুশীয় সংস্করণ হচ্ছেন টিভেল। জিনভিয়েভ্ যখন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কর্তা তখন টিভেল ছিলেন তাঁর সেক্রেটারি। লেনিনের মৃত্যুর পরে পাছে ট্রুটস্কি বলশেভিক দলের আর সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধার হন এই ভয়ে সূচতুর স্টালিন জিনভিয়েভ্ আর কামেনেভ্কে নিয়ে দল পাকায় ট্রুটস্কির বিরুদ্ধে। একলা স্টালিনের সাধ্য ছিল না ট্রুটস্কিকে সরিয়ে দেবার। লেনিনের অন্তরঙ্গ সহকর্মী হিসেবে জিনভিয়েভ্ আর কামেনেভের যে খ্যাতি ছিল, স্টালিনের সে খ্যাতি থাকবার কোনোই কারণ ছিল না

কেননা স্টালিন কোনোদিনও লেনিনের অন্তরঙ্গ সহকর্মী ছিল না। জিনভিয়েভ্ আর কামেনেভের সাহায্যে ট্রট্‌স্কিকে সরিয়ে দেবার পর স্টালিন যখন নিঃসংশয় হলো যে ট্রট্‌স্কির দিক থেকে তার কোনো ভয়ের কারণ আর নেই তখন স্টালিন মিথ্যে প্রচারের দ্বারা জিনভিয়েভ্ আর কামেনেভকে হেয় প্রতিপন্ন করে বলশেভিক দল থেকে তাড়াবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। জিনভিয়েভ্ তখন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডিয়ুমের চেয়ারম্যান। পৃথিবীর নানান দেশের কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে জিনভিয়েভের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্টালিনের আদবেই পছন্দসই ছিল না। স্টালিনের অপকর্মের বিরুদ্ধে পাছে জিনভিয়েভ্ কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের স্বযোগ নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক বিপক্ষতার সৃষ্টি করে এই আশঙ্কায় স্টালিনের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। যেমন করে হোক জিনভিয়েভ্কে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল থেকে সরাবার জন্যে স্টালিন শুরু করল চক্রান্ত। টিভেল যে শুধু জিনভিয়েভের সেক্রেটারি ছিল তা নয়, জিনভিয়েভের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। তবে বন্ধুত্বের জন্যে নিজের ভবিষ্যৎ মাটি করবে এমন ভাবুকতার প্রশয় আর যেই দিক টিভেল কিছুতেই দিতে রাজী ছিল না। চতুর টিভেল যখন বুঝল যে ক্ষমতালোলুপ স্টালিনের কারসাজিতে জিনভিয়েভের ভাগ্যতরী মাঝদরিয়ায় ডুবল ব'লে— তখন তাড়াতাড়ি সে শুরু করে দিলে জিনভিয়েভের ঘোর বিপক্ষতা করতে। সহকর্মী হস্তারক হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে যার জুড়ি নেই সেই চরম বিশ্বাসঘাতক এই ক্ষুদ্রে বিশ্বাসঘাতককে বকশিস দিল হাতে হাতে। তার সেক্রেটারি-গোষ্ঠীর মধ্যে টিভেলকে ভর্তি করে নিল স্টালিন। ইতিহাস কিন্তু কখনো ভোলে না তাকে যার কাছে সে ঋণী। দু'চার বছর বাদেই টিভেলের কাছে তার ঋণ শোধ করল ইতিহাস। স্টালিনের আদেশেই মরল টিভেল ঘাতকের গুলিতে। জিনভিয়েভের পরে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডিয়ুমের চেয়ারম্যান হন বুখারিন। কমিন্টার্নের সেক্রেটারি ছিলেন প্রথম যুগের বলশেভিক, বৃদ্ধ পিয়াংনিস্কি। টিভেল জানিয়ে গেলেন যে তার পরদিন সকালে আমাকে হাজির হতে হবে পিয়াংনিস্কির দপ্তরে। তিনি আমাকে তলব করেছেন।

পরদিন সকালে গেলুম কমিন্টার্নের দপ্তরে। টিভেল নিয়ে গেলেন

আমাকে পিয়াংনিস্কির ঘরে, আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। আমি ভারতবর্ষ ছেড়ে ইউরোপে যাবার অল্পদিন পরে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে একটি পুস্তিকা বের হয়। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির সভ্যদের নামের তালিকা ছিল সেই পুস্তিকায়। ১৯২৭ সালের সেন্ট্রাল কমিটির সভ্যদের মধ্যে ছিলুম আমি, ডাঙ্গ, শৌকত ওসমানী, মুজফ্ফর আহমেদ, ঘাটে ও আরো দু-একজন। দেখলুম সেই পুস্তিকাটি রাখা হয়েছে পিয়াংনিস্কির টেবিলে। ভারতবর্ষে আমাদের কাজের সব খবর জানতে চাইলেন পিয়াংনিস্কি। কতটুকু আমরা করতে পেরেছি, কী অসম্ভব বাধার উজান ঠেলে আমাদের এগোতে হচ্ছে, কমিউনিস্ট সাহিত্য ইত্যাদি কোনোরকম সাহায্যই যে আমরা পাচ্ছি—সব জানালুম তাঁকে। পিয়াংনিস্কি বললেন— কেন, আমরা তো যথেষ্ট টাকা দিয়েছি ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট সাহিত্য পাঠাবার জন্যে। টাকা তাঁরা যাকেই দিয়ে থাকুন বই কিম্বা আর কোনো রকম সাহায্যই যে আমরা পাই নি সেটা জানিয়ে দিলুম তাঁকে। ভারতবর্ষে কমিউনিস্টদের সংখ্যা কত তার একটা মোটামুটি খবর পিয়াংনিস্কি চাইলেন। টেবিলের উপর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির যে পুস্তিকাটি পড়ে ছিল সেটার দিকে দেখিয়ে বললুম তাঁকে যে ভারতবর্ষে যে কয়জন কমিউনিস্ট আছে তাদের তালিকা ঐ পুস্তিকাতেই আছে, তিনি নিশ্চয়ই তা দেখে থাকবেন। পিয়াংনিস্কি একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপরে বললেন— ভারতবর্ষে মাত্র আটটি-দশটি কমিউনিস্ট? বললুম অবস্থাটা ঠিক তাই। কমিউনিজমের দিকে মানুষকে টানবার শক্তি আমাদেরই বা আছে কোথায়? আমরা তো কিছুই জানি নে। অনেক হাতড়ে কমিউনিজমের যে ক্ষুদ্রকুঁড়োটুকু সংগ্রহ করেছি তা নিজেদের পক্ষেই যথেষ্ট নয় অত্বেদের মধ্যে বণ্টন করব কোন্ সাহসে? পিয়াংনিস্কি বললেন— রায় তো আমাকে বলেছিলেন যে কয়েক হাজার কমিউনিস্ট তৈরী হয়েছে ভারতবর্ষে? বললুম— মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর কয়েক হাজার কমিউনিস্টদের কোথায় কোন্ পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে রেখেছেন তিনিই বলতে পারেন, আমরা তাদের কোনো খবর জানি না। বাঙলার টেরারিস্ট দলগুলির সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক তা জানতে চাইলেন

পিয়াংনিস্কি। বাঙলার টেরারিস্ট দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের যে চেষ্টা আমি করেছিলুম তার খবর জানিয়ে দিলুম তাঁকে।

পিয়াংনিস্কির কাছ থেকে চলে আসবার পথে দেখা হল পেত্রভ্‌স্কির সঙ্গে। তিনি বললেন যে আর দুদিন নাগে আমাকে অর্গানাইজেশনাল রিপোর্ট দাখিল করতে হবে কমিটির সামনে। মনের তখন যা অবস্থা তার বর্ণনা রাজা রামমোহন রায় করে গেছেন তাঁর গানে— ‘মনে করো শেষের সে দিন কি ভয়ঙ্কর’! কখনো রিপোর্ট তৈরি করি নি, কী লিখবো, কেমন করেই বা রিপোর্ট তৈরি করব এইসব চিন্তা পাহাড়ের খসেপড়া পাথরের মতো ছুমদাম করে পড়তে লাগল বুকের মধ্যে। যার তার সামনে দাখিল করবার কথা হলেও না-হয় সহ্য করা যেত, এ যে দাখিল করতে হবে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কমিটির সামনে! ভয়ে দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে হাজির হলুম গিয়ে লোহানীর কাছে। জানালুম তাঁকে আমার অসহায় অবস্থার কথা। লোহানীর মন যে লোহা হয়ে গেছে বলশেভিকদের প্রসাদগুণে তা বুঝতে পারলুম। তিনি যে এ-বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না, আমাকে যে নির্ভর করতে হবে একান্তভাবে নিজের উপরে সেটুকু তিনি সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন আমাকে। বুঝলুম এখানে আমি একেবারে একলা, যা-কিছু আমাকে করতে হবে তা মানবেন্দ্রনাথ রায় আর তার অনুচর লোহানী, এই দুজনের বিরুদ্ধতাকে প্রতি পদে লড়াই করে করতে হবে। হোটেলে ফিরে এসে বসে গেলুম রিপোর্ট লিখতে। কোথা থেকে যে শুরু করব তাই স্থির করতে ঘণ্টা কেটে গেল, কাগজের উপর কলমটি পড়ে রইল নাক গুঁজে নিশ্চল হয়ে। একবার মরিয়া হয়ে শুরু করে দিলুম। অর্গানাইজেশনাল রিপোর্টে লিখবার ছিলই বা কী এত বেশি! তবে তো ভারতবর্ষের দু-একটি প্রদেশে শ্রমিক-কৃষক দল প্রতিষ্ঠা করে আমরা কাজ শুরু করেছি। পরদিন সকালে রিপোর্টটি টাইপ করিয়ে নিলুম কমিন্টার্নের দপ্তরে। লোহানীর সঙ্গে দেখা করলুম। একটি কথাও তুললুম না কিন্তু রিপোর্ট সম্বন্ধে।

কমিন্টার্নের কাজ সেয়েই চলে আসতুম আমার হোটেলের ঘরে। অসহায়তার লজ্জা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কচ্ছপের মতো নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একলা থাকা ছাড়া উপায় ছিল না আমার

সেদিন। তা ছাড়া ভিতরটা তখনো নরম ছিল, তখনো বিরুদ্ধতার প্রচণ্ড দহনে পুড়ে মনটা পোড়ামাটির মতো কঠিন হয়ে ওঠে নি। বিরুদ্ধতা তখন বড়ো ব্যথা দিত আর সেই ব্যথা থেকে বাঁচবার জগ্রে নিজেকে নিয়ে সরে পড়তুম সেই এলাকায় যেটা একান্ত নিজের। এখন নিজেকে আর সরিয়ে নিইনে আঘাতের এলাকা থেকে; উপরে কঠিনতার বর্ম পরে আঘাতকে বরণ করি আঘাত হেনে। অনেকদিন হোলো বুকের ভিতরটা প্রচণ্ড দহনে পুড়ে চৌচির হয়ে গেছে, অবিশ্রান্ত আঘাতে কঠিন হয়েছে মন, কালো হয়েছে কষ্টিপাথরের মতো। তবু বারবার দেখেছি সেই কঠিন মনকে ব্যথা পেতে, নজরে পড়েছে তার অভিমান। তখন নিজের জীবনের আয়নায় নিজের মনের যে চেহারাটি দেখেছি সেটি মর্যাস্তিক। বুঝেছি তখন যে অন্তরের বেদনা ও অভিমান নিজেদের গোপন করে চলে কঠোরের ছদ্মবেশে। পরদিন সকালে কমিন্টার্নে গিয়ে হাজির হলুম। ন'টার সময় কমিটির অধিবেশন শুরু হবার কথা ছিল, শুরু হল প্রায় এগারোটার সময়। রুশীয়দের সঙ্গে এই বিষয়ে আমাদের আশ্চর্য মিল। আমাদেরই মতো সময়মত ওরা কখনো কিছু করে না। আমাদেরই মতো ওদের চালচলন কাজ করবার ধরণ টিলেঢালা আর মশুর। এই টিমে তেতালা ধরণ যেন এই কথাই বলতে চায়—পড়ে আছে অসীম অনন্ত কাল আমাদের সামনে, তাড়া করে লাভ কি? রুশীয়দের কোনো কিছু করতে বললেই উত্তরে তারা বলে—সিচাস্—আর এই রুশীয় কথাটার মানে হচ্ছে—এখনি। এই এখনি কিন্তু কখন ঘটবে তা বলা যায় না। দু'ঘণ্টা বাদে ঘটলেও রুশীয়েরা তাতে আদবেই আশ্চর্য হবে না। ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কাজ করে থণ্ডকালের কাছে নতি স্বীকার করতে তারা যেন রাজী নয়। কেমন করে যে এরা অন্তত একবার একেবারে ঠিক সময়ে কাজে নেমে পড়ে বিপ্লব করেছিল, তখন 'সিচাস্' বলে যে ঝিমুতে শুরু করেনি সেটা সত্যিই আশ্চর্য! তবে এটাও ঠিক যে সেই বিপ্লবের যিনি কর্ণধার ছিলেন তিনি এই 'সিচাসের' মন্দাক্রান্তা লীলার কাছে কখনো আত্মসমর্পণ করেন নি। সময়ের মূল্য তিনি জানতেন; অনন্তের আরকে ভিজিয়ে মনের ও কর্মের গতি তিনি কখনো মন্দা করে দেন নি।

কমিটির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন পেত্রভ্‌স্কি। ব্রিটিশ, মার্কিন, রুশীয় ও জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন সেই অধিবেশনে। আমার রিপোর্ট নিয়ে ঘণ্টাখানেক আলোচনার পর শেষ হোল অধিবেশন। বিপদ তো কাটলোই না বিপদ আরো বেড়ে গেল। অধিবেশনের পরেই পেত্রভ্‌স্কি জানিয়ে দিলেন যে রাজনৈতিক রিপোর্ট শীঘ্রি দাখিল করতে হবে, ওটা যেন শীঘ্রি তৈরি করে ফেলি। মনে হল যেন হিমালয়ের চূড়া ভেঙে পড়েছে মাথায়। দলের সংগঠন-সংক্রান্ত রিপোর্ট না হয় কোনোরকমে তৈরি করেছি, সে রিপোর্ট তৈরির কাজে রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল না বললেই চলে। এবারে যে রিপোর্ট লিখতে হবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার উপর! আমার সে রাজনৈতিক জ্ঞান কোথায়? ভাসাভাসা ধারণা দিয়ে যা-কিছু বুনব সেই বুনুর মধ্যে যে অজ্ঞানতার শত ছিদ্র সহজেই ধরা পড়বে। কমিউনিস্ট মতবাদে সত্যিকারের ওয়াকিবহাল হবার কোনো স্বযোগই যে পাই নি আমি দেশে থাকবার সময়। মানব রায়ের লেখা দু-চারটি পুস্তিকার প্রসাদের ওপর নির্ভর করে কতদিন চলে? সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাগুলিকে কেমন করে বিশ্লেষণ করতে হয় কমিউনিজমের সেই বিশ্লেষণ নীতির সন্ধানে আমার সত্যিকার কোনো ধারণাই ছিল না তখন। দেশে থাকতেই ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’ পড়েছিলুম। এমন-কি, তার অনুবাদও শুরু করেছিলুম ‘গণবাণী’র পাতায়। কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-নীতির স্বত্রে মানব-ইতিহাসের গতির ধারাকে গেঁথেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস্ সেইটি আয়ত্ত করার মতো সমাজ-বিজ্ঞানের জ্ঞান আমার আদবেই ছিল না। একতলায় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে রিপোর্টের ছাপানো খণ্ড কয়েকটি বের করে রিপোর্ট লেখার কায়দাটা বুঝতে চেষ্টা করলুম। সাজানোর ধরণ সন্ধানে একটা মোটামুটি ধারণা করে নিলুম সন্ধে পর্যন্ত সেই রিপোর্টগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে। হোটেলের ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়লুম দরজা বন্ধ করে। মনে হতে লাগলো যেন আমার অসহায়তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করছে সমস্ত পৃথিবী, আমার আবেষ্টনী যেন শত শত বিবাক্ত ফণা তুলে ছোবল মারছে আমাকে। অসহায়তার এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি আমি আমার জীবনে; তাই মানুষের

অসহায়তার ছবি আমার মনকে নিবিড়ভাবে ব্যথিত করে, ক্ষেপিয়ে তোলে আমাকে এই সমাজ-ব্যবস্থার ও সমাজপতিদের বিরুদ্ধে।”

রাত্তিরে যখন চারিদিক ঘুমন্ত, ঘরের বাইরে আনাগোনার পথে মিলিয়ে গেছে পায়ের শব্দ ; তখন রিপোর্ট লেখবার জন্যে তোড়জোড় করে বসলুম জানালার পাশে টেবিলের সামনে। বাইরে মস্কোর জুনের রাত। আমাদের দেশে বিকেল আর মস্কোর সন্ধিক্ষণে যে রকম আলো থাকে সেই রকম আলো থাকে মস্কোয় গ্রীষ্মের রাতে। জানালা দিয়ে চোখে পড়ছিল ঘন নীল আকাশ আর গোধূলির আলোভরা উঠোন। সারা রাত্রি লিখে শেষ করলুম রিপোর্ট-লেখা। বিকেলে লোহানী এলেন, বললেন—রায় এসেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলুন। তখন গেলুম আমরা হোটেল লুক্সে যেখানে রায় থাকতেন। রায়ের কথা দেশে থাকতে এত শুনেছি, তাঁরই লেখা বই পড়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যাতে দেখতে শিখেছি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। তাই তাঁকে দেখবার ও জানবার কৌতুহল ছিল যথেষ্ট। লোহানীর সঙ্গে ঢুকলুম গিয়ে রায়ের ঘরে। এক দীর্ঘকায় পুরুষ দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করলেন। ঘরের মধ্যে দেখি আরো দু’জন রয়েছেন। তার মধ্যে টিভেলের সঙ্গে আগেই পরিচয় ঘটেছিল, দ্বিতীয়টি একটি ভদ্রমহিলা। আলাপ করবার সময় সেই সুদর্শনা অপরিচিতার পরিচয় দিয়ে লোহানী বললেন—ইনি কমরেড লু। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর রায় বললেন—বড়ো ক্লান্ত হয়েছি, সাতদিন সাতরাত ট্রেনে কেটেছে। দু-একদিন পরেই আপনার সঙ্গে বিস্তারিত ভাবে আলাপ করব। চলে আসছি এমন সময় রায় বললেন—আপনারা যদি আমাকে না চান কমিন্টার্নে ভারতীয় কমিউনিস্টদের প্রতিনিধি হিসেবে, তা হাঁকে চান তাঁকে পাঠাবেন ; আমি সরে যেতে রাজী আছি। আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না এই ধরনের কথার জন্যে ; তাই আকস্মিকতার ধাক্কা সামলে উঠে বললুম—আমরা কেউ এখানে থেকে যাবার জন্যে আসিনি। কাজ শেষ করেই দেশে ফিরে যাব। সেখানেই আমাদের কাজ। তাই আপনার জায়গায় ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে অন্য কারোর আসার প্রশ্নই ওঠে না।

হোটলে ফিরে এসে ভাবতে লাগলুম রায় এ কথাটা বললেন কেন ? এ ধরনের তো কোনো কথা কারো সঙ্গে হয় নি। কোনো কারণেই ভেবে

উঠতে পারছি না; এমন সময় হঠাৎ মনে হল যে পিয়াংনিস্কির সঙ্গে আমার যে আলাপ হয়েছে তার সারাংশ যে-কোনো উপায়েই হোক রায়ের কাছে নিশ্চয়ই পৌঁচেছে। ষ্টালিনের সেক্রেটারি হিসেবে টিভেলই যে পিয়াংনিস্কির কাছ থেকে আমাদের আলাপের খবর নিয়েছে, আর পরে রায়কে জানিয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না মনে। রায় ও লোহানীর বিরুদ্ধতা যে এবারে কি রকম বিঘাত হয়ে উঠবে তা সহজেই অনুমান করে নিলুম। একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে আসছে যারা অনেকদিন ধরে তাদের সেই অধিকারে হাত পড়লে ক্ষেপে ওঠা তো স্বাভাবিকই। আর এই একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখবার খেলা যে শুধু জমিদার আর কলওয়াল করে থাকে তা নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রে কালো, ফিকে লাল, লাল সব রঙের রাজনৈতিক পেশাদারেরা একচেটিয়া অধিকারের জন্তে যে কি জঘন্য লোলুপতার সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে লড়তে পারে তার প্রমাণ তো অতীতের রাজনৈতিক ইতিহাস বারে বারে দিয়েছে। আর এ বিষয়ে সর্বকালের রাজনৈতিক নজিরকে স্মান করে দিয়েছে বিংশ শতাব্দীর স্টালিন। দু'দিন বাদে কমিন্টার্নের কমিটিতে পলিটিকাল রিপোর্ট পেশ করবার জন্তে আমার ডাক পড়ল। সেদিন কমিটির মিটিংয়ের সভাপতিত্ব করলেন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট-গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান নিকোলাই বুখারিন। আমার রিপোর্টে আমি দেখালুম যে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কেমন করে বাধ্য হয়েছে ভারতবর্ষে তার বনেদী ঔপনিবেশিক নীতি বদলাতে। এতকাল ভারতবর্ষ ছিল কাঁচামাল লুণ্ঠনের অব্যবহিত ক্ষেত্র আর ব্রিটিশ পণ্যের একচেটিয়া বাজার। যুদ্ধের মাল যোগাবার জন্তে যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাধ্য হয়েছে ভারতবর্ষে বহু কলকারখানার পত্তন করতে দিতে। ভারতবর্ষের শিল্প-উন্নয়নে প্রাণপণ বাধা দেওয়াই হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি। তবে ইচ্ছে থাকলেও যুদ্ধের কারণে সেটা সম্ভব হয় নি। ভারতবর্ষকে কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজড দেশ বলা যায় না কেন না, উৎপাদনের যন্ত্র তৈরি আদবেই হয় না ভারতবর্ষে। এই রিপোর্টে জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে আমার যে মত ব্যক্ত করেছিলুম সেটা ছিল এই—কংগ্রেস ভারতবর্ষের বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক দল। বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলের পত্তনের ইতিহাসের

সঙ্গে কংগ্রেসের জন্মের ইতিহাস অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরোধ নিশ্চয়ই আছে। সে বিরোধকে কিন্তু ভারতবর্ষের বুর্জোয়া জাতীয় বিপ্লব পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যেতে পারে না। শ্রমিক বিপ্লবের যুগ শুরু হয়ে গেছে সোভিয়েট রাষ্ট্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে। এই যুগে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লব-পন্থী নয়, সে আপোস-কামী। ইতিহাস তাকে মেরে রেখেছে। ভারতবর্ষের বুর্জোয়ার রাজনৈতিক দল কংগ্রেসও এই একই কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস করতে বাধ্য। ভারতবর্ষের জাতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করা তাই ভারতের মজুরশ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

আমার রিপোর্টের পর অনেকে আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন নানা বিষয়ে। অবশেষে বুখারিন তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন। বুখারিন বললেন—এই কমরেড যা বললেন তাঁর রিপোর্টে, তার থেকে মনে হচ্ছে যে ভারতবর্ষে উপনিবেশিক কাঠামোর বিরুদ্ধ-প্রক্রিয়া (decolonisation process) শুরু হয়েছে। বুখারিনের এই মন্তব্যের পরে মানবেন্দ্রনাথ রায় আর লোহানী বুখারিনের এই প্রাসঙ্গিক উক্তির সুযোগ নিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি এক decolonisation theory রচনা করতে শুরু করে দিলেন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘ইমপ্রিকরের’ পাতায়। বুখারিন যে তখন বলশেভিক দলের পলিটবুরোর সদস্য, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সর্বাধিনায়ক। যে যখন ক্ষমতামালী তাঁকে তোয়াজ করবার সুযোগ সুবিধাবাদীরা কি কখনো ছাড়তে পারে? এক বছর বাদে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে এই একটি প্রাসঙ্গিক উক্তির জন্তে বুখারিনকে অনেক তীব্র সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল। সে কথা যথাসময়ে লিখব। কমিন্টার্নে রিপোর্টের পালা শেষ হতে না হতেই ভারতবর্ষের ট্রেড-ইউনিয়নের আন্দোলন সম্বন্ধে বলবার জন্তে লাল ট্রেড-ইউনিয়ন আন্তর্জাতিকের (এর রুশীয় সংজ্ঞা—প্রফিনটার্ণ) কাছ থেকে জরুরি তলব এল। লজ্জা তখন প্রফিনটার্ণের কর্তা। তাঁর সভাপতিত্বে লাল ট্রেড-ইউনিয়ন আন্তর্জাতিকের এক অধিবেশনে ভারতবর্ষের ট্রেড-ইউনিয়নের আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলুম আমি। রুশীয়দের যেমন রিপোর্টের,

নেশা এমনটি আমি দেখিনি আর কোথাও। কারখানা, স্কুল, ক্লাব, থিয়েটার, খবরের কাগজের অফিস, কমিন্টার্নের তো কথাই নেই, সব জায়গায় ‘দক্লাদ’ (রুশীয় শব্দ—মানে, রিপোর্ট) চলেছে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর। এটা এদের জীবনের এমন অঙ্গ যে ‘দক্লাদ’ না হলে এদের জীবনটা যেন ভরাটই হয় না, তাতে ফাঁক থেকে যায় অনেকটা। ‘দক্লাদের’ দায় থেকে উদ্ধার পেয়ে বাঁচলুম আমি। রুশীয় ভাষা শেখবার জন্তে উঠে পড়ে লেগে গেলুম। দেশে থাকতে রুশীয় হরফের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল, কিছু রুশীয় কথাও সংগ্রহ করেছিলুম আমার বিত্তের ঝুলিতে। তার বেশি আর এগোয় নি। এবারে খবরের কাগজ নিয়ে অভিধান নিয়ে ব্যাকরণ নিয়ে দুর্ভেদ্য ব্যুহ রচনা করলুম নিজেকে ঘিরে। সারাদিনের মধ্যে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা কাটত আমার সেই ব্যুহের মধ্যে। রোজ পঞ্চাশটি নতুন কথা শিখব এই পণ করে মরিয়া হয়ে লেগে গেলুম রুশীয় ভাষা শিখতে। ফলও পেলুম তার, অল্পদিনের মধ্যেই আমি রুশীয় কাগজ পড়তে শুরু করে দিলুম, রুশীয় ভাষায় কথা বলাও শুরু হোলো সঙ্গে। রুশীয় ভাষায় আমার দখল যে শুধু বন্ধুত্বের তারিফ পেয়েছে তা নয়, একদিন আমার খাস মস্কো জবানের তারিফ করলেন স্বয়ং বুখারিন। থিয়েটার আর সিনেমায় যেতে লাগলুম রুশীয় বন্ধুদের সঙ্গে। মনটা খুশি হল দেখে যে থিয়েটারে অভিনয়ের কথাবার্তার অনেকটাই বুঝতে পারছি। বল্শই থিয়েটারে ‘ক্রাসনিয়িমাক’ (লাল পপি) নামক ব্যালে দেখলুম। প্রধান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন সুপ্রসিদ্ধা ব্যালেরিনা গেলৎসার। মেয়রহোন্ডের থিয়েটারে দেখলুম গোগলের ‘রিভিজুর’, ত্রিচিকভের ‘রিচিকিতাই’ (চীনের ডাক), মালি থিয়েটারে দেখলুম ‘লুভব ইয়ারোভায়া’-নামক নাটিকা, স্টানিস্লাভস্কির থিয়েটারে দেখলুম ‘হ্যামলেট’ আর মেটার-লিঙ্কের ‘ব্লু বার্ড’, ভাগ্তান্গভ থিয়েটারে দেখলুম ‘প্রিন্সেস তুরেনদত্’, আরো কত অভিনয় দেখলুম কিন্তু এইগুলিই মনে আছে আর সব মুছে গেছে মন থেকে। এদের মধ্যে আবার বিশেষ করে মনে আছে ‘রিচিকিতাই’য়ের অভিনয় মেয়রহোন্ড থিয়েটারে, স্টানিস্লাভস্কির থিয়েটারে প্রসিদ্ধ অভিনেতা চেকভের অভিনয়, হ্যামলেটের ভূমিকায় ব্লু বার্ডের অভিনয় আর ‘প্রিন্সেস তুরেনদতের’ অভিনয় ভাগ্তান্গভ থিয়েটারে। রূপকথাকে

যে কি ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয় দৃশ্যপটে আর অভিনয়ে তা বুঝতে পারলুম 'ব্লু বার্ড' আর প্রিন্সেস তুরেনদতের অভিনয় দেখে। একবার ছোট্ট একটি ইহুদী থিয়েটারে 'গেলম' নামের একটি নাটিকার অভিনয় দেখেছিলুম। সে অপূর্ব জোরালো অভিনয়ের কথা আজও ভুলি নি।

মস্কো শহরটি বড় ভালো লেগেছিল। হোটেল থেকে বেরিয়ে কয়েক পা গেলেই বুলভার শুরু হোলো। পুষ্কিনের বিরাট মূর্তি রয়েছে বুলভারে ঢোকবার মুখেই। সমস্ত শহরটির মধ্যে দিয়ে ঘুরে গেছে বুলভার। বুলভারের ভিতরে পথের দু'পাশে বড়ো বড়ো গাছ তাদের তলায় সবুজ ঘাসের উপর শিশুদের মেলা বসে সকাল-সন্ধ্যা। সবুজ গাছগুলো সোনালী হয়ে যায় হেমন্তে। তারপরে পাতাঝরা নগ্ন গাছগুলো বরফের শুভ্র আবরণে নগ্নতার লজ্জা ঢাকে শীতকালে। পোষাকের একঘেয়েমি এখানে নেই, কেউ কলার দিয়েই গলাটাকে আড়ষ্ট করে বেঁধে চলেছে, কেউবা চলেছে রুশীয় রুবান্কা স্ট্রাউজারের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে কোমরে কোমরবন্ধ বেঁধে। নানা রঙের রঙিন রুমাল দিয়ে পিঙ্গল কি সোনালী রঙের চুল-গুলোকে বেঁধে পথ চলে মেয়েরা। এখানে পথে-ঘাটে কথাবার্তায় রঙের প্রাচুর্য দেখে খুশি হয় মন। রাস্তাগুলো আঁকাবাঁকা, ছোট্ট সরু রাস্তা, তার দুপাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকালেই মনে হয় তাদের মধ্যে একটা আত্মীয়তা আছে। পরস্পরকে তারা চেনে, ভালোবাসে। কত পুরোনো গির্জা ছড়িয়ে রয়েছে শহরময়। চমৎকার ফ্রেস্কো রয়েছে কতকগুলি গির্জার ভেতরকার দেয়ালে। আরবাতের কাছে একটি গির্জা দেখলুম, গুনলুম পুষ্কিনের বিয়ে হয়েছিল এই গির্জায়। রেড স্কোয়ারে ঢোকবার আগেই একটি ছোট্ট গির্জা। গির্জার চুড়োটি নীল রঙের, তার উপরে সোনালী তারা বসানো। এই ছোট্ট গির্জাটিতে সন্ধ্যাবেলায় লোক আরধরে না। ক্রেমলিনের দেয়ালের গা ঘেঁষে নদীর দিকে নেমে চলে গেছে প্রকাণ্ড শানবাঁধানো রেড স্কোয়ার। লেনিনের মাওসেলিয়ম রয়েছে রেড স্কোয়ারের মাঝামাঝি জায়গায় ক্রেমলিনের দেয়ালের ধারে। মস্কভা নদীটি মাঝারি গোছের চওড়া, ঢেউয়ের দেমাক করবার মতো তার স্রোতের সম্পদ নেই তবুও হুধারের তীরের বৈচিত্র্যে ছোটোবড়ো অসংখ্য নৌকোর যাওয়া-আসায় মস্কভা গতিমুখরা চিরচঞ্চলা। শীতের সময় মস্কভা শাদা জমাট বরফের মরুভূমি।

নদীর উপর দিয়ে হেঁটে পারাপার হয় লোকে, নদীর বুক বিছাতের গতিতে স্কেটিং করে মেয়ে-পুরুষে। শীতের শেষে বসন্তের প্রারম্ভে শুরু হয় বরফ-গলা। যেটা ছিল বরফের ঢালাই-করা পাতের মতো বেদাগ, সেটাতে দেখা দেয় চিড়ের রেখা শতসহস্র। উপরের বরফের আবরণ পাতলা হয়ে আসে; শোনা যায় বরফের তলায় শ্রোতের কলধ্বনি। তারপরে একদিন নদীর বুক ফেটে চোঁচির হয়ে যেতে শুরু করে সূর্যের উত্তাপে; নদীর বুক থেকে বরফ ফাটার ধ্বনি ছড়িয়ে যায় আকাশে-বাতাসে। বরফের বড়ো বড়ো টুকরো ভেসে যেতে থাকে। সন্কেবেলা সেই ভেসে যাওয়া বরফের চাকলার উপর প্রদীপ সাজিয়ে দেয় মেয়েরা। আলোগুলো জোনাকির মতো জ্বলতে জ্বলতে নিবে যায়, মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। এরা পথ চলে গান গাইতে গাইতে। এমন দিন নেই যেদিন চোখে পড়ে না যে একদল মজুর কিম্বা কয়েকজন লাল সৈনিক চলেছে রাস্তা দিয়ে বিপ্লবের গান গেয়ে। বুলভারের মধ্যেও প্রায়ই দেখি পথিকেরা একজন সৈনিককে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেছে, হাততালি দিয়ে তাল রাখছে আর সে নাচছে। নাচগান এদের কাছে আলো-বাতাসের মতোই প্রয়োজনীয় জীবনধারণের জন্তে। চলমান জীবনকে এরা বেঁধে নিয়েছে গান ও নৃত্যের ছন্দে। এখানে অফুরন্ত বৈচিত্র্য আছে কিন্তু বৈষম্যের পীড়াদায়ক ছবি চোখে পড়ে না। অভাব আছে কিন্তু সামাজিক বৈষম্যের ধারা অভাবকে এরা অপমানে পরিণত করে নি। লেনিন নেই কিন্তু তখনো স্টালিনের কালো ছায়া লেনিনের আলোকে নিঃশেষ করে দেয় নি।

হোটেলের ঘরে একদিন এক ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন, নাম বললেন— ফ্রায়ার। চীন থেকে সত্য ফিরেছেন, আমার হোটেলেই থাকেন। সন্কেবেলা ফ্রায়ারের ঘরে গেলুম, ফ্রায়ার আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর জীবন সঞ্জে। কয়েকদিনের মধ্যেই আলাপ জমে গেল, সন্কেবেলা ফ্রায়ারের ঘরে সামেম্ভার ফুটত টগবগ করে টেবিলের উপর, আমরা তিনটি প্রাণী টেবিলের ধারে বসে মজলিস জমাতুম। চীনের বিপ্লবের অনেক খবর পেলুম ফ্রায়ারের কাছ থেকে। ফ্রায়ার-দম্পতি এক বছর ছিলেন চীন দেশে। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলুম যে পেছিয়ে পড়া ভারতবর্ষের লোক বলে আমাকে এঁরা দেখেন করুণার নেকনজরে। যা-কিছু কলীয়ে তার উপর এঁদের

হুজনের প্রগাঢ় ভক্তি। যা-কিছু রুশীয় সেটা যে অতুলনীয় এইটে আমাকে দিয়ে মানিয়ে নেবার জন্তে এঁদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এঁদের নিয়ে রস উপভোগ করবার এমন সুযোগ যে আমি ছেড়ে দিই নি সেটা আশা করি বলতে হবে না! ফ্রায়ার-জায়া মুসা একদিন রুশীয় রান্নার প্রসঙ্গ তুললেন, জিজ্ঞেস করলেন রুশীয় রান্না আমার কি রকম লাগছে। বললুম বেশ লাগছে, দু-একটি রান্নার তারিফও করলুম। তিনি বললেন : সে কি কথা। এমন চমৎকার রান্না পৃথিবীতে নেই। বললুম, তা ঠিক মানতে পারছি নে। নানা দেশের নানা অপূর্ব রান্না খেয়েছি। এই সেদিন প্যারিসে ফরাসী রান্না খেয়ে এলুম, রান্না যদি বলতে হয় তো তাকেই বলে রান্না। রুশীয় রান্না আনাড়ির হাতের কাজ, ফরাসী রান্না শিল্পীর সৃষ্টি। হুজনে আক্রমণ করলেন আমাকে, দম নেবার জন্তে একজন থামেন তো আর-একজন ধরেন। তাঁদের কথাগুলো ভীমরুলের মতো বোঁ বোঁ করে উড়তে লাগল আমাকে ঘিরে। আমরা তিনজন ব্যালে দেখতে গেলুম একদিন সন্ধ্যাবেলা। হোটেল ফেরবার পথে ফ্রায়ার জিজ্ঞেস করলেন, ব্যালে লাগল কেমন। আমার যে বিশেষ ভালো লাগে নি সেটা জানিয়ে দিলুম তাঁকে। পথের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল ব্যালের তারিফে বক্তৃতার নায়াগ্রা প্রপাত। রুশীয় ব্যালের তারিফের বস্তায় সেদিন পথের মধ্যেই আমি ডুবে মরবার দাখিল। একবার আলোচনা শুরু হোলো বিশ্ব-সাহিত্য নিয়ে। আমি রোম্যা রোলঁ, রবীন্দ্রনাথ, টমাস মান প্রভৃতির কথা উল্লেখ করে বললুম এই জাতের লেখক সোভিয়েট রাশিয়ায় একটিও নেই। গর্কির ছোটো গল্পগুলি অপূর্ব, তাঁর নভেলগুলো এমন-কি, তাঁর বহু-প্রশংসিত ‘মা’ নভেলটিও কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে নীচু দরের। সেদিন উত্তেজনার যে বিস্ফোরণ হল তার জন্তে প্রস্তুত ছিলুম না। রোম্যা রোলঁ, রবীন্দ্রনাথ, টমাস মান যে ঘোর বুর্জোয়া আর বুর্জোয়ারা যে এ যুগে ভালো সাহিত্য কিছুতেই সৃষ্টি করতে পারে না, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সরকারী কবি ডিমিয়ান বিয়েদনির লেখার পাশে এঁদের লেখা যে হীরের পাশে কাঁচের মতো নিম্নপ্রভ এ-সব এবং আরো কত কিছু বলে চললেন ফ্রায়ার। অন্তর্দিন আমি এঁদের উসকে দিই, মাঝে মাঝে টিপ্পনীর একটি দুটি খোঁচা মারি রস-উপভোগ করবার জন্তে।

সেদিন এঁর কথায় আমার মেজাজটা ঈষৎ তেতে উঠে রস উপভোগে বাধা সৃষ্টি করল। বললুম, পোস্টারের শ্লোগান-লিখনেওয়াল্য ডিমিয়ান বিয়েদনিকে কবি বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা মাতালের টলতে টলতে চলাকে নাচ বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টার মতো হাস্যকর নিবুদ্ধিতার পরিচায়ক।

দুজনে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সরকারী মোহর-মারা কবির সম্বন্ধে এরকম উক্তি করতে যে কেউ সাহস করতে পারে এটা যেন তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারছিলেননা। পেছিয়ে-পড়া ভারতের অবুঝ রাজনৈতিক আদমিটির উপর এদের এতদিন ছিল করুণা, এবার সেই করুণার সঙ্গে মিশলো এসে রাগ। একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। রুশীয় গ্ৰাশনালিজম্ যে তার জাতীয় সওদা কাটতি করেছে দুনিয়ার বাজারে কমিউনিস্ট ইন্টারগ্ৰাশনালিজমের লেবেল লাগিয়ে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ রইল না। রাশিয়ার জাতীয় পণ্যকে বিশ্বের পণ্য হিসেবে চালিয়ে দেবার জন্তে প্রাণপাত করছে ইন্টারগ্ৰাশনালিজমের আলখাল্লা-পরা এ রকম রুশীয় গ্ৰাশনালিস্ট-কমিউনিস্ট যে কত দেখেছি তার সংখ্যা নেই। স্টালিনের আওতায় এই রুশীয় গ্ৰাশনালিজম্ বছরের পর বছর বেড়ে চলেছে শেষে আগাছার মতো ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত রাশিয়ায়।

কমিন্টার্নে প্রায় রোজই যাতায়াত করি। রায়ের সঙ্গে কয়েকবার আলোচনাও করেছি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে। মাঝে মাঝে রায়ের ওখানে খাবার নেমন্তন্ন আসে। জুটি আমরা এই কজন— টিভেল, লোহানী, টিভেলের স্ত্রী ইভা, আমি, রায়, লু আর রাথবোন। রাথবোন ইংরেজ, ঢেঙা, রোগা লোক, কেঙ্গারু-ছন্দে একটু লাফিয়ে চলে। লম্বা গলাটার উপরে ছোট্ট মাথাটি, দেখে মনে হয় যেন জিরাফের মানব-সংস্করণ। রাথবোন ছিল রায়ের মহা ভক্ত। রায়ের দিকে তাকিয়ে থাকত এমন করে যে মনে হত তার ভাব লেগেছে। একবার রায়ের ঘরে এক সঙ্কল্প মজলিশে আলাপ হল জার্মান কমিউনিস্ট নেতা হান্স্ নয়মানের সঙ্গে। হান্স্ নয়মান তখন-সবে রাশিয়ায় ফিরে এসেছেন ক্যান্টন্ থেকে। সেই মজলিশে আরো অনেক কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে আলাপ হল। নিজেকে তৈরি করবার জন্তে কী কড়া হাতেই না নিজেকে চালিয়েছি আমি এই

সময় ! কমিউনিজম সম্বন্ধে যত বই পেয়েছি সব উজাড় করে চলেছি, রুশীয় ভাষা আয়ত্ত করবার জন্তে একঘেয়ে পরিশ্রম করেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রুশীয় সাহিত্য ও রুশীয় ইতিহাস জানবার জন্তে কত লোকের শরণাপন্ন হয়েছি। রুশিয়ার অতীতকে আমার জানতে হবে তবেই আমি বুঝতে পারব সোভিয়েট রুশিয়াকে, এই ধারণা নিয়ে চলেছি আমি সেদিন। সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ করবার জন্তে কী ঘোরাই না ঘুরেছি, কী পরিশ্রমই না করেছি তখন। সোভিয়েট রাশিয়ার নতুন শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্তে অন্তত পঞ্চাশটি শিশুদের শিক্ষা-নিকেতনে গিয়েছিলুম। তা ছাড়া শিশুদের ক্লাব, তাদের থিয়েটার সব খুঁটিয়ে দেখেছিলুম। অন্য অন্য দেশের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্তে ‘ভক্‌স্’ নামে এক প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠান চালনা করতেন মাদাম কামেনেভা। ইনি ছিলেন প্রসিদ্ধ বলশেভিক নেতা কামেনেভের স্ত্রী, ট্রটস্কির বোন। মাদাম কামেনেভা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে যাবার জন্তে। মনে আছে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলেন— অনেক সমজদার লোকের সঙ্গে আপনার আলাপ করার সুযোগ হবে আমার ওখানে। আপসোস থেকে গেল তাঁর সহৃদয়তার সুযোগ আমি গ্রহণ করতে পারি নি। তখন বলশেভিক দলের মধ্যে স্টালিন আর ট্রটস্কি-কামেনেভ-জিনোভিয়েভের লড়াই চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। এক ভয়ংকর হিংস্র বিধাত্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে রেখেছিল স্টালিন সমস্ত রাশিয়া জুড়ে। তার কথা মানিয়ে নেবার জন্তে তাঁর নেতৃত্বকে স্বীকার করিয়ে নেবার জন্তে লেনিনের বলশেভিক পার্টিকে তুলে দিয়েছিল স্টালিন তার গোয়েন্দা-পুলিশ-বিভাগ গেপেয়ুর হাতে। যতদূর মনে হচ্ছে আমার সাহসে কুলোয় নি সেই হিংস্র সময়ে মাদাম কামেনেভার ওখানে গিয়ে কামেনেভ ও ট্রটস্কির সঙ্গে দেখা করার। ফাঁকিতে কিন্তু আমিই পড়েছি, ক্ষতিটা হয়েছে আমারই।

কিশোর বয়েস থেকে ভেরা ফিগ্‌নারের নাম শুনে এসেছি। স্বৈচ্ছাচারী জারকে মারবার জন্তে রাশিয়ার সম্রাসবাদীরা কি রকম ষড়যন্ত্র করেছিলেন তার কাহিনী তন্নয় হয়ে পড়তুম সেই অন্তর্যয়ে। তাই লেনিনের নাম

যখন একেবারেই শুনি নি তখন থেকেই ভেরা ফিগনারের নাম আমার জানা ছিল। বন্ধু লিও ভিলেন্সিকে একবার কথায় কথায় ভেরা ফিগনারের কথা জিজ্ঞেস করলাম। তার কাছ থেকে শুনলাম যে-ভেরা ফিগনার বেঁচে আছেন আর থাকেন মস্কোতেই।

লিওকে ধরে পড়লাম ভেরা ফিগনারের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিতে হবেই। দু'দিন বাদে লিও এলেন হাতে একটি পোস্টকার্ড। দেখলুম তার পরদিন বিকেলে আমাদের যেতে লিখেছেন ভেরা ফিগনার। পরদিন বিকেলে লিও আর আমি গেলুম তার সঙ্গে দেখা করতে। ঝারা জারের স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জীবনপণ করে লড়েছিলেন আর তার জন্তে অকল্পনীয় দুঃখ লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন বিপ্লবের পরে, তাঁদের সম্পূর্ণ ভার নিয়েছিল লেলিনের সোভিয়েট রাষ্ট্র। স্টালিনের আমলে মানবতার অগ্র সব চিহ্নের লুপ্তর সঙ্গে এটিও লোপ পায়। বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছি হঠাৎ জানলার দিকে নজর পড়ল। দেখি লাল শাল গায়ে এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন জানালার কাছে। আমরা বারান্ডায় উঠতেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কি সুন্দর চেহারা! কাশের মতো নরম সাদা চুল কপালের উপর দিয়ে টেনে খোঁপা করে বাঁধা, বড়ো বড়ো চোখ, নিখুঁত নাক, মুখখানি অসামান্যতার লাবণ্যে উজ্জ্বল। তাঁর আত্ম-জীবনী 'রাশিয়ার উপর রাত্রির ছায়া' বইখানি আমি পড়েছিলুম। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ভেরা ফিগনারের যাতায়াত ছিল জারের প্রাসাদে। অপূর্ব সুন্দরী বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। জারকে মারবার জন্যে বড়যন্ত্র করার অপরাধে তাঁর যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম হয়। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কারাবাসের পর নভেম্বর বিপ্লবই তাঁকে মুক্তি দেয়। যে লোহার খাচাটিতে তিনি এই দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন সেটি রাখা আছে মস্কোর বিপ্লবের মিউজিয়ামে। আমি তাঁর আত্মজীবনীর কথা উল্লেখ করলুম, বললুম যে বইখানি পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। তাঁর কাল আর সেকালের বিপ্লবীদের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা যে পড়বে সে কখনো ভুলবে না। তাঁর অল্প বয়সের যে ছবিগুলি বইতে রয়েছে সেগুলির কথা তুলে বললুম—জারকে বিয়ে করবেন এই রকম কল্পনা করা আপনার পক্ষে মোটেই অগ্ৰায় ছিল না, যে রকম আশ্চর্য সুন্দর ছিলেন আপনি। আমার দিকে তাকিয়ে

কৌতুকভরা চোখে মিষ্টি হাসি হেসে বললেন— কেন, এখন কি রকম দেখছেন? সত্যি তাই, জীবনের পঁচিশ বছর জন্তর মতো লোহার খাঁচায় বন্ধ থেকে আটাত্তর বছর বয়সেও মানুষ এত লাভ্য পায় কোথা থেকে! ভারতবর্ষের কথা অনেক জিজ্ঞেস করলেন, বললেন— গান্ধীকে আমি বুঝি না। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে বৈকি, ওতে অগ্নায় কী থাকতে পারে? রাশিয়ার অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্তে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন— মানুষের দিকে না তাকিয়ে প্ল্যান করলে এই রকমই ঘটে। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে হরণ করবার জন্তে স্টালিনের তীব্র সমালোচনা করলেন। আমি অবাক হয়ে গেলুম তাঁর নির্ভীকতায়।

তারপরে আরো বার দুয়েক তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলুম। তাঁর আত্মজীবনী আর তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত তাঁর নিজের অনেক ছবি তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। বইটি এখনো আমার কাছে আছে, ছবিগুলো একজন ভারতীয় স্টালিনপন্থী দেখবার নাম করে আত্মসাৎ করেছে।

গ্রীষ্মের দিনগুলি শেষ হয়ে এল। বুল্ভারে গাছগুলিতে সোনা ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল হেমন্ত বায়ু। ঘন নীল আকাশ হল ধূসর। হেমন্তের ঝড় ছড়িয়ে দিল পাতার সোনা রাস্তায় বনে বুল্ভারে। আমাদের দেশে ঋতুর ডালিতে রঙের বৈচিত্র্য নেই, আছে শুধু সবুজ আর সবুজেরই হেরফের। এখানে আছে রঙের খেলা সবুজে সোনালিতে সাদায়। এ দেশের ঋতুর মতো এ দেশের মানুষদের জীবনও বৈচিত্রে ভরা, নানা রঙে রঙিন। এই জীবন-বৈচিত্রের রঙিন সুরা পান করছিলুম আমি আমার প্রাণের উত্তপ্ত তৃষ্ণার তাড়নায়।

হেমন্তের সোনালি দিন শীতের ছোঁয়ায় ধূসর হয়ে এল। পাতায় পাতায় সোনার এত ছড়াছড়ি, এত প্রগল্ভতা বুঝি সহ্য করতে পারল না প্রকৃতি। এল ঝরা পাতার দিন। ঝরা পাতার আল্পনা দিতে শুরু করল শীতের হাওয়া পথে ও বুল্ভারে। ঘূর্ণির বিনি স্রতোয় ঝরা পাতাগুলোকে গোঁথে নিয়ে তুলে নেয় শীতের হাওয়া শূন্যে, সেখানে ঘুরপাক খাইয়ে কৌতুকভরে ছড়িয়ে দেয় তাদের চারদিকে। রিক্ত ডালগুলি আকাশের দিকে মেলে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে নগ্ন গাছগুলো। যেন তাদের নগ্নতা দূর করবার জন্তে তারা প্রার্থনা জানাচ্ছে আকাশকে। অক্টোবর শেষ হয়ে

গেল, শীত বাড়ছে, বরফের দেখা কিন্তু তখনও নেই। ঘনিয়ে এল নভেম্বর
 বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উৎসবের দিন। সাতই নভেম্বর। সেদিন সকাল
 থেকে মস্কোর রাস্তায় রাস্তায় সে কী আগুনের শ্রোত। মস্কো যেন
 আপনাকে ঢেলে দিয়েছে উজাড় করে শহরতলীর রাস্তাগুলোতে। সমস্ত
 রাস্তা দিয়ে মানুষের রঙিন ও উত্তপ্ত শ্রোত অবিরাম বয়ে চলেছে রেড
 স্কোয়ারের দিকে। লেনিনের মাওসেলিয়ামের সামনে দিয়ে চলেছে হাজার
 হাজার লাল পণ্টন আর ছাত্রের দল, চলেছে লক্ষ লক্ষ মজুর আর
 নাগরিক। কাভ্‌কাসের ঘোড়সোয়ারের দল কাল কাভ্‌কাসি পোষাক
 পরে ঘোড়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল। মনে
 হচ্ছিল যেন এক ঝাঁক ফিঙে মাটির উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। সারা
 সকাল ধরে রেড স্কোয়ারে আর রাস্তাগুলোয় উৎসব চলল। গান গাইছে
 হাজার হাজার লোক, মনে হচ্ছে সমস্ত শহর যেন গান গাইছে। দলে
 দলে লোক নাচছে বুল্‌তারে ও রাস্তায়। সে এক আশ্চর্য ছবি আগুনের
 রঙে রাঙা। রেখাগুলি তার হালকা ও চিকন নয়, রেখাগুলি প্রবল ও
 গভীর। কলকারখানা সব বন্ধ, সিনেমা, থিয়েটার সব খোলা। লেনিনের
 বিরাট ছবি চোখে পড়ে প্রত্যেকটি রাস্তায়। তখন স্টালিনের গোয়েন্দা
 বিভাগ ‘গেপেয়ু’র হুকুমে প্রত্যেক বাড়ি থেকে স্টালিনের ছবি জবরদস্তি
 টাঙ্গানর দিন শুরু হয় নি। স্টালিনকে ‘আমার সূর্য, আমার তারা, আমার
 ঠান্ড’ বলে সম্বোধন করবার মতো রুচির যে জঘন্য বিকৃতি আজ ‘গেপেয়ু’র
 তাড়নায় দেখা দিয়েছে সোভিয়েট সমাজে, উনিশশো সাতাশ সালে তখনও
 সেটা ঘটে নি। স্টালিনের অসংস্কৃত জীবনের কালো ছায়া সোভিয়েট
 রাশিয়ার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে তখনো আবৃত করতে পারে নি
 তার কাল কলুষের নির্মম আবরণে।

সকালের সেই জনশ্রোতের মধ্যে হাজির হলেন ট্রট্‌স্কি। যেখানে
 কতবার কত উৎসবের দিন লেনিন আর ট্রট্‌স্কি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জনতার
 প্রাণের উছল অভিবাদন নিয়েছেন এবারে সেই রেড স্কোয়ারের ট্রট্‌স্কির স্থান
 ছিল না স্টালিনের আদেশে। এবারে তাই রাস্তার জনতার মধ্যে মোটরে
 দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন ট্রট্‌স্কি। লোকে উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনতে লাগল
 কিন্তু স্টালিনের পুলিশ এসে হাকিয়ে দিল তাদের। তখন রাস্তার ধারের

এক হোটেলের দোতালার গাড়ি-বারান্দায় গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন ট্রটস্কি। থাম বেয়ে গাড়ি-বারান্দায় উঠে স্টালিনের গোয়েন্দারা ঘিরে দাঁড়াল ট্রটস্কিকে। এই হল ট্রটস্কির শেষ আবির্ভাব মস্কোর জনতার সামনে। তার কিছুদিন পরেই তাঁকে মস্কো থেকে নির্বাসিত করল স্টালিন। আমি মাত্র দুবার ট্রটস্কির বক্তৃতা শুনেছি। একবার জোফের মৃত্যুর পর মস্কোর বাইরে গোরস্থানে আর একবার ক্রেমলিনে বলশেভিক পার্টির বাৎসরিক কনফারেন্সে। স্টালিনের নীতির বিরুদ্ধতা করেছিলেন জোফে। এই অপরাধে তাঁকে দলের সব কাজ থেকে সরিয়ে দেয় স্টালিন। জোফে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি দুটি চিঠি রেখে যান— একটি বলশেভিক দলের সেন্ট্রাল কমিটিকে আর একটি ট্রটস্কিকে। সেন্ট্রাল কমিটিকে তিনি জানান যে দলের জীবনের বাইরে তাঁর জীবনের অস্তিত্ব নেই। স্টালিন যখন তাঁকে দল থেকে সরিয়েই রেখেছে তখন সত্যি করে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাই শুধু দেহ নিয়ে বেঁচে থাকতে চান না তিনি। ট্রটস্কিকে লিখেছিলেন— আপনার নীতি ঠিক। ক্ষমা করবেন আমাকে, আমি সাহায্য করতে পারলুম না আপনাকে।

মৃত্যুর পরেও স্টালিনের নীচ হিংস্রতা রেহাই দেয় নি জোফেকে। মৃত্যুর পর বলশেভিক নেতাদের কবর দেওয়ার রেওয়াজ ছিল রেড স্কোয়ারে। ব্যতিক্রম ঘটল কিন্তু জোফের বেলায়। জোফের মৃতদেহ কবর দিতে দিল না স্টালিন রেড স্কোয়ারে। শহরের বাইরে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হল জোফের মৃতদেহ। সেন্ট্রাল কমিটির দিক থেকে সেখানে হাজির ছিলেন শুধু বুখারিন। ট্রটস্কির কথাগুলো এখনো কানে বাজছে— কমরেড জোফে, বিপ্লবের জন্মে তুমি যা করেছ তা আমরা ভুলব না কখনো। যে নীচতা মৃত্যুর পরেও তোমাকে অনুসরণ করেছে তার ক্রুরতা নিয়ে তাকে আমরা কখনো ক্ষমা করব না। কমরেড জোফে, আমরা শপথ করছি যে তোমাকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে যাব রেড স্কোয়ারে লেনিনের পাশে তোমার যোগ্য বিশ্রাম-স্থানে। ট্রটস্কির সেই প্রতিশ্রুতি পালন করবার ভার আজ বিশ্বের জনসাধারণের। আর সেখানে লেনিনের পাশে ট্রটস্কিরও চিরবিশ্রাম-ভূমি রচনা করবার ভার তাদেরই।

ক্রেমলিনে বলশেভিক দলের পঞ্চদশ-বার্ষিক কনফারেন্স। সে

অভিজ্ঞতাও ভোলবার নয়। ক্রেমলিনের প্রকাণ্ড হলে লোক ধরে না। ঘরের হাওয়া তেতে উঠেছে উত্তেজনায়।

সভা-মঞ্চে স্টালিন, বুখারিন, ভরসিলভ্ প্রভৃতি দলের নেতারা। কূটচালের খলিকা স্টালিন তখন বুখারিনকে দিয়ে ট্রট্‌স্কিকে আঘাত হানছে। তার নিজের যুক্তি দিয়ে ট্রট্‌স্কির যুক্তি খণ্ডন করবে এমন মগজের দাবি স্টালিন নিজেও করে নি তখন। যদি করতো তো সেদিন সমস্ত রাশিয়া জুড়ে, কোতুক-হাশ্মের তুফান যেত বয়ে। আজ অবিশিষ্ট অগ্ন্য কথ্য! ট্রট্‌স্কি, জিনোভিয়েভ্, কামেনভ্ ও রাডেক এলেন সেই কনফারেন্স সভায়। সভামঞ্চের উপরে না বসে বসলেন তাঁরা সভা-মঞ্চের সিঁড়িতে। বক্তৃতা দিতে উঠলেন ভরসিলভ্। ‘রিবিয়াতা’ বলে সকলকে সম্বোধন করলেন তিনি। ‘রিবিয়াতা’ শব্দটির মানে হচ্ছে ‘ছেলের দল’, আর ব্যবহার করা হয় সৈন্যদের সম্বোধন করতে। ট্রট্‌স্কি গর্জে উঠলেন—রিবিয়াতা নয়, তোয়ারিশ (তোয়ারিশ ক্রণীয় শব্দ, মানে কমরেড) এটা পন্টনের ব্যারাক নয়। ভরসিলভ্ ক্ষেপে উঠে বললেন, তোয়ারিশ নয়, রিবিয়াতা। এই নিয়েই কথা কাটাকাটি চলল কিছুক্ষণ। ভরসিলভের বক্তৃতা শেষ হল। এবারে ট্রট্‌স্কি বলতে চাইলেন, বললেন তাঁর দু ঘণ্টা সময় চাই। মঞ্চের উপর থেকে উত্তর এল তাকে পনেরো মিনিট সময় দেওয়া হবে। কাগজ-পত্র গুটিয়ে ট্রট্‌স্কি উঠে পড়লেন সভা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য। সভা থেকে চিৎকার উঠল—ট্রট্‌স্কিকে বলতে দেওয়া হোক, তাকে সময় দেওয়া হোক। স্টালিন মুখে পাইপ, ঘুরছে মঞ্চে, একবার বুখারিন, একবার ভরসিলভ্, একবার মলতভ, এদের কাছে গিয়ে মন্তব্য চালাচ্ছে চাপা গলায়। শেষে ঠিক হল এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হবে ট্রট্‌স্কিকে। সভামঞ্চে উঠে বক্তৃতা দেবার জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন ট্রট্‌স্কি। কমিন্টার্নে খাজাঞ্চিগিরি করত এক জার্মান স্টালিনপন্থী, হঠাৎ এগিয়ে এসে ট্রট্‌স্কিকে ধাক্কা দিয়ে সে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তীব্র অবজ্ঞার সঙ্গে তার দিকে একবার তাকিয়ে ট্রট্‌স্কি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ভরসিলভ্ একটি গেলাস ছুঁড়ে মারলেন ট্রট্‌স্কির পায়ের কাছে। কাঁচ ছড়িয়ে গেল চারিদিকে, ট্রট্‌স্কি ফিরেও তাকালেন না। সে কী বক্তৃতা! এমন ঘটনা সাজানো হল ইতিহাসের গতি বোঝবার জন্যে। নীতি এল ঘটনা-বিশ্লেষণের সাহায্যে, ঘটনাগুলো প্রমাণ করল

নীতির যথার্থতা। সে এক আশ্চর্য বহুনি ভাবের চিন্তার ও ভাষার ! যেমন কণ্ঠস্বর, তেমনি জোরালো ভঙ্গি, তেমনি ভাষার ইন্দ্রজাল রচনা ! সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো কথাগুলো বিরামহীন ভাবে আছড়ে পড়তে লাগল শ্রোতাদের বুকে। তার নিজের লোক দিয়ে সভা ভরে রেখেছিল স্টালিন, তবু সেই বক্তৃতা ও বিবাক্ত উপদলীয় বিরুদ্ধতা নির্বাক হয়ে শুনছিল ট্রুটস্কির বক্তৃতা। ‘একদেশে সোশালিজম্ সম্ভব’ স্টালিনের এই আঘাতে মতবাদকে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন ট্রুটস্কি। চীনের বিপ্লবে স্টালিনের হঠাৎ ঝাঁয়ে হঠাৎ ডাইনে যাওয়ার সুবিধাবাদী নীতিকে, দলের মধ্যে আলোচনার সমস্ত সুযোগ ও অধিকার নষ্ট করবার স্টালিনের ক্যাসিস্ট চক্রান্তকে, কমিন্টার্নকে বলশেভিক পার্টির ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের খেলনা বানানোর বদ মতলবকে আঘাতের পর আঘাত হানলেন ট্রুটস্কি। স্টালিন ও স্টালিনবাদকে তীব্র কশাঘাত হেনে ট্রুটস্কি বললেন— স্টালিন ও স্টালিনবাদ বিপ্লবের অরুণ আলোকে নিবিয়ে দিয়েছে। তার জায়গায় এনেছে বিপ্লবের গোধূলি। কিন্তু ওস্তাদ চক্রীর নিজের হাতে সাজানো সভায় যুক্তির স্থান কোথায় ? সেই কন্ফারেন্সেই ট্রুটস্কিকে বের করে দেওয়া হল বলশেভিক পার্টি থেকে।

সন্কে ঘনিয়ে এল। ক্রেমলিনের গম্বুজের চূড়ায় যে বিরাট লাল নিশান উড়ছিল সারাদিন, সন্কের বিজলী আলোর রশ্মিতে মনে হচ্ছিল যে সেই লাল নিশান যেন এই পৃথিবীর রাঙা বিদ্রোহ বনেদী আকাশের নীল অভিজাত্যকে আঘাত করবার জন্য হাত বাড়িয়েছে। ক্রেমলিনের ঘড়িতে বাজছিল ইন্টারন্যাশনাল গানের সুর ঘণ্টায় ঘণ্টায়। সকালের উৎসবের পর উৎসব-ক্লান্ত জনতা ঘরে ফিরে গিয়েছিল। রাস্তাগুলো খালি হয়ে গিয়েছিল হুপুর থেকে। বিকেলের পর থেকে রাস্তাগুলো আবার ভরে উঠল কানায় কানায়। রাত্তিরে আমাদের আমন্ত্রণ ছিল ক্রেমলিনের উৎসবে। মাদাম লোহানী, লোহানী, নলিনী গুপ্ত আর আমি চললুম ক্রেমলিনের উৎসবে। সবে মাত্র পথে বের হয়েছি হঠাৎ শুরু হল বরফ পড়া। বৃদ্বুদের মতো হালকা শাদা বরফের টুকরোগুলি নেমে এলো আকাশ থেকে। মনে হচ্ছিল যেন পাগলা হাওয়ার ঝাঁকানিতে আকাশের উপবন থেকে লক্ষ লক্ষ শাদা ফুল ঝরে পড়ছে পৃথিবীতে। বরফে-ধোওয়া বাতাসেও যেন দূর আকাশের গন্ধ। আমরা ইচ্ছে হচ্ছিলো এই বরফের

ফুল-ঝরা রাতে ঘুরে বেড়াই পথে পথে বুল্ভারে বুল্ভারে। রেড স্কোয়ারের ধারে প্রকাণ্ড ফটক দিয়ে ঢুকলুম আমরা ক্রেমলিনে। প্রাসাদের যে অংশে রাশিয়ার শেষ রাজা নিকোলাসের তিন মেয়ে বাস করত সেখানে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। আঁকা-বাঁকা সরু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলুম। এটা ক্রেমলিনের পুরোনো মহল, তৈরি করা হয়েছিল অনেক শতাব্দী আগে। এখানে এশিয়ার হাতের ছাপ স্পষ্ট—নীচু ছাদের ঘর, নীচু দরজা, দেয়ালে ফুল-লতা-পাতার বিচিত্র নকশা। এই মহলের অগুন্তি ঘরের কোনো ঘরে চলেছে গান, কোথাও চলেছে কভকাসের নাচ, কোথাও বা জর্জিয়ার নাচ। দু-তিনটি ঘরে অটেল খাবার সাজানো রয়েছে লম্বা টেবিলগুলোতে—ক্যাভিয়ার, নানা রকমের মাছ ও মাংস আর নানা রকমের ফল। তা ছাড়া মদের আয়োজন ছিল বাদশাহী ধরনের—আঙুর আর আপেল-চোয়ানো কভকাসের মদ, ক্রাইমিয়ার মদ, ভদকা, তা ছাড়া আরো হরেক রকমের মদ। লোহানীর তর সইছিল না। ছিপি খোলবার সময়টুকুও সে নষ্ট করতে রাজী নয়। ভদকার বোতল নিয়ে টেবিলের কোণ ঠুকে বোতলের মাথাটি উড়িয়ে দিয়ে ঢেলে দিল বেশ কিছুটা ভদকা গলার গহ্বরে। রুশীয়দেরও তাক লাগিয়ে দিল লোহানী তার ভদকা খাবার কেরামতিতে। কত লোক যে ছিল সেদিন রাত্রিরে ক্রেমলিনের এই উৎসবে। বারবুসকে দেখলুম একটি কোণে বসে আছেন। শকলংওয়ালা ঘোরাফেরা করছিলেন। দুটি মেয়ে এসে টেনে নিয়ে গেল তাঁকে তাদের দলের মধ্যে, তাঁর হাত ধরে নাচতে শুরু করে দিল। বুড়ো শকলংওয়ালার নাচ দেখে ঘরস্থলু লোকের কী হাসি। কিছুক্ষণ এঘর ওঘর করে আমিও বসলুম গিয়ে একটি কোণে। মনটা আমার পার হয়ে গেল বর্তমানের সীমানা, ঘোরাফেরা করতে লাগল ক্রেমলিনের অতীত ইতিহাসে, আইভান আর ক্যাথারিনের কথা নাহয় বাদই দিলুম, মাত্র দশ বছর আগে রাজ-প্রাসাদের এই-সব ঘরেই তো ধনীদেব বিলাস-লীলা ছিল। রাশপুটিনের পঙ্কিল শয়তানির সাক্ষী তো এই-সব ঘরগুলিই। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই ক্রেমলিনের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে রাশিয়ার ইতিহাসের ধারা। আমার মনে হচ্ছিল যে সে অতীত যেন কোঁতুক ভরে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমাদের অসহিষ্ণুতা ও অধীরতা দেখে সে অতীত

যেন মুখ টিপে দুষ্ট হাসি হাসছে। সে যে অনেক দেখেছে। অজানাদের ভিড়ে নিজের স্বপ্ন নিয়ে একলা থাকা চলে, জানাদের ভিড়ে সে স্বযোগ কোথায়? স্বপ্ন ভাঙতে এই ধরনের চেনা-অচেনাদের জুড়ি নেই। আমার কোণটি আর নিরালা রইল না এদের ভিড়ে। তা ছাড়া ভদ্রকার তরল উত্তাপে লোহানীর লোহার প্রাণ বিগলিত হয়ে যে রকম উছল হল আমার উপর যে সেটা প্রায় দুঃসাধ্য হল সহ্য করা। মাদাম লোহানী ছিলেন বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে। লোহানীর অত্যাচার থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্যে তাঁর সলজ্জ প্রয়াসের অন্ত ছিল না। যে বায়ুমণ্ডল আমার চারদিকে রচনা করে বসেছিলুম সেই কোণটিতে, লোহানী ছাড়াও আরো অনেকে নিরর্থক পোষাকী কথার ঢিল মেরে বিক্ষিপ্ত করে দিল সেই বায়ুমণ্ডলকে।

রাত তখন ভোরের দিকে ঢলে পড়েছে যখন ক্রেমলিন থেকে বের হয়ে এলুম রেড স্কোয়ারে। দেখলুম শহরের চেহারা যেন একেবারে বদলে গেছে। ক্রেমলিনে যাবার জন্যে সন্কেবেলা যখন পথে বের হয়েছিলুম তখন আকাশের রঙ ছিল রক্তিম ধূসর। পথগুলো ছিল পাথুরে রঙের, গাছগুলো ছিল পাতাহীন শুকনো কালো মূর্তি। কয়েক ঘণ্টায় একি ইন্দ্রজালিক পরিবর্তন। পথ, গাছ, বাড়ির ছাদ, কার্নিশ মোমের মতো শাদা বরফের পুরু আবরণে ঢাকা। যেন এক জাদুকর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক মোমের শহর তৈরি করেছে। আকাশের ঝড় চেহারাও দেখি একেবারে বদল হয়ে গেছে। আকাশ পরেছে তারার সলমা চুমকি-বসানো ঘন-নীল উত্তরীয়। সঙ্গীরা চলে গেলেন যে যার ঘরে। বুল্ভার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আমি চলে গেলুম নদীর ধারে। সেই শীতের রাতের শেষ শহরে জনহীন নদীর ধারে আমিই ছিলাম একমাত্র পথিক, সমস্ত শহর তখন বরফের শুভ্র আচ্ছাদনের তলায় ঘুমিয়ে ছিল। শুধু পথের ধারের কাঠের ঘর থেকে গ্রহরীরা মাঝে মাঝে মাথা বের করে দেখছিল কে এক পাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে এই শীতের রাতে।

পরদিন বিকেলে এশিয়ার ও আফ্রিকার জনসাধারণের প্রতিনিধিদের এক সভা ডাকা হয়েছিল। সেই সভায় সভানেত্রী ছিলেন মাদাম সুনিয়াৎ সেন। ভারতবর্ষের তরফ থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায় আর আমি বক্তৃতা দিই সেই সভায়। বক্তৃতা দিতে উঠে হঠাৎ নজরে পড়ল ঘরের এক কোণে

বসে আছেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু আর জওহরলাল নেহেরু। তাঁরা যে মস্কোয় আসছেন সে খবর জানা ছিল। কমিন্‌টার্নের দপ্তরে বুখারিন এঁদের আসবার খবর আমাকে জানিয়েছিলেন। তিনি আমাকে অত্নরোধও করেছিলেন যে এঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে আমি যেন স্টেশনে যাই। আমার মনে তীব্র বিরূপতা ছিল পণ্ডিত মোতিলাল সম্বন্ধে। তালুকদারদের দোস্তু পণ্ডিত মোতিলাল সংযুক্ত প্রদেশের কিসাণ আন্দোলনকে যে কিভাবে খতম করে দেন তা আমার জানা ছিল। এ্যাসেমব্লিতে বক্ষ্যা বক্তৃতা দেওয়া আর ফলওয়ালা জমিদারদের সুবিধের জন্যে আইনের কিছু হেরফের করা ছাড়া অন্য কিছু করার তাগদ এই ধরনের নেতাদের আদবেই ছিল না। পণ্ডিত মোতিলালকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে স্টেশনে যেতে আমি সোজাসৃজি অস্বীকার করলুম। বক্তৃতার শেষে যখন হাততালির পালা এল তখন দেখলুম পণ্ডিত মোতিলালও হাততালি দিচ্ছেন। সভার শেষে মাদাম সুনিয়াং সেনের সঙ্গে আলাপ করছি, হঠাৎ মনে হল পিছন থেকে কে যেন হাত দিল আমার কাঁধে। ফিরে দেখি পণ্ডিত মোতিলাল। হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে বললেন— নিজেকে বাঁচিয়ে চলো। আমার সঙ্গে দেখা কোরো। দু-চারটি কথার পর তিনি চলে গেলেন। দু'দিন পরে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে আর আমাকে নিয়ে বুখারিন পণ্ডিত মোতিলালের সঙ্গে দেখা করতে যান। আমি বাধা দিয়েছিলুম কিন্তু শুনলেন না বুখারিন। আমাকে আর মানবেন্দ্রনাথ রায়কে নিয়ে চললেন পণ্ডিত মোতিলালের হোটেলে। পণ্ডিত মোতিলাল সেই দিনই মস্কো ছাড়বেন। ঘরে গিয়ে তাঁকে খবর দিলুম যে বুখারিন দেখা করতে এসেছেন। পণ্ডিত মোতিলাল বললেন— বুখারিন কে? অবাক হয়ে গেলুম। এই কুয়োর ব্যাঙেরা চালাবেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লড়াই। বুখারিনের নাম পর্যন্ত শোনেন নি। বুখারিনের পরিচয় জানিয়ে বললুম— তিনি পোলিটব্যুরোর সদস্য। কমিন্‌টার্নের অধিনায়ক। পণ্ডিত মোতিলাল বললেন— খুব অল্প সময়ের জন্যে দেখা করতে পারি, কেননা আমাকে ট্রেন ধরতে হবে। ভিতরটা আমার রাগে জ্বলে যাচ্ছিল। বললুম— বুখারিনও বেশি সময় দিতে পারবেন না। তাঁর অনেক কাজ। আপনি চলে যাচ্ছেন বলে তিনি দেখা করতে এসেছেন। বুখারিন অপেক্ষা করছিলেন বাইরে।

তাঁকে ডেকে আনলুম ঘরে। পণ্ডিত মোতিলালের দাস্তিকতার কথা শুনেছিলুম, এবার তার পরিচয় পেলুম। মোতিলাল যে তাঁর নামও শোনেন নি আর তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই রাজী ছিলেন না সে কথা পরে একদিন বলেছিলুম বুথারিনকে। তিনি খুব হেসেছিলেন।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা ট্রেড ইউনিয়ন হলে বিরাট সভার আয়োজন ছিল। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নামজাদা সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর, রাজনীতিজ্ঞ মস্কোতে এসেছিলেন নভেম্বর-বিপ্লবের এই দশম-বার্ষিকী উৎসবে যোগদান করবার জন্তে। এতদিনে মানুষের সমাজ বোধ হয় মোড় ঘুরে একটা বিরাট সম্ভাবনার সূচনা করল এই আশা অরণির মতো সেদিন আলো জ্বালিয়ে ছিল প্রত্যেক দেশের মানুষের মনে। লোভ-লুণ্ঠন-হিংসার যে ঘূর্ণাবর্তে পড়ে মানুষ এগতে পারছিল না এত দিন সেই ঘূর্ণাবর্ত থেকে মানুষকে বের করেছিল নভেম্বর বিপ্লব। ভবিষ্যতের সেই সম্ভাবনাকে প্রাণের অকুণ্ঠিত ভালোবাসা জানাবার জন্তে প্রত্যেক দেশ থেকে মানুষেরা এসেছিলেন মস্কোতে। কী আশা, কী আলোকেই না নিবিয়ে দিল স্টালিনের সর্বনাশী অমানিশা! আমরা চেয়েছিলুম যে সেই উৎসবে ভারতবর্ষের তরফ থেকে জওহরলাল অভিনন্দন জানান নভেম্বর বিপ্লবকে। জওহরলাল প্রথমে রাজিও হয়েছিলেন কিন্তু বাধা দিলেন মোতিলাল। তিনি কিছুতেই জওহরলালকে বলতে দিলেন না সেই সভায়। ভারতবর্ষের হয়ে বললেন শকলৎওয়ালা আর হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। অপূর্ব বলেছিলেন শকলৎওয়ালা। হরীন্দ্রনাথ বলেই চললেন। লোকে অস্থির তাঁর বক্তৃতায়। বারবার ঘণ্টা বাজল তাঁর অসংলগ্ন ভাবুকতা থামাবার জন্তে। তিনি ক্রক্ষেপই করলেন না, বেপরোয়া বলে চললেন। শেষে অনেক কষ্টে থামানো হল তাঁকে। সেই মিটিংয়ে বললেন বারবুস, বললেন আরো অনেক সাহিত্যিক। থিওডোর ড্রাইজার আর লুনাচারস্কি—এরাও বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই সন্ধ্যার উৎসব সভায়। সেই অগুন্তি বক্তৃতার সমতল ভূমির উপর পাহাড়ের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল বারবুসের বক্তৃতা। যা বলতে চায় বক্তা সে সম্বন্ধে গভীর আন্তরিকতা, অসংশয় বিশ্বাস, স্বচ্ছ ধারণা ও প্রবল আবেগ—প্রাণের এই অলখ চার-স্বতোর বহুনি হচ্ছে প্রত্যেকটি সফল বক্তৃতা। বক্তার

বক্তৃতায় এরাই জোগায় রঙ, মাধুর্য ও গভীরতা। প্রচণ্ড মনন ও দহন ক্রিয়ার ফল যে কথা শুধু সেই সার্থক কথাই মানুষের মনের দখল নিতে পারে। কথার ছাই-ওড়ানো ডজন খানেক নিরর্থক বক্তৃতার পর প্রাণের আগুনের ফুলকি-ছড়ানো বারবুসের বক্তৃতা যে কী ভালো লেগেছিল তা বলবার নয়। বেশির ভাগ বক্তৃতা আমাদের বন্দী করে সাজানো কথার কারাগারে। আমার জীবনে খুব কমই এমন বক্তৃতা শুনেছি যা বর্তমানের বন্ধন থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছে, যে বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছে যে দিগন্তের শেষে যেখানে ভবিষ্যতের তরঙ্গ দুলে দুলে উঠছে, বর্তমানের এই ছোট নদী থেকে ভবিষ্যতের সেই উদ্বেল জ্যোতির্ময় তরঙ্গ-স্রোতে পৌঁছে দিয়েছে প্রাণসত্তা-বাণী আমার মানস-তরীকে। আমাকে সেই অনুভূতির মুক্তি দিয়েছিলেন বারবুস, তাই তাঁর সেই বক্তৃতা থেকে গেছে মনের মধ্য।

আরো দু-তিন দিন ধরে উৎসবের জের চলল। তারপর শুরু হল আবার সেই বাঁধা-গৎএর জীবন। এই উৎসবের আসরে যে কত লোকের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছিলুম তা বলা যায় না। প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ প্রফেসর স্কট নিয়ারিং, প্রফেসর হারিডেনা ক্লারা জেট্টকিন, আর্থার হোলিচার, ইনটারন্যাশনাল সংগীতের রচয়িতা প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে আলাপ হল। স্কট নিয়ারিং, হারিডেনা আর আমি এক হোটেলেই থাকতুম, তাই প্রায় রোজই আমাদের দেখা হত। কবি লংফেলোর নাতি ডেনা ছিলেন গল্পের রাজা, সত্যিকারের মজলিশী লোক। প্রায় রাত্তিরে আমাদের আড্ডা জমত, হয় তাঁর ঘরে, নয় আমার ঘরে। এমন দিন কিন্তু ছিল না যে দিন মজলিশে তর্কের ঝড় না উঠত আমাদের দুজনের মধ্যে, যা-কিছু দেখেছিলেন আর যা-কিছু শুনছিলেন তার কাছে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বুদ্ধ হারিডেনা। সোভিয়েট রাশিয়াকে তিনি দেখেছিলেন শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে। আর সেই রসের দৃষ্টিতে ভালো-মন্দের সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক বিচারের স্থানই ছিল না। আমার সংশয় ও সমালোচনা ক্ষেপিয়ে তুলল ডেনাকে। আমার সমালোচনাকে তিনি বুদ্ধির চঙ. বলে উপহাস করতেন। জবাবে আমি বলতুম নিবুদ্ধিতা যে বুদ্ধির চঙের চেয়ে কোন্ অংশে সেরা তার প্রমাণ কেউ কি কখনো পেয়েছে? স্কট নিয়ারিং প্রায়ই থাকতেন আমাদের মজলিশে।

সোভিয়েট শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁর লেখা বই যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল সেই সময়। নিয়ারিং ছিলেন ডেনার ঠিক উলটো। ডেনার উচ্ছ্বাস ছিল, গভীরতা ছিল না। তাঁর মনটা ছিল শিল্পীর মন তাই কথায় যা সমর্থন করতেন কাজে তার সমর্থনের প্রয়োজন বোধ করতেন না। প্রফেসর নিয়ারিংয়ের চরিত্র ছিল যেমন গভীর। তেমন সত্যনিষ্ঠ। কঠোর পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতেন তিনি, উচ্ছ্বাসের কাদার চিহ্ন আদবেই ছিল না তাঁর মুখে। ছিল সংযমের কঠোরতার চিহ্ন আর নিষ্ঠার অপ্রগল্ভ আলো। তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি কথায় ছিল জাগ্রত মনের পরিচয়।

মস্কোতে পৌঁছবার অল্পদিন পরেই টিকেলের ঘরে আমার দেখা হয় হেলেনা স্টাস্‌সোভার সঙ্গে। হেলেনা স্টাস্‌সোভা ছিলেন প্রথম যুগের বলশেভিকদের একজন। বিপ্লবের পরে ক্ষুদ্র কুড়োবার জন্মে যে-সব পঙ্গুপাল জড়ো হয়েছিল বলশেভিক পার্টিতে, তিনি সেই মতলবী দলের লোক ছিলেন না। তিনি যে শুধু বলশেভিকদের সেন্ট্রাল কমিটির সভ্যা ছিলেন তা নয়, বহুদিন তিনি সেন্ট্রাল কমিটির সেক্রেটারিও ছিলেন। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে বলশেভিক পার্টির সেন্ট্রাল কমিটি দলের কর্মী সম্মেলন ডাকে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কনফারেন্সে সেন্ট্রাল কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে যে পাঁচজন যোগদান করেছিলেন তার মধ্যে ছিলেন হেলেনা স্টাস্‌সোভা। আমি যখন তাঁর দেখা পাই তখন তিনি বৃদ্ধা, মাথায় সাদা চুল পুরুষালি ঢঙে ছোটো করে কাটা আর আঁচড়ানো, চোখে তাঁর পাঁশনে। বুদ্ধি আর কর্মশক্তি তাঁর মুখের প্রতিটি রেখায় আঁকা। ‘মোপার’ বলে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়া হয়েছিল পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের দুঃস্থ বিপ্লবীদের সাহায্য করবার জন্মে স্টাস্‌সোভা ছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানের কাণ্ডারী। মোপারের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে ব্রিটিশ শাসনের ভারতবর্ষের কারা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ও রাজনৈতিক কর্মীদের উপর অত্যাচার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্মে আমাকে অনুরোধ করলেন স্টাস্‌সোভা। স্টাস্‌সোভার সঙ্গে দেখা হবার কয়েকদিন পরে নলিনী গুপ্ত মস্কোতে এসে হাজির। নলিনী ছিলেন প্রথম কমিউনিস্ট বড়যন্ত্রের মামলায় প্রথম রাজবন্দীদের একজন। তিনি যখন মস্কোয় হাজির তখন এই আন্তর্জাতিক

কনফারেন্সে তাঁরই বলা উচিত এই মনে করে এই কনফারেন্সের বক্তা হিসেবে আমি প্রস্তাব করলুম নলিনীর নাম। স্টাস্‌সোভা তখন রাজী হলেন। হোটেলে ফিরে এসে নলিনীকে যখন জানালুম যে মোপরের কনফারেন্সে তাকে বক্তৃতা দিতে হবে তখন আমার প্রাণ বাঁচানো দাঙ্গা হল। জীবনে কখনো বক্তৃতা দেয় নি নলিনী। তা ছাড়া তার স্বাস্থ্যও তাকে বশে ছিল না আদর্শেই। একটু উত্তেজিত হলেই তার চোখ দুটি জোনাকির মতো দপ্‌দপ্‌ করে খুলত আর বুজত আর সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা থেকে যে ধ্বনি নির্গত হত তাকে ঠিক শ্রুতিমধুর বলা যায় না। আমার কথা শুনে বিছানায় শুয়ে পড়ে চোখের আর নাকের যে আশ্চর্য ম্যাজিক দেখাতে শুরু করল নলিনী তাতে বুঝলুম যে তার অবস্থা সত্যিই ঘায়েল। তাকে জব্দ করবার জন্য যে আমি স্টাস্‌সোভার সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করে আসি নি এইটে বুঝাতে আমারই স্বাস্থ্যের বিকার শুরু হবার দাখিল। নলিনীকে অনেক করে বুঝিয়ে শান্ত করলুম। শেষ পর্যন্ত রফা হল এই যে কনফারেন্সে সে বলবে বাংলায় আর তার দোভাষী হিসেবে আমি শুধু তর্জমা করব না, আসল বক্তৃতাটাই দেব। কনফারেন্সের দিন সন্ধ্যাবেলা নলিনী আর আমি যথা সময়ে হাজির হলাম কনফারেন্সের হলে। জার্মান, ইংরেজ, ফরাসী, চীনে, জাপানী, কোরীয়—কত দেশের বিপ্লব আন্দোলনের কত প্রতিনিধি সেখানে হাজির। আঠারোশো একাত্তর খৃষ্টাব্দের প্যারিস কম্যুনের এক কম্যুনার্ডও এসেছিলেন এই সভায়। শ্রমিক বিপ্লবের সেই প্রথম সূচনা প্যারিস কম্যুনের সময় থেকে কত আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে শ্রমিক-বিপ্লবকে চলে আসতে হয়েছে। উনিশশো সাতাশ সালের এই কনফারেন্সে সেই ছাপান বছরের এগনো-পেছনোর হার-জিতের ইতিহাস যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। দু-চারটি বক্তার পর ভারতবর্ষের প্রতিনিধি নলিনী গুপ্তের ডাক পড়ল। নলিনীর দোভাষী হিসেবে আমিও গিয়ে হাজির হলাম বক্তৃতা-মঞ্চে। নলিনী বক্তৃতা শুরু করল বাঙলায়। বক্তৃতার দু-চারটি কথায় আমার মনে হতে লাগল যে হাসিতে আমি কেটে পড়বো বোমার মতো। নলিনী যা বললে তার মর্ম হচ্ছে এই—এই যে শয়তান আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে জব্দ করবার জন্য সে আমার নাম দিয়েছে বক্তা হিসেবে। তোমরাও

যেমন সব বোকা, এই শয়তানের ফাঁদে পড়েছ। বুঝছ কিছু আমি কি বলছি? ছাই বুঝছ, বোকার মতো তো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছ আমার দিকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রকম বক্তৃতা নলিনী দিয়ে চলল মিনিট দশেক। তার পাশে দাঁড়িয়ে সেই সন্কেবেলা আমার আত্ম-সংঘের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেল। তার বক্তৃতা থামলে আমি প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষে জেলগুলির অবস্থা আর রাজনৈতিক কর্মীদের উপর যে কী অত্যাচার করে ব্রিটিশ শাসন সে সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলুম। পরদিন সকালে আমার বক্তৃতা নলিনীর বক্তৃতা হিসেবে ‘প্রাভ্‌দা’তে ছাপা হল। যারা জানে না তারাই শুধু বলে যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুষ্ক, নীরস। হাস্যরসের যে কী অফুরন্ত উপাদান রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ত জোগায় তার কোনো খবর যদি তারা রাখত! অবিশ্বি শুধু উপাদানই যথেষ্ট নয়, যে দেখে সে কোন চোখ দিয়ে দেখে—অতি গম্ভীর পেচকদৃষ্টি দিয়ে, না রস-দৃষ্টি দিয়ে তার উপরেই সবটা নির্ভর করে। স্টাস্‌সোভার অগ্ররোধে ‘ভারতে ব্রিটিশ-ব্রাস ব্যবস্থা’ নামক একটি পুস্তিকা আমি লিখেছিলুম এই সময়ে। পুস্তিকাটি প্রথমে রুশীয় ভাষায় ছাপা হয়, পরে ইউরোপে আরো দু-চারটি ভাষায় অনূদিত হয়ে বের হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় যতদিন ছিলুম ততদিন আমার যোগাযোগ ছিল হেলেনা স্টাস্‌সোভার সঙ্গে। ভারতবর্ষের দুঃস্থ বিপ্লবীদের সাহায্য করবার জন্য সব রকম সাহায্যের বন্দোবস্ত আমি করেছিলুম তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। সে-সব বন্দোবস্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কুট কারসাজির কল্যাণে ব্যর্থ হয়।

মস্কো থেকে আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দেবার জন্য মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রথম থেকেই উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিলেন। অবিশ্বি যুক্তি দেখাচ্ছিলেন যে কাজের জন্তে আমার তখনি দেশে ফিরে যাওয়া দরকার। আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলুম যে নিজেকে ভালো করে তৈরি না করে দেশে ফিরব না। আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে তৈরি হয়ে গেলেই কাজ হবে, নইলে স্টালিনের চেলাদের মতো হুকুমনামার জোরে কাজ করতে গেলে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সর্বনাশই করা হবে। আমার মনের কথা আমি সোজা হুজি জানিয়ে দিয়েছিলুম রায়কে। রায় চুপ করে শুনলেন বটে

আমার কথা কিন্তু চুপ করে রইলেন না। আমাকে মক্কা থেকে সরাবার জন্তে তাঁর চেষ্টা চলতে থাকল আগের মতোই। টিভেল, ফ্রায়ার, রাথবোন, লোহানী—এরা প্রত্যেকে বিষম উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল ভারতবর্ষের বিপ্লবের জন্তে। আমার তখনি দেশে ফিরে যাওয়া যে কত দরকারী সেটা এরা আমাকে বোঝাতে শুরু করলে সবাই মিলে। চুপ করে শুনে, কোনো জবাব না দিয়ে আমি এই মতলববাজদের বাজিমাৎ করলুম। যে চুপ করে থাকে অথচ নিজের সংকল্পের অটল ভূমি থেকে সরে যায় না তাকে আটকাবার চেষ্টা হাওয়ায় গেরো দেবার চেষ্টার মতই একেবারে নিষ্ফল। বুথারিনের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব কথা জানিয়েছিলুম। তিনি আমার কথায় পুরো সায় দিলেন। চার দিকের বিঘাত বিকলতার মধ্যে তাঁর সমর্থন ও উৎসাহ-দান আমাকে বাঁচিয়েছিল সেদিন। কমিউনিস্ট মতবাদ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্তে বুথারিনের সাহায্যে আমি ‘লেনিন কোর্স’ নামক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করি। মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্তে নানা দেশের কমিউনিস্টরা এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করতেন। আমি বছরখানেক ধরে ইতিহাস, অর্থনীতি, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও অনেকান্ত ভূতবাদ (ডায়ালেকটিকাল মেটেরিয়ালিজম্) অধ্যয়ন করেছিলুম এই শিক্ষা-নিকেতনে। এই শিক্ষা-নিকেতন পরিচালনা করত কমিন্টার্ন, তাই বুথারিনই ছিলেন এর প্রধান পরিচালক। মাঝে মাঝে বুথারিন, ইয়ারোশ্লাভস্কি, মোলোতভ্ প্রভৃতি বল্শেভিক নেতারা বক্তৃতা দিতেন এখানে। ইংরেজ, মার্কিন, জার্মান, ফরাসী, পোল, ফিন, বুলগার, চীনে, জাপানী, আরো নানা দেশের কমিউনিস্টরা এখানে বিপ্লবের বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতেন। আমরা সবাই থাকতুম একসঙ্গে একটি বিরাট বাড়িতে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলত আমাদের অধ্যয়ন, অধ্যাপকদের বক্তৃতা আর আমাদের আলোচনা। সন্ধ্যাবেলা আমরা বের হয়ে পড়তুম পথে, যেতুম বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে কিম্বা মিনেমায়। কখনো কখনো কারো একজনের ঘরে কয়েকজন মিলে মজলিশ জমাতুম। সহপাঠিনী মেয়েরা নাচত, আমরা গান গাইতুম হাততালি দিয়ে। মার্কসার কথা মনে পড়ে। সে এসেছিল পোল্যাণ্ড থেকে। সেখানে জেলে থাকবার সময় তার উপর অকথ্য অত্যাচার করেছিল পিল্‌হুড্‌স্কির পুলিশ। মনের দিক থেকে বেচারী

তার পরে আর হুস্থ হতে পারে নি। মারুসা প্রায়ই নাচত আমাদের আসরে। মাথায় রঙিন রুমাল বেঁধে সেকলে লোক সংগীত কিম্বা জিপসি গানের সঙ্গে সে নাচত। নাচতে নাচতে বদল হয়ে যেত তার মুখের ভাব, হঠাৎ নাচ বন্ধ করে মারুসা চলে যেত। সে দখল হারিয়ে ফেলেছিল নিজের মনের উপর। দ্বিতীয় বারে যখন মস্কো যাই তখন মারুসার খবর নিতে গিয়ে শুনলুম যে সে আত্মহত্যা করেছে বছর খানেক আগে।

‘লেনিন শিক্ষা-নিকেতনে’ ঢোকবার কয়েক দিনের মধ্যেই আমি এক আধির সৃষ্টি করে বসলুম। শনির দৃষ্টি আমার উপর নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আমার জন্ম যে আধি-লগ্নে সে বিষয়েও আমার কোনো সন্দেহ নেই। এতটা জীবন ধরে দেখছি যখনই কিছু বলছি বা করছি অমনি বাড় ফুঁসে উঠছে চারদিকে। সেবারও ত্রুঙ্ক ঝড় গর্জে উঠল আমাকে ঘিরে। যে ঘটনা আধির সৃষ্টি করল সেটি হল এই : ট্রট্‌স্কির কার্য-কলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্তে একদিন সভা ডাকা হল আমাদের শিক্ষা-নিকেতনে। তখন স্টালিন বল্‌শেভিক পার্টি থেকে ট্রট্‌স্কিকে সরিয়ে দেয়নি। ট্রট্‌স্কির বিরুদ্ধে এক তরফা মিথ্যে প্রচার স্টালিন তখন পুরোদমে চালিয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যত ট্রট্‌স্কির মতের সমর্থক ছিল তাদের ছত্রভঙ্গ করে দূরে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছিল স্টালিন। স্টালিনের গ্যাশানাল সোশালিজিমের বিরুদ্ধে লেনিনগ্রাডে বল্‌শেভিক দলের বেশির ভাগ সভ্য ভোট দিয়েছিল ট্রট্‌স্কির মতের সমর্থনে। হেরে যাবার পর থেকেই লেনিনগ্রাডের পার্টি কমিটির সেক্রেটারি থেকে শুরু করে যে যে তার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করেছিল স্টালিন তাদের কাউকে সুইবেরিয়ায়, কাউকে উরালে, কাউকে সুদূর ভ্লাডিভস্টকে পাঠাতে শুরু করল। তিন মাস বাদে আবার পার্টি কন্ফারেন্স ডাকা হল লেনিনগ্রাডে। এবার জয় হল স্টালিনের। পার্টির যন্ত্র সম্পূর্ণ হাতে থাকায় এমনি করেই নির্মম ত্রাস সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে দলে যে বহুমত ছিল তাকে স্টালিন তার স্বপক্ষের বহুমতে পরিবর্তিত করেছে। এই হল সোভিয়েট জন-সাধারণের স্টালিনের স্বপক্ষে থাকার ইতিহাস। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম জঘন্য পাশবিক ত্রাসের উদাহরণ আর একটিও নেই। ক্ষমতালু্ক স্টালিন যে শুধু নভেম্বর-বিপ্লবের পুরোযায়ী লেনিনের সহকর্মীদের সম্পূর্ণ

মিথ্যে দোষারোপ করে হত্যা করল তা নয়, হাজার হাজার বিপ্লবীদের হত্যা করল, অসংখ্য বিপ্লবীদের কারাগারে আর নির্বাসনে পাঠাল শুধু এই অপরাধে যে তারা স্টালিনের গ্যাশানাল-মোশালিজমকে মেনে নিতে পারে নি, তারা লেনিনের শেখানো বিশ্ব-বিপ্লবের পথ ধরে চলতে চেয়েছিল।

ভারতবর্ষে যখন ফিরে এলুম দেখলুম যে ড্রইংরুমের ইন্টেলেক্‌টুয়ালদের মধ্যে স্টালিনের খ্যাতির গ্রেটা গর্বের চেয়ে কম নয়। একটু তলিয়ে দেখতেই তার কারণটা বুঝলুম। এই ইন্টেলেক্‌টুয়ালেরা গ্যাশানাল-মোশালিজমের সমর্থন করতে পারে, কমিউনিজমের সমর্থন কখনই করতে পারে না। তাই লেনিন আর ট্রটস্কির নাম শুনেই যারা ভয়ে বিদ্বেষে আত্মহারা হত তারাই রাতারাতি স্টালিনের মহা-ভক্ত হয়ে উঠেছিল। এরা বুঝেছিল যে, ত্রাসের যে বন্ধ্যা স্টালিন বইয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ায় সেটা সেখানকার জনসাধারণের বিরুদ্ধেই বইছে। এরা সহজেই ধরতে পেরেছিল যে স্টালিন জনগণের শত্রু। ভারতবর্ষের এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিতেরা মনে-প্রাণে জনসাধারণের বিদ্বেষী হওয়ায় স্টালিনের উপর তাদের ভক্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যে নকশামাফিক সোভিয়েট রাষ্ট্রকে সাজাচ্ছিল স্টালিন সে নকশায় তাদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। তারা ঠিকই বুঝেছিল যে এই নকশা-মতো যদি কাজ হয় ভারতবর্ষে তা হলে তারা যে শুধু বেঁচে যাবে তা নয় রাষ্ট্র-পরিচালনার যন্ত্র দখল করে তারা নিংড়ে শুষে নিতে পারবে জনসাধারণকে। তাই স্টালিনের উপর এত অনুরাগ ভারতবর্ষের ইন্টেলেক্‌টুয়ালদের। অবিশিষ্ট ঐতিহাসিক কিংবা সামাজিক কারণ ছাড়াও আরো একটি কারণ ছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় স্টালিনবাদী হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর নেকনজরে তোফা আরামে থাকা যেত। তখন পুলিশ অফিসার, সি. আই. ডি., গভর্নমেন্টের কর্মচারীরা সবাই স্টালিনবাদী। এই কারণেই ড্রইংরুমের এই বুদ্ধিজীবীরা স্টালিনের পূজারী হয়েছিল ঝাঁকে ঝাঁকে। কোনো কিছুর দিকে ঝুঁকে পড়বার আগে ড্রইংরুমের এই বাসিন্দেরা ভালো করে দেখে নেয় যে সেটা নিরাপদ কিনা। ক্যাশানটা নিরাপদ না হলে কি চলে!

আবার সেই মিটিংয়ের কথায় ফিরে যাই। সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন একজন অস্ট্রেলীয় কমিউনিস্ট। ট্রটস্কির কার্যকলাপ যে কত

থারাপ বলশেভিক দলের সেন্ট্রাল কমিটি যে ট্রটস্কির আচরণের তীব্র নিন্দে করেছে সে কথা তিনি শুনিয়ে দিলেন আমাদের। এক কথায় তিনি মূল গায়েন হয়ে কীর্তনের সুরটা ধরে দিলেন আর আমাদের ইঙ্গিত করে জানিয়ে দিলেন যে মূল সুরের দিকে লক্ষ্য রেখে আখর দিতে হবে। তাঁর ইঙ্গিত ব্যর্থ হল না। একজনের পর একজন বক্তা শুরু করল ট্রটস্কির শ্রাদ্ধ। সুর চড়েই চলল। একজন যদি বলে ট্রটস্কি ভুল করেছেন আর একজন বলে ট্রটস্কি ঘোর অগ্রায় করেছেন। একজন বলে ট্রটস্কি সোভিয়েটের শত্রুতা করেছেন, অমনি আর একজন বলে ট্রটস্কি জনগণের শত্রু। বুঝলুম এ-সব হচ্ছে চাকুরীদের বক্তৃতা। বক্তৃতাগুলো মনিবের কানে পৌঁছে চাকরি যাতে বহাল থেকে সেই উদ্দেশ্যে এদের বক্তৃতা দেওয়া। এদের বক্তৃতা আমাকে যেমন লজ্জা দিল তেমনি রাগিয়েও দিল। এই হল কমিউনিষ্টের নমুনা! যারা নিজেদের সুবিধে করে নেওয়ার জন্তে এই ধরনের স্তাবকতা করতে পারে তারা আনবে বিপ্লব মানুষকে মুক্তি দেবার জন্তে, তারা রচনা করবে নয়! ছুনিয়া! এদের আচরণ আমাকে এতটা ক্ষুব্ধ না করলে সেই সভায় আমি যা বলেছিলুম খুব সম্ভব আমি বলতুম না সে-সব কথা। তখন মাত্র কয়েক মাস হল আমি সোভিয়েট রাশিয়ায় গেছি। স্টালিনের চতুর অপপ্রচারের হৃদিশ আমি তখনো পাইনি ঠিক করে। স্টালিনের অপপ্রচারের ফলে আমারও মনে তখন এই ধারণা হয়েছিল যে ট্রটস্কি দলের শৃঙ্খলা নষ্ট করেছেন। তিনি দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। এই ঘটনার অনেক পরে স্টালিনের আসল চেহারাটা ধরতে পেরেছিলুম। দলের মধ্যে স্বমত প্রকাশের যে অবাধ স্বাধীনতা ছিল লেনিনের আমলে, সেই অধিকার কেমন করে হরণ করেছে স্টালিন। কী অবর্ণনীয় ভ্রাস সৃষ্টি করে এক-রঙা মত ও তাঁবেদারী আত্মগত্যা সৃষ্টি করেছে স্টালিন বলশেভিক দলে আর সোভিয়েট নাগরিকদের মধ্যে। সে-সব সম্বন্ধে আমার চোখ ফুটেছিল এই ঘটনার অনেক পরে। তাই সেদিনের মিটিংয়ের ঘটনার জন্তে দায়ী ছিলুম না আমি, দায়ী ছিল যো ছকুম তাঁবেদারেরাই! আমার বক্তৃতায় আমি বলি যে, ট্রটস্কি সোভিয়েটবিরোধী, জনগণের শত্রু—এই-সব কথা যারা বলছে তারা নিজেদের বলশেভিকদের চেয়েও ভালো বলশেভিক এইটে দেখাবার জন্তে

বলছে। যে লোক তাঁর সারাটা জীবন সোশালিষ্ট বিপ্লবের জন্তে কাজ করেছেন, লাল সেনাবাহিনীর সৃষ্টি করে বিপ্লবকে সফল করেছেন ও বিপ্লবকে বাঁচিয়েছেন ঘরের ও বাইরের শত্রুদের আক্রমণ থেকে, সে লোক জনগণের শত্রু, সোভিয়েট-বিরোধী একথা নিঃসংশয় প্রমাণ না পেয়ে কারো বলা উচিত নয়। ট্রট্‌স্কি ভুল করতে পারেন কিন্তু জনগণের ও সোশালিষ্ট-বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা তিনি কখনো করতে পারেন না। আমার বক্তৃতার পর সভার সভাপতি আমাকে শুনিয়ে দিলেন যে এ ধরনের মত কমিউনিষ্টদের মধ্যে কিছুতেই থাকতে পারে না সেটা যেন আমি ভালো করে বুঝে নিই। তাঁর তাঁবেদারী মন এটা কল্পনাই করতে পারে নি যে হুকুম দেবার পরেও তার স্বর মিলাতে কেউ অস্বীকার করতে পারে। তিনি কিন্তু মারাত্মক ভুল করলেন। তাঁর ধমকানির ফল হল এই যে আরো জোরের সঙ্গে আমি আমার মত আবার ব্যক্ত করলুম। সভার আবহাওয়া থমথমে হয়ে গেল। কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে এ রকম অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। উপর থেকে হুকুম আসবে আর সেই হুকুম-মতো বাঁধা গৎএর বক্তৃতা হবে, কর্তাদের ঠিক-করে দেওয়া প্রস্তাবগুলো পাস করা হবে, এই তো সবাই জানে স্টালিনের আমলে যে কোন সভার বাঁধা-ধরা তাঁবেদারী চেহারা। এই নিশ্চিত ব্যবস্থার নিশ্চল জলে সমালোচনার ঢিল মেরে কম্পন জাগালো কোন মূর্থ! ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না। আমার বেয়াদবির সব খবর জানানো হল কমিন্টার্নে, আমাকে তলব করা হল জবাবদিহি করতে। নলিনী এল, মুখে তার উৎকর্ষার ছাপ। আমার একগুঁয়েমির জন্তে আমাকে ভৎসনা করল, বললে রায় বলেছে যে আমি গুরুতর অপরাধ করেছি। আমি যা বলেছি এ রকম কথা সোভিয়েট রাশিয়ায় বলা চলে না। বললেম—যদি না চলে তো চলবে না। আমি নিরুপায়, কারো মন জুগিয়ে কথা বলবার অভ্যাস আমার নেই। সোভিয়েট রাশিয়ায় এসেছি কমিউনিজমের উপর পূর্ণ আস্থা নিয়ে, কারো মন জুগিয়ে কথা বলবার জন্তে নয়। যুক্তির জায়গায় না মানি ভক্তির ভনিতা, না মানি হুকুমের হুমকি। আর এই যুক্তিহীন জবরদস্তির নাম আর যাই হোক কমিউনিজম্ নিশ্চয় নয়। নলিনী মাথা নেড়ে বললে—তবুও যখন সোভিয়েট রাশিয়ায় রয়েছি তখন ভেবেচিন্তে কথা বলাই ঠিক। রিয়ালিস্ট বন্ধুর এই স্ববুদ্ধির

পরামর্শ আমি মেনে নিতে পারলুম না। কমিন্টার্নের কন্ট্রোল কমিশনে যথাসময়ে জবাবদিহি দিলুম। পার্টির মত যে সব সময়ে নিভুল আর সেটা যে বিনা ওজরে মেনে নেওয়া উচিত এই উপদেশ পেলুম কর্তাদের কাছ থেকে। ব্যাপারটা এবারে এইখানেই শেষ হয়ে গেল। আবার বিপদে পড়লুম, কিন্তু এবারে ব্যাপারটা সরকারী মহলে পৌঁছলো না। ঘরোয়াই থেকে গেল। ফ্রায়ার-দম্পতির সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে একদিন লেনিনের মাণ্ড-সেলিয়ামের কথা উঠল। আমি বললেম—মৃতদেহকে মমি করে রেখে লোক জমানোর খেলা হচ্ছে ম্যাজিক আর এই ধরনের ম্যাজিকের বিরুদ্ধে লড়াই কমিউনিজমেও বহুমুখী লড়াইয়ের একটা জরুরী দিক। লেনিনের মৃতদেহটিকে ছাই করে ফেলা উচিত। এ রকম মমি বানিয়ে রেখে আমরা লেনিনকে আর কমিউনিজমকে অপমান করছি। ফ্রায়ার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন—ওসব আমরা জানি, কিন্তু বিপ্লবের অগ্রগতির জন্তেই এটা দরকার। আর বিপ্লবের কাজের জন্ত যা-কিছু দরকার সব আমরা করব—তা ম্যাজিকই হোক আর যাই হোক। বললেম—লেনিনের মৃতদেহকে মমি বানিয়ে রাখার ফলে বিপ্লবের কাজ এগোচ্ছে এ কথা আমি আদবেই মানতে রাজী নই। বিপ্লবের সব চেয়ে বড়ো কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে মুক্তি দেওয়া অন্ধতা থেকে, কুসংস্কার থেকে। কুসংস্কারকে আঘাত করা দূরে থাকুক, আমরা তাকে জিইয়ে রাখছি এই উপায়ে। মানুষের মনের যে অন্ধতার সুযোগ নেবার জন্তে আমরা লেনিনের মৃতদেহকে মমি বানিয়েছি সে অন্ধতাকে দূর করতে না পারলে কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করা কখনো সম্ভব হবে না। আমাকে বিদ্রূপ করে ফ্রায়ার বললেন, অত গভীর জ্ঞানের কথা আমাদের মাথায় ঢোকে না। আমরা মনে করি লেনিনের মৃতদেহ রক্ষা করে আমরা জনসাধারণকে ধরে রাখতে পারব বিপ্লবের পথে। অতএব যে যাই বলুক আমরা যা দরকার মনে করি তা-ই করে চলব। তা ছাড়া ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমরা যে প্রচণ্ড অভিযান চালাচ্ছি সেটা কি আপনার চোখ পড়ে না? বললুম, পড়ে বৈকি, পোস্টার্স কার্টুন সবই চোখে পড়ে। তবে সেগুলো তো একতরফা চলছে। এই মমিপূজা নিয়ে কার্টুন করবার অধিকার আপনারা অন্যদের দেবেন কি? আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে একটা পুকুরের পচা

জল নালা কেটে অন্য এক পুকুরে নিয়ে ফেললে জলটা শুষ্ক হয়ে যায় তা' হলে ভয়ানক ভুল করছেন। এতে শুধু আধারটাই বদলানো হয়, বস্তুটি আগে যা ছিল তাই থেকে যায়। আপনারা ঠিক তাই করছেন। সর্বনেশে ভুল করেছেন যদি ভেবে থাকেন যে কুসংস্কারকে আঘাত করেছেন শুধু আধার বদল করে। তর্ক ক্রমশই তেতে উঠছিল। চায়ের গেলাস, রাইয়ের রুটি মাখন, ক্যাভিয়ার সামনে ধরে দিয়ে ফ্রায়ার-জায়া উত্তাপটাকে চালিত করলেন রসনার দিকে। মেয়েরা কলহের আগুন জ্বালতে যেমন নিপুণা, কলা-কৌশলে নিবতেও তেমনি দক্ষ। স্বভাব-গুণে তাঁরা কিন্তু প্রথম কাজটাই বেশি করে থাকেন।

নানা মিটিং আর কন্ফারেন্সে যোগদান করার ফলে আর একট জিনিসও আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, প্রত্যেকটি মিটিংয়ে দেখলুম নিজের মত হিসেবে কেউ কোনো কিছুই বলছে না। কিছু একটা বলার পরেই প্রত্যেক বক্তা নিজের মতের সাফাইয়ে 'লেনিন বলেছেন' বলে লেনিনের লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছে। একটি মতের সমর্থনে যিনি বলছেন তিনি যেমন লেনিনের দোহাই দিচ্ছেন, বিরুদ্ধে যিনি বলছেন তিনিও ঠিক তেমনি দোহাই দিচ্ছেন লেনিনের। বুঝলুম লেনিনের মতামতকে এরা শাস্ত্র করে তুলেছে, আর অন্য সব শাস্ত্রের মতো এই শাস্ত্রের বাধা তুলে বিচারের জলন্ত স্রোতকে রুদ্ধ করবার জন্তে তারা উঠে পড়ে লেগেছে। প্রত্যেকটি সভায় দেখলুম যে লেনিনকে এরা খাড়া করছে লেনিনের বিরুদ্ধে। বুঝলুম স্টালিনের ত্রাস-ব্যবহার ফলে নিজের মত ব্যক্ত করবার সাহস এরা হারিয়ে ফেলেছে। তাই লেনিনকে ব্যবহার করছে এরা বর্মের মতো স্টালিনের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্তে। সমস্ত বিচার-শক্তি নিঙড়ে নিয়ে মানুষকে যন্ত্র বানাবার জন্তে স্টালিনের এই বীভৎস চেষ্টা সোভিয়েট রাশিয়ার বাসিন্দাদের পক্ষে যে কী মারাত্মক হয়েছে তা এদের জীবন কাছে থেকে যে না দেখেছে সে বুঝবে না। কখন যে স্টালিনের গোয়েন্দা পুলিশ 'গেপেয়' এসে কাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে তা কেউ জানে না। তাই এরা নির্বাক হয়ে গেছে ভয়ে। এদের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায় যে এরা যেন প্রাণ খুলে কথা বলছে না, এড়িয়ে যাচ্ছে অনেক কিছু। গভর্নমেন্টের সামান্য সমালোচনা করবার আগে এরা চারদিকে তাকিয়ে দেখে নেয় কেউ শুনছে কি না। এক সঙ্গে-

বেলার কথা আমার এখনো মনে আছে। এক সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলুম, বন্ধু-পত্নী গায়ের মেয়ে, অতি সাদাসিধে, ঘরকন্না নিয়ে থাকেন, রাজনীতির ধার ধারেন না। সাহিত্যিক বন্ধুটি কমিউনিস্ট মন, কিন্তু জানতেন যে আমি কমিউনিস্ট। আলাপের কিছুদিন পরে আমিই সেটা জানিয়ে দিয়েছিলুম তাঁদের। কথায় কথায় আমি বন্ধুজায়াকে জিজ্ঞেস করলেম—কেমন, মনের খুসিতে আছেন তো? তিনি সরল মানুষ, সোজাসৃজি বলে বসলেন—স্টালিনের অত্যাচারে কেউ আরামে থাকতে পারে? উত্তর শুনে আমি হেসে তাকালুম আমার বন্ধুর দিকে। দেখলুম, তাঁর মুখ থেকে শেষ রক্ত-বিন্দু যেন চুঁয়ে পড়ে গেছে, মুখ একেবারে সাদা। বুঝলুম তাঁর স্ত্রীর ভাগ্যে কী আছে এই ভেবে তিনি ভয় পেয়েছেন। নিশ্চয়ই ভেবে নিয়েছেন যে কমিউনিস্টদের সামনে এ কথা বলে ফেলেছে, আর রক্ষে নেই। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললুম যে আমি যে কমিউনিস্ট সে কথা তো আমিই বলেছি তাঁদের, কিন্তু আমাকে স্টালিনের ‘গেপেয়ু’ ভাবলে তাঁরা আমার উপর অবিচার করবেন। বন্ধু-পত্নীকে পরিহাসে বলে বললুম—দেখলেন তো আপনার স্বামীর অবস্থাটা আপনার কথা শুনে? অন্য লোকের সামনে এ ধরনের কথা কখনো বলবেন না। সোভিয়েট রাশিয়ায় থাকার সময় এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার বারবার হয়েছে। নিদারুণ ভ্রাসের অবাধ ব্যবহার করে স্টালিন যে কেমন করে গুঁড়িয়ে দিয়েছে মানুষের মনুষ্যত্বকে তার মর্যাস্তিক নমুনা চাষী, মজুর, ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, লেখক—এক কথায় সোভিয়েট সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মধ্যে প্রায় দুবছর ধরে দেখেছি। তখন বুঝেছি লেনিনের ও আরো শত শত সত্যনিষ্ঠ বিপ্লবী কর্মীদের নতুন মানব-সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জীবনপন কঠোরতম সাধনাকে কেমন করে ব্যর্থ করে দিয়েছে স্টালিনের মানবতা-বিরোধী অন্ধ অহুদার ক্ষমতা-লোলুপ হিংস্রতা।

রুশীয় ভাষাটা কয়েক মাসেই চলনসই রকমের আয়ত্ত করে নিয়েছিলুম। এবারে আমি রুশীয় সাহিত্য পড়তে শুরু করলুম। শুধু সোভিয়েট আমলের লেখকদের লেখা পড়ে অপূর্ব রুশীয় সাহিত্যকে অপমান করবার চেষ্টা আমি করি নি। তিনজন কাল্পনিক বীরের জীবন নিয়ে বহু শতাব্দী আগে অনেক ছড়া রচিত হয়েছিল। রুশীয় সাহিত্য এই ছড়াগুলো ‘বিলীনা’ নামে

পরিচিত। সেই বিনীনাগুলো পড়লুম, দু-একটি অনুবাদও করেছিলুম। আমার সমস্ত বই খাতাপত্র যখন নাৎসিরা নষ্ট করে দেয় বার্লিনে তখন অনুবাদগুলি নষ্ট হয় তারি সঙ্গে। আমাদের ‘পঞ্চতন্ত্র’ আর ইউরোপের ‘ঈশপ্স ফেবলস্’-এর মতো রুশীয় সাহিত্যেও এই ধরনের আখ্যানগুলির একটি সংকলন আছে। এই আখ্যানগুলিকে ‘বাসনি’ বলে। ক্রিলভের লেখা এই বাসনিগুলি জানে না এমন কোন লোক রাশিয়ায় আছে কিনা সন্দেহ। ‘বাসনি’ ছাড়াও গ্রাম্য ছড়া, গ্রাম্য-গীতি, নানা পালাপার্বনের কবিতা ও গান, রূপকথা সংগ্রহ করে পড়ে নিলুম। তারপর শুরু করলুম রাশিয়ার বিখ্যাত কবিদের কাব্যপাঠ। এত চমৎকার দরদভরা সব কবিতা পড়লুম যে এগুলো অজানা থেকে যাবে আমাদের দেশে এটা অসহ্য বোধ হল। মরিয়া হয়ে লেগে গেলুম অনুবাদের কাজে। স্বরার সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে অনুবাদ করা কখনো সম্ভব হত না। মস্কোতে পৌঁছবার মাসখানেক পরে একজন ভারতীয় বন্ধু একটি রুশীয়া মহিলাকে নিয়ে আসেন একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন বলে। মেয়েটির পরিচয় দিয়ে বললেন—এঁর নাম স্বরা। একজন বাঙালী কমিউনিস্ট উনিশ শো পঁচিশ সালে মস্কোয় ছিলেন, তাঁর স্ত্রী ইনি। স্বামীর খবর জানবার জন্তে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এই বাঙালী কমিউনিস্টকে আমি খুব ভালো করেই জানতুম। বাঙলা দেশের একটি টেরারিস্ট দল তাঁকে মস্কোয় পাঠিয়েছিল। মস্কোয় মাস দশেক থেকে তিনি দেশে ফিরে যান। দেশে ফিরে আসবার কিছু কাল পরে আমার আলাপ হয় তাঁর সঙ্গে, আমিই তাঁকে টেনে নিই বঙ্গীয় ‘শ্রমিক-কৃষক’ দলে। দেশ ছাড়বার দু-এক দিন আগেও তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। স্বরার কথা কিন্তু তিনি আমাকে একবারও বলেন নি। যতটা খবর জানতুম সব জানালুম স্বরাকে। তাঁর বাড়িতে যাবার জন্তে আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি চলে গেলেন।

শহরের এক প্রান্তে একটি নিরালা রাস্তায় কাঠের তৈরি একতলা বাড়ির একটি ঘরে স্বরা থাকতেন তাঁর বৃদ্ধা মা আর দু বছরের মেয়ে নিয়ে। স্বরার মা ছিলেন খুব অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। জারের আমলের বহু বিপ্লবী তাঁর পিতার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছেন। তাঁদের

বাড়িতে আশ্রয়ও পেয়েছেন। এখন অতি কষ্টে এঁদের দিন কাটে। শিশুদের একটি কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষা দিয়ে সূরা যেটুকু পেতেন তারি স্বল্প উপার্জনে তাঁদের সংসার চলত। থাকবার ঘরটি যেমন সাঁাতসেঁতে তেমনি অন্ধকার। এত দারিদ্র্যের মধ্যে থাকতেন, তবু একদিনের জন্তেও বৃদ্ধার মুখে বিরক্তির লেশমাত্র চিহ্ন দেখিনি, তাঁর অন্তরের আভিজাত্য হার মানেনি বাইরের আঘাতের কাছে, দু'বছরের জয়চ্চাকে নিয়ে সূরা এগিয়ে এলেন। জয়চ্চকার কালো চোখ, কালোচুল, শামলা রঙ দেখে বুঝলুম এখানে বাঙলা হার মানিয়েছে রাশিয়াকে। মস্কোতে যতদিন ছিলুম সূরাকে বন্ধুরূপে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলুম। এমন মেয়ে যে-কোনো দেশে বিরল। যেমন গম্ভীর তেমনি আলোয় ভরা ছিল তার মন খানি। অর্ধাহারে অনাহারে শরীর ক্লশ কিন্তু তার ক্লান্ত মুখে এক দিনের জন্তেও করুণাভিষ্কার দাবি দেখি নি। কত ঝড়ের কত ঝাপটা জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে, শিশুকে নিয়ে, বৃদ্ধা মাকে নিয়ে একলা বহন, করতে হয়েছে সংসারের সব দাবি কিন্তু কখনো আত্ম-করুণার সর্বনাশী মোহে মজেননি এই মেয়েটি। সূরা প্রায়ই আসতেন আমার কাছে। দুজনে বসে রুশীয় কবিতা পড়তুম। তিনি নানা কবির কবিতা ও গ্রাম্য ছড়া আমাকে পড়ে শোনাতেন, শুনতেন আমার মুখ থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা কতদিন বরফ-ঢাকা বুলভার দিয়ে দুজনে বেড়াতে গেছি বিকেল বেলা।

আমার মনের মধ্যে তখন স্বন্দ চলছে। অনেক কিছু দেখেছিলুম শুনেছিলুম যা আমার পক্ষে মনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। আঘাত পাচ্ছিলুম অথচ কারো কাছে নিজের মনের সংশয় মেলে ধরবার উপায় ছিল না। রাজনৈতিক ত্রাসের এমনি গুমট সৃষ্টি করে রেখেছিল স্টালিন। সেই কুটিল বিধাক্ত আবহাওয়ায় দুটি মাত্র লোক ছিল—সূরা আর লিও—যাদের কাছে মন উজাড় করে সব কথা আমি বলতে পারতুম। এই দু'জনের বন্ধুত্ব আমাকে বাঁচিয়েছিল সেদিন। আমার সমালোচনায় যে তারা সব সময়েই সায় দিত তা নয়, কিন্তু আমাকে তারা ভুল বোঝে নি কখনো। কমিউনিজমকে যে আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছি সে বিষয়ে এদের মনে কোনোদিন সংশয় জাগে নি। কত দিন আমার মনের ঝড় আমাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছে লিও কিম্বা সূরার কাছে।

ঘরের মধ্যে কখনো পায়চারি করেছি, কখনো বসছি, পাগলের মতো বলে গেছি নিজের মনের দ্বন্দ্বের কথা। আমার সব দৌরাখ্যা ওরা দু'জনেই পরম প্রীতির সঙ্গে সহ্য করেছে। মনে পড়েছে লিওর কথা। তার ছোট ঘরটিকে বই-ঘর বললেই চলে। চৌকির উপর, বিছানার উপর, মেঝেতে, টেবিলে চারদিকে বই ছড়ানো। সেই ঘরে আমি গিয়ে হাজির হতুম ঝোড়ো অশান্তির মতো। তাড়াতাড়ি চৌকি থেকে বইগুলোকে ধুপধাপ মাটিতে ফেলে লিও বসতে দিত আমাকে। পুরু লেনসের চশমার মধ্যে দিয়ে আমার দিকে সে এমন করে তাকাত যেন আমার মনের ঘূর্ণির জন্তে সেই অপরাধী। আমার একরোখা মনের সমালোচনার শ্রোত পাছে কুল ছাপিয়ে যায় এই জন্তে তার উৎকর্ষ অস্ত ছিল না। শহরের বাইরে বনে আমরা কতদিন বেড়াতে গেছি দু'জনে। আলো-ছায়ার আলপনা-আঁকা ঘাসের উপর বসে চলত আমাদের আলাপ। সে আলাপ কখনো বাঁধানো সড়কের পথ ধরত না। পারে-চলা পথের মতো মনের যে আঁকা-বাঁকা পথ সেই পথ ধরে যেত আমাদের খেয়ালী আলাপ। উনিশো ত্রিশ সালে দ্বিতীয়বার যখন মস্কো যাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তখন আবার দেখা হল লিওর সঙ্গে। দু'বছরের মধ্যে তার আশ্চর্য বদল দেখলুম। মুখে তার গভীর ক্লান্তি আর অবসাদ। স্টালিনের ক্ষমতালোলুপতা তৃষ্ণার্ত মরুভূমির মতো বিপ্লবের শ্রোতকে প্রায় শুষ্ক নিয়েছে তখন। জোয়ারের জল নেমে গেলে শ্যাওলা-পড়া ভাঙা ঘাটের যে রকম শ্রীহীন চেহারা বের হয়ে পড়ে, রাশিয়ার চেহারা সেই রকম দেখলুম উনিশো ত্রিশ সালে। ক্ষমতা-লোলুপ মানুষ যে কী ভয়ংকর হিংস্র হতে পারে, কি রকম নিপুণ নির্মমতার সঙ্গে সে দলের আর রাষ্ট্রের মধ্যে তার বিরুদ্ধ মতবাদীদের দলের ও রাষ্ট্রের বিরোধী বলে চালিয়ে দিতে পারে ও সেই অপবাদ দিয়ে নির্বাসনে পাঠাতে পারে, হত্যা করতে পারে সে সম্বন্ধে কারো কোনো ধারণাই হতে পারে না যে স্টালিনের রাহুগ্রস্ত সোভিয়েট রাশিয়ায় কিছুদিন কাটিয়ে না এসেছে। অবিশিষ্ট পিঠে হাত বুলুনির সোহাগে মনের চোখ যদি একেবারে বন্ধ হয়ে যায় তাঁদের মনের মতো ঝাঁরা স্টালিনের সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান 'ভক্সের' আমন্ত্রণে এই সেদিন সোভিয়েট রাশিয়ায় গেছেন, তা হলে নিরুপায়। সোভিয়েট রাশিয়ায়

পৌছানোর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা যে-ধরনের নির্বোধ ও নির্লজ্জ প্রচার শুরু করেছেন তার থেকে এইটেই বোঝা যাচ্ছে যে খতিয়ে দেখবার মতো ধৈর্য আর সত্য কথা বলবার মতো সাহস এঁদের নেই। অবিশ্রি তার জন্তে এঁদের দোষ দেওয়া যায় না, কেন না ধৈর্যে কিম্বা সাহসের পরিচয় দেশে থাকতেও কখন দেননি এঁরা, আর তার জন্তে এঁরা যানও নি সোভিয়েট রাশিয়ায়। সোভিয়েট রাশিয়ায় যে দিনগুলি কাটিয়েছি সে ভোলবার নয়। যখনই সেই দিনগুলোর কথা ভেবেছি তখনই লিওর সেই আলো-নিবে-যাওয়া মরা মুখ ভেসে উঠেছে আমার মনে। লিওর মুখেই আমি দেখেছি আত্ম-প্রতিষ্ঠালোলুপ স্টালিনের হিংস্র বর্বরতার আঘাতে রক্তাক্ত, ত্রাসের পাশবিক আঘাতে পিছু-হটে-যাওয়া রুশীয় বিপ্লবের মর্যাস্তিক ট্রাজেডির ছবি।

আমার জিদ যেমন আমার ভালোও করেছে অনেক, ক্ষতি কিছু কম করে নি। জিদের একটা নেশা আছে সে নেশার দুর্বলতা থেকে নিজেকে বাঁচাতে না পারলে শুধু যে জীবনের বারমহলে ক্ষতি হয় তা নয়, সর্বনেশে ক্ষতি হয় মানুষের মনুষ্যত্ববিকাশের।

আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা জিদের রূপ নিশ্চয়ই নেয় কিন্তু সব জিদই এই নিষ্ঠার ব্যঙ্গনা নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জিদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে অহংকার। জিদের রূপ নিয়ে অহংকার বারে বারে ছলনা করে মানুষকে, ভুল বোঝাতে থাকে—বোঝাতে থাকে যে এই জিদ হচ্ছে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার অভিব্যক্তি। আসলে এটা কিন্তু ভয়ংকর ছলনা। অহংকার যে কত রকমে নিজেকে পরিতৃপ্ত করে, কত সাজে যে হাজির হয় আমাদের কাছে। কখনো আসে আদর্শের উপর নিষ্ঠার অবগুণ্ঠনে নিজেকে ঢেকে, কখনো আসে বিনয়ের ছদ্মবেশে, কখনো আসে পোশাকী দীনতার ঝুটো সাজে। আমার মধ্যে জিদের দুর্বলতা আছে প্রচুর। বুঝছি ভুল করেছি, বুঝছি এই পথ ভুল, এই ভুলের পথ নিষ্ফল বেদনার পথ, ভুলের ভারে জীবন হয়ে পড়েছে ব্যথায়, তবুও কতবার এই জিদের অহংকার কিছুতেই ছাড়তে পানি নি। আমার অহংকার জিদের রূপ নিয়েছে। বাইরে হাততালি পড়েছে—লোকটির কী নিষ্ঠা! আমার মন জেনেছে সেটা নিষ্ঠা নয়, সেটা অহংকার। ভুল স্বীকারের স্বরণার ধারে মন পৌছতেই

পারছে না। অহংকারের পাথর ঠেলে। ভুল স্বীকার করার মুক্তি পাচ্ছে না। মন কিছুতেই, থেকেই যাচ্ছে মন অহংকারের অঙ্ককারে। অন্যদের আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি এই জিদের নেশায় মেতে, আসল মারটা কিন্তু আমি নিজেই খেয়েছি নিজের অহংকারের হাতে। এই জিদের অহংকারের নেশায় চলা আমার থেমে গেছে বারে বারে, শ্রোত আমার বন্ধ হয়েছে মনের মধ্যে। এই অহংকারটাকে হটাবার জন্তে লড়ি নি যে তা নয়—অনেক লড়েছি, হারিয়েওছি তাকে। হেরেছি কিন্তু বেশির ভাগ এই জিদের অহংকারের কাছে।

এবারে অবুঝ জিদের জাঁতাকলে পড়ে আমি পড়লুম অস্থখে। নভেম্বর বিপ্লবের দশম-বার্ষিকী উৎসবে যোগদান করবার জন্তে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নানা ধরণের অতিথিরা এসেছিলেন মস্কোতে। রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, দার্শনিক, এঁরা সব তো এসেছিলেনই, কমরৎবিদরাও বাদ পড়েন নি। এমনি একজন কমরৎবিদ যুবক এসেছিল আমেরিকা থেকে। প্রফেসর স্কট নিয়ারিংএর ঘরে একদিন আলাপ হল মরিসের সঙ্গে। বেশ মজার লোক ছিল মরিস্। আমরা হয়তো তর্কে মেতে উঠেছি, মরিস্ হঠাৎ দুটি চেয়ার ধরে পা শূণ্ণে মাথা নীচু করে কমরৎ দেখাতে শুরু করলে। আমরা বসেছি ডিনার থেকে, মরিস্ কট করে রাস্তার ওধারের দোকান থেকে এক গোছা গাজর কিনে এনে বসে গেল আমাদের সঙ্গে। কাঁচা গাজর চিবোবার সময় সে কী তৃপ্তির ছায়া তার মুখে! যারা কল্পনায় শত্রুর মাথা নিয়ত চিবোয় তাদের তো এমন মুখশ্রী হয় না! একটি গাজর শেষ হয় আর মরিস্ তৃপ্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলে—ও বর! আবার একটি চিবোতে শুরু করে। রুশীয় খানাপিনা যাতে করে আমরা ছেড়ে দিই তার জন্তে মরিস্ মরিয়া হয়ে লেগে পড়েছিল। রুশীয় খাবার দেখলেই মরিস্ শিউরে উঠত—ভাৰটা এই—সর্বনাশ, ওই রান্না খেলে কি আর রক্ষে আছে? মনে হত মরিসের চোখে রুশীয় রান্না যেন বৈতরণীর ওপার থেকে যমের হাতছানির সামিল। মরিস্ বলত—বাঁচতে চাও তো! খাও কাঁচা গাজর, কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা বাঁধাকপি কুচি, রাইয়ের রুটি আর আপেল। আমি বলতুম, বাঁচবার জন্তে যদি নিজেকে সব রস থেকে এমনি করে বঞ্চিত করতে হয় তো বেঁচে

দরকার কি মরিস্? মরিস্ ক্ষুধা হত, খাবার লোভের ভারে হুয়ে-পড়া আমার নৈতিক শির-দাঁড়াটিকে উপদেশ দিয়ে সোজা করে তোলবার জন্তে তার চেষ্ঠা ছিল অফুরন্ত। আমার শরীর যে মজবুত নয় এটাও মরিস্ বলতে কষ্ট করত না। স্কট নিয়ারিং-এর ঘরে এক সন্ধ্যাবেলা জোর পরীক্ষা করলুম মরিসের সঙ্গে। তারই হলো হার দু' দু'বার। এই জিত কিন্তু আমার সর্বনাশ করলে। নভেম্বরের এক কনকনে রাত। রাত তখন প্রায় এগারোটা। হোটেলের ঘরে আমরা কয়েকজন বসে গল্প করছিলাম। মরিস্ বললে, চলো নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি। কেউ যেতে চাইলে না সেই শীতের রাতে। মরিস্ আমাকে বিদ্রূপ করে বললে—কী বীণপুরুষ, সেদিন তো আমাকে হারালে, এখন কি হিম্মত রাখো নদীর ধারে বেড়াতে যাবার? যা লাগল আমার অভিমানে। বের হয়ে পড়লুম মরিসের সঙ্গে। বরফ-ঢাকা বুলভার ধরে গেলুম নদীর ধারে। আমার মাথা অনাবৃত, হাত দুটিরও সেই একই অবস্থা, দস্তানা আমি কখনো পরতুম না। নদী তখন জমাট বরফের প্রান্তর। রাস্তা থেকে নেমে পড়লুম আমরা নদীর বুকে। হঠাৎ নীল আকাশ উঠল একটু লালচিয়ে। শুরু হলো বরফ পড়া। আমার খালি মাথা বরফে শাদা হল, গেল ভিজে। যখন ফিরে এলুম হোটেলে তখন মুখ মাথা, হাত সব যেন অসাড় হয়ে গেছে। আমার চেহারা দেখে নলিনী ভয় পেল, মরিস্কে খুব খানিকটা ধমক দিলে। তার কয়েকদিন পর থেকেই শুরু হলো আমার ঘুসুঘুসে জ্বর। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন যে ঠাণ্ডা লেগে আমার ফুস্ফুস জখম হয়েছে। শুরু হল আমার টি-বি। জিদের দেনা চুকোলুম কয়েক বছর ধরে।

লেনি-শিক্ষা-নিকেতনে যোগ দেবার অল্প দিন পরেই আমি হোটেল থেকে শিক্ষা-নিকেতনের বাসভবনে চলে যাই। 'উলিৎসা ভরস্কভো'য় (ভরস্কি স্ট্রীট) ধূসর রঙের একটি তিনতলা বাড়িতে ছিল আমাদের বাসা। ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী, পোল, ফিন, মার্কিন, চীনে, জাপানী, কোরীয়—পৃথিবীর সব দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে পারে এমন সব কর্মী তৈরি করাই ছিল এই আন্তর্জাতিক শিক্ষা-কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, বৈপ্লবিক, সংগঠন-প্রণালী, দর্শন, সবই

আমাদের পড়তে হত। এর সঙ্গে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কাজও আমাদের করতে হত। নাম বদল করবার রীতি অনুযায়ী এই সময় আমার নামকরণ করা হল। একদা কমিন্টার্ন দপ্তরে প্রবেশ করল সোম্যা ঠাকুর, বের হয়ে এল হারল্ড স্পেন্সার। এই নামেই আমি পরিচিত ছিলাম মস্কোর রাজনৈতিক মহলে। এই শিক্ষা-নিকেতনে আমি প্রায় দেড় বৎসর অধ্যয়ন করি।

আমি তখন টি-বিতে ভুগছি। বিকেল থেকে জ্বর আসে। সারা রাত থাকে। রাত্তিরে জ্বরের দহনে ঘুম আমাকে ছেড়ে পালায় ঘুমের দেশে, বিছানাটা বিছানা বলেই মনে হয় না। মনে হয় যেন গরম তাওয়ার উপর শুয়ে আছি, কেবল এ-পাশ ও-পাশ করি বিছানায়। শরিকী সঙ্গে ঘর পেয়েছিলাম শিক্ষা-নিকেতনে। একজন জার্মান কমিউনিস্ট আর আমি, আমরা দুজনে থাকতুম তেতলার একটি ঘরে। রাত্তিরে আমার ছটফটানিতে আমার ঘরে শরিক জার্মান কমিউনিস্টের ঘুমের ব্যাঘাত হত। মাঝে মাঝে সে উঠে এসে আমাকে দেখে যেত, কখনো কখনো বা আমার খাটের পায়ায় জুতো ছুঁড়ে মারত। আমাকে চুপ করবার জন্য প্রায় রাত্তিরেই রুদানোভস্কায়া আসতেন। আমার খাটের পাশে এসে, মাথা নীচু করে অতি আন্তরিক ভাবে আমার নাম ধরে, তাঁর ঠাণ্ডা হাতটি রাখতেন আমার আতপ্ত কপালে, বোতলে ভরে নিজের হাতে তৈরি সুপ নিয়ে এসে আমাকে খাইয়ে যেতেন। আমাদের এই শিক্ষা কেন্দ্রেই তিনি কাজ করতেন। বিধাতা তাঁকে বাইরের রূপ থেকে যেমন নিষ্ঠুর ভাবে বঞ্চিত করেছিলেন তেমন পৃথিবীর সব সোনা উদ্ধার করে ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর অন্তরে। ঘর-ছাড়া আমাদের জন্যে তাঁর উদ্বেগের অন্ত ছিল না। যার যা প্রয়োজন, সবাই গিয়ে জুটত তাঁর কাছে। গোধুলির রাজা আলোয় নদীর জলের মতো তাঁর মুখখানি টলটল করত স্নেহের লাবণ্যে, ঠাট্টা করে বলতেন, এখন বুঝি এই বুড়ীকে মনে পড়ল!

দেখতে ভালো ছিলাম না বলে আদর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন সারা জীবন। তার জন্যে ছিল বুক-ভরা অভিমান কিন্তু কখনো প্রকাশ করতেন না। আমাকে বড়ো ভালবাসতেন, তাই এক-একদিন

মনের জান্না তাঁরও অজানিতে একটু ফাঁক হয়ে পড়ত, এক ঝলকে দেখে নিতুম তাঁর মনের ব্যথা। আমাদের শিক্ষা-নিকেতনে প্রায় প্রতি মাসেই নৃত্য-উৎসব হত। সে নাচের আসরে রুদনোভ্‌স্কায়া আর আমি ছিলাম দর্শক। ইয়োৰোপীয় যুগ্ম নৃত্য আমি পছন্দ করতুম না বলে নাচতুম না, আর রুদনোভ্‌স্কায়া কুরুপা বলে কোনো পুরুষ তাঁকে নাচের সঙ্গিনী করত না। নারী-মাংস-লুপ্ত পুরুষের কাছে নারীর মনের মূল্যে কতটুকুই বা! ১৯২৮ সালে ককেশাস্ থেকে তাঁর জন্তে একটি রঙিন ওড়না এনেছিলুম। যেদিন তাঁকে সেই ওড়নাটি দিয়েছিলুম সে দিনটি ভোলবার নয়। বৃদ্ধা যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন। কতবার যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরলেন! বারবার শুধোলেন—বেশ মানিয়েছে তাই না? নিজের কথায় নিজেই হেসে আকুল। একটু আদরের জন্তে কি তৃষ্ণাই না আছে মানুষের মনে! ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন মস্কো যাই তখন রুদনোভ্‌স্কায়া মস্কোয় ছিলেন না। গ্রীষ্মের ছুটিতে ককেশাসে বেড়াতে গিয়েছিলেন। খবরের কাগজে আমার মস্কো যাওয়ার খবর পাওয়া মাত্র মস্কোয় ফিরে এলেন। এক সপ্তাহের বেশি তাঁর ককেশাসে থাকা হল না সেবার। যেদিন সন্ধ্যাবেলা মস্কো ছাড়লুম, স্টেশনে এলেন। চোখের জল হাসি দিয়ে ঢাকবার জন্তে কত-না চেষ্টা করলেন! এই জীবনে বারে বারে পাওয়া সব স্নেহ ভালোবাসার মতো এই পাওয়াটাও আমার পাওনা ছিল না। যারা আমাকে স্নেহ-ভালোবাসা দিয়েছে তারা কোনো কিছু আশা না করে, কোনো কিছু দাবি না করে একান্তভাবে তাদের নিজেদের আনন্দে, নিজেদের অন্তর-মহিমায় আমাকে ভালোবাসা স্নেহ দিয়ে বাঁচিয়েছে। আমি যা পেয়েছি তাঁর জন্তে কোনো দায় আমি দিই নি। আসলে কিছুই আমার পাওনা ছিল না। তবু এত পেয়েছি! আমার জীবন-পাত্র স্নেহ-ভালোবাসার সুধায় কানায় কানায় ভরে গেছে, উপচে পড়েছে সুধায়। কোনো মূল্য না দিয়ে এত পাওয়া কি করে সম্ভব হোলো? অনেক ভেবেছি, উত্তর পাই নি আজো।

১৯২৭ সালের শেষ দিনটি ভোলবার নয়। বছরের শেষ দিনটি মস্কোর বাইরে একটি গ্রামে কাটাবো বলে স্থির করেছিলুম। ঘোড়া-টানা চাকাহীন গাড়িতে আমি আর সুরা যখন গাঁয়ের দিকে রওনা হলুম তখন

বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। সুরার এক আত্মীয়ের বাড়িতে আমাদের যাবার ঠিক ছিল। বনের পথ ধরল গাড়ি মস্কো ছাড়িয়ে। সারা বন নিঃশব্দ নিরুন্ম। শীতের দৈত্য যেন বরফের রূপোর কাঠি ছুঁয়ে বনটিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। পাখির শব্দ নেই, পাতার উসখুস্ ধ্বনিও নেই। হঠাৎ একবার হাওয়া উঠল, আবার সব চুপচাপ। আকাশের দিকে তাকিয়ে গাড়োয়ান বললে ঝড় আসছে। চামড়ার টুপিটা আরো টেনে নামিয়ে কান, গাল সব ঢেকে গাড়োয়ান চাবুক মেরে ঘোড়া দিলে ছুটিয়ে। বাতাস ক্রমশই জোরে বইতে লাগল। সঙ্গে হয়ে গেল, অন্ধকার বনের পথে চলেছি, বরফের ঝড় বইছে। বরফের হাজার হাজার পাংলা টুকরো তীরের মতো বিঁধতে লাগল হাতে মুখে। ঘোড়াও উড়ন্ত বরফের ঘায়ে পাগল হবার দাখিল। ঝড়ের দৈত্য যেন হাজার হাজার বরফের তীর ছুঁড়ছিল আমাদের লক্ষ্য করে। নিঃশ্বাস নেওয়া অসম্ভব বোধ হচ্ছিল। প্রতিটি নিঃশ্বাসে বরফের তীরগুলো যেন বুকের মধ্যে গিয়ে বিঁধতে লাগল। পথ যেন আর ফুরোতে চায় না। রাতে যখন আমরা গাঁয়ে পৌঁছলুম গিয়ে, আমাদের দুটির অবস্থা দেখে সুরার আত্মীয় দম্ভরমত ভয় পেলেন। বরফের ঝড়ের কথা পড়েছিলুম, বছরের শেষ দিনে তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। সে রাতটি আমরা ঘুমিয়ে নষ্ট করি নি। চিমনির খোলা আগুনের ধারে বসে গল্পে গানে সারারাত কেটে গেল। বাড়ির কর্তা, গিন্নী আর সুরা অনেক পুরানো রুশীয় গান গাইলেন। পরদিন বিকেলবেলা আমরা মস্কোয় ফিরে এলুম।

লাল ফোঁজের এক অফিসারের সঙ্গে লিও আমাকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। প্রায়ই তার ওখানে যেতুম। জাহুয়ারি মাসের তারিখটা মনে নেই, সঙ্গেবেলা তার ওখানে গিয়ে দেখি লিও বসে আছে। অফিসার, অফিসারের স্ত্রী, লিও সবাই যেন চুপচাপ। অন্তর্দিন আমি গেলেই গল্প জমে ওঠে। আর লিও থাকলে তো কথাই নেই। সে ছিল গল্পের ফোয়ারা। সেদিন সবই যেন বেসুরো বাজছিল। কারো মুখে হাসি নেই, মনে কী যেন ঘুঁর্ণি খাচ্ছে তার কালো ছায়া পড়েছে মুখে। জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছিল না, কারণটা হবে হয়তো নিছক ঘরোয়া, সে ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন এদের কাছে অশালীন কোঁতুহল বলে মনে হতে পারে।

অথচ এই রকম ধম্ধমে গুমোট আবহাওয়া কতক্ষণই বা সহ্য করা যায় !
 লিও ছিল আমার বন্ধু তাই তাকেই শুধোলুম। অফিসার আর তার
 স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে লিও যেন কোনো একটা প্রশ্নের উত্তর চাইছে মনে
 হল। লিও উত্তর দিল না, উত্তর দিলেন অফিসার। গুনলুম তার
 আগের দিন ট্রটস্কিকে আলুমা-আটায় নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। গেপেয়ুর
 লোকেরা ট্রটস্কিকে জোর করে তাঁর বাসভবন থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে
 গেছে। মস্কোর স্টেশনে হাজির করলে পাছে জনসাধারণ জেনে ফেলে,
 শত ত্রাস সত্ত্বেও প্রতিবাদ জানায় সেই ভয়ে একটি ছোট্ট স্টেশন থেকে
 তাঁকে চীনের সীমানার কাছাকাছি পাঠানো হয়েছে। অফিসারের ঘরে
 ট্রটস্কির ছবি অনেক দিন থেকেই নজরে পড়েছে কিন্তু সেটার কোনো
 রাজনৈতিক অর্থ আমি কখনো করি নি। লাল ফোঁজের স্ত্রীর ছবি লাল
 ফোঁজের অফিসারের ঘরে থাকা তো স্বাভাবিক। সে দিন বুঝলুম যে
 অফিসার ট্রটস্কির ভক্ত, তাঁর মতবাদে বিশ্বাসী। আমি কমিউনিস্ট
 ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তাই আমাকে সব কথা খুলে বলা
 চলে কিনা, কি ভাবে আমি ট্রটস্কির নির্বাসন ব্যাপারটিকে গ্রহণ করব,
 সেটা তাঁরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাই সব কথা আমাকে
 বলবেন কি বলবেন না এই দোটানায় পড়ে তাঁরা থমকে চূপ করে
 গিয়েছিলেন। ট্রটস্কি-পন্থী বলতে যা বোঝায় সেদিনও আমি তা ছিলাম
 না, আজও নই। সোভিয়েট রাশিয়ায় কিছুকাল থাকার পর থেকেই
 স্টালিনের নীতি সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছিল আমার মনে। তখনো কিন্তু
 স্টালিনবাদের নীতিগত ভুল কোথায় সেটি আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি
 নি। কিছুটা ধরছিলাম কিছুটা পিছলিয়ে যাচ্ছিল। একটা জিনিস কিন্তু
 মস্কোতে খুব অল্প দিন থাকবার পরে আমার নজরে পড়েছিল। সেটি হচ্ছে
 চিন্তায় সোভিয়েট রাশিয়ায়ও কল্পনার ছঃসাহসিকতার একান্ত অভাব।
 স্টালিনের আমলে বাঁধাবুলির গোচারণ ক্ষেত্রে মন ও কল্পনাকে তদ্রূপে
 চরিয়ে নিয়ে আসাই হল সোভিয়েট সমাজের দৃষ্টান্ত। দল ও রাষ্ট্রের তৈরি
 বাঁধাবুলির সড়কের বাইরে মনকে যেতে দেওয়া ঘোর অপরাধ বলে গণ্য
 স্টালিনের বাদশাহীতে। এই বাঁধাবুলির বিভীষিকাও বাঁধা সড়কের
 ব্যাভিচার আমি কিছুতেই মানতে পারি নি। প্রথম থেকেই আমি

খোলাখুলি ভাবে তার সমালোচনা করেছি ও তার জন্তে অনেক ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছে আমাকে। ট্রটস্কির মতের সঙ্গে স্টালিনের মতের পার্থক্যের প্রতিটি সূক্ষ্ম রেশ তখনো আমি ধরতে পারি নি বটে কিন্তু দলের যন্ত্র একচেটিয়া ভাবে দখলে নিয়ে স্টালিন যে ট্রটস্কিকে সব মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাঁর উপর ঘোর অবিচার করেছে এ বিষয়ে আমার মনে লেশ মাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই ট্রটস্কি-পন্থী না হয়েও ট্রটস্কির জন্তে আমার মনে দরদ ছিল। তা ছাড়া আমি এমনি এক সময়ে মস্কোয় গিয়ে পৌঁচেছিলুম যখন স্টালিনের সঙ্গে ট্রটস্কির সংঘাত শেষ অঙ্কে এসে পৌঁচেছে। কমিন্টার্নের দপ্তরে, লেনিন-শিক্ষা-নিকেতনে, সব জায়গাতেই সে সংঘাতের হল্কা অনুভব করা যেত। বিশেষ করে কমিন্টার্নে ট্রটস্কির বিরুদ্ধে বিবোধগার রোজই চলত। ট্রটস্কির বিরুদ্ধে যারা গলা উচু করে চোঁচাচ্ছিল তারা যে সব ক্ষেত্রেই ট্রটস্কির বিরুদ্ধে ছিল তাও নয়। মনিবকে গুলিয়ে বকশিস নেবার জন্তেই তাদের এই উচুগলার চীৎকার। তারা এই সোজা নীতি ঠিক করে নিয়েছিল যে যার দিকে বেশি লোক, যে ক্ষমতা দখল করে বসেছে সেই অভ্রান্ত আর তার বিরুদ্ধতা করে যারা তারা ভ্রান্ত। এই যুক্তি আমি অন্তত একশোবার শুনেছি রাশিয়ায় থাকতে। আধা-জন্ত মানুষ আদিম কাল থেকে সত্যকে সংখ্যার সুপারিশের গোলাম বানিয়েছে। বর্তমান যুগের আধা-জন্ত মানুষও এই সংখ্যার কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি পায় নি। এর থেকে এইটে আমি বুঝেছিলুম যে উপরের ব্যবস্থার বেশ কিছু অদল-বদল করে দেওয়া যায়, কিন্তু মানুষের ভিতরটা বদল করা বড়ো শক্ত। যে যখন ক্ষমতা দখল করেছে তার কাছে নতজানু হওয়া সেই আদিম যুগ থেকে চলে আসছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় এই অপমানের জের আর টেনে চলতে হবে না মানুষকে, মানুষের জীবনের মোড় ঘুরবে, এইটে আশা করেছিলুম। মস্কোয় থাকতে থাকতে সে আশা নিঃশেষে খুঁয়ে বসলুম। স্টালিনের ভয়ঙ্কর ক্ষমতা-লিপ্সা আর ক্ষমতা-দখলের জন্তে সব রকমের নীচ কৌশল অবলম্বন প্রতি পদে চোখে পড়তে লাগল। বুকলুম সোভিয়েট রাশিয়ায় কমিউনিজমের সব সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছে স্টালিন। ট্রটস্কির নির্বাসন ক্ষমতা-লিপ্সু নীচতা ও জাতীয় অন্ধতার কাছে কমিউনিজমের পরাজয়

ছাড়া আর কিছু নয়। পার্টির সব যন্ত্র হাতে থাকা সত্ত্বেও সে লড়াই স্টালিনের পক্ষে কিন্তু খুব সোজা হয় নি। ইউনিভার্সিটির ছাত্রের দল, বলশেভিক দলের সহস্র সহস্র কর্মী, লাল ফৌজের বহু বিশিষ্ট নায়কেরা— সবাই ছিলেন ট্রটস্কির পক্ষে। এদের কারাগারে বন্দী করে, নির্বাসনে পাঠিয়ে ঘাতকের হাতে তুলে দিয়ে তবে স্টালিন জিততে পেরেছে। তা ছাড়া ভুললে চলবে না যে প্রচারের একচেটিয়া স্বযোগ ছিল শুধু স্টালিনের। রাষ্ট্রের ও দলের প্রচার-যন্ত্র ব্যবহার করে স্টালিন যেভাবে ট্রটস্কির বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রচার করেছে পৃথিবীর সব দেশে, পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে তার তুলনা নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো মানুষ কখনো নিজের ক্ষমতাকে এত মিথ্যে, এত অমানুষিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করে নি। যেমন করেছে স্টালিন। মিথ্যে প্রচারের আর্টে স্টালিনের কাছেই গোবেল্‌সের হাতেখড়ি হয়েছে। জনসাধারণের কাছে তার মতামত ধরে দেবার সব স্বযোগ থেকে ট্রটস্কিকে বঞ্চিত করেছিল স্টালিন। এই বেপরোয়া ত্রাস সত্ত্বেও যে অমিতবীর্যের সঙ্গে কমিউনিজমের আদর্শকে স্টালিনবাদের বিকৃতির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ট্রটস্কি লড়েছিলেন, তাঁর মহত্ত্ব স্বীকারের কথা দূরে থাক, তার প্রকৃত ধারণাও শিক্ষিত মহলে দেখা যায় না। সেই আত্মভোলা নিষ্ঠা, জলন্ত প্রতিভা, দুর্জয় সাহস সব হার মানলো ষড়যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত, অতি সাধারণ প্রতিভাহীন এক চতুর ক্ষমতা-বুড়ু লোকের চাতুরীর কাছে। লেনিন যখন অসুস্থ হয়ে মৃত্যুশয্যায় তখন থেকেই দলের মসনদ দখলের জন্যে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছিল স্টালিন। লেনিনের মৃত্যুর পর একবছর যেতে না যেতেই যুদ্ধ বিভাগের কমিশনারের পদ থেকে স্টালিন ট্রটস্কিকে সরিয়ে দিল। তার এক বছর বাদে দলের পলিটবুরোতে ট্রটস্কির স্থান রইল না। ১৯২৭ সালে আমার মন্স্কোয় থাকাকালীন বলশেভিক দলের সেন্ট্রাল কমিটি থেকে ও পরে দল থেকে ট্রটস্কিকে বের করে দেওয়া হয়। এবারে তিনি নির্বাসিত হলেন। লিওকে বললুম, কি লিও, এই রকমই কি চলবে? এত শিল্পি দশ বছরের মধ্যেই নভেম্বর বিপ্লবের মশাল, লেনিনের নিজের হাতে জালা মশাল এমনি করে নিবে যাবে? লিও বললে, আমাদের আর শক্তি নেই। বৈপ্লবিক আন্দোলন নভেম্বর বিপ্লব, ঘরোয়া যুদ্ধ, এতেই আমাদের বা-কিছু শক্তি ছিল আমরা ঢেলে

দিয়েছি। আমাদের যুগের যারা তারা আর নতুন করে লড়তে পারবে না। কমিউনিজম-বিরোধী এই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যারা লড়বে তারা আজ স্টালিনের মিথ্যে প্রচারের বিষে বিষিয়ে গেছে। এদের দিয়ে হবে না। কাদের দিয়ে হবে, কবে হবে তাও জানি নে। সব অন্ধকার। লাল ফৌজের অফিসারকে জিজ্ঞেস করলুম, ফৌজের লোকেরা কী বলে? তিনি বললেন, ফৌজের মধ্যে ভয়ানক উত্তেজনা হয়েছে এই ব্যাপারে। টুটস্কিকে লাল ফৌজের লোকেরা ভারী শ্রদ্ধা করে। তবে পাছে তাদের নিজেদের ঝগড়ার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সোভিয়েটকে আক্রমণ করে বসে, এই ভয়ে সবাই চুপ করে আছে। নইলে স্টালিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হত। তা ছাড়া লাল ফৌজ থেকেও হাজার হাজার লোকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। টুটস্কির ছবিটা দেখিয়ে বললুম, এবারে তা হলে আপনাকে এই ছবিটা সরাতে হচ্ছে! সৈনিকের চোখ দুটি থেকে যেন আগুন ঠিকরোতে লাগলো, বললেন—কখনো না। টুটস্কির ছবি আমার ঘর থেকে সরাব না। জানি না তিনি বেঁচে আছেন কিনা। স্টালিনের আমলে টুটস্কির ছবি রাখার অপরাধে প্রাণ যাওয়া তো একেবারে সূনিশ্চিত। সেই সন্ধেবেলাই গেলুম নিনার সঙ্গে দেখা করতে। নিনা ছিল টুটস্কির মহাভক্ত। তার টেবিলের উপর টুটস্কির ছবি সব সময়েই সাজানো থাকত। দেখলুম চেয়ে ছবিটি নেই টেবিলে। ছবিটা যেখানে থাকত সেখানে তাকিয়ে আছি দেখে নিনা নিজেই বললে,—বুঝেছি তুমি কী ভাবছ। তা ছবির জন্তে বিপদে পড়ে লাভ কি? তাই ছবিটা সরিয়ে দিয়েছি। কর্ণের সহজাত কবচের মতো মেয়েদের প্রাকটিক্যাল বুদ্ধি সহজাত। যাতে কোনো লাভ নেই এমন ঝগড়াতে তারা সহজে যেতে চায় না। তার জাতের সহজাত গুণ থেকেই নিনাই বা বঞ্চিত হবে কেন! রাতিরে ঘরে ফিরে আসতেই জার্মান বন্ধু বললে, টুটস্কিকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, জানো? বললুম, জানি, আর কোনো উত্তর দিলুম না। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে নিজেই বললে, ঠিক হয়েছে, স্টালিন ঠিক করেছে। টুটস্কি বিপ্লবের শত্রু। কোনো উত্তর না দিয়ে আমি একটা বই নিয়ে পড়তে শুরু করে দিলুম। সে নাছোড়বান্দা, বললে, টুটস্কির সবচেয়ে তোমার মত জানি। সেই

মিটিংয়ে উট্‌স্কি সম্বন্ধে যা বলেছিলে, তোমার এখনো কি সেই মত? বললুম, আমার মত এতোটুকু বদলায় নি। উট্‌স্কি যে বিপ্লবের ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের শত্রু এ কথা আমি আদবেই বিশ্বাস করিনে। ফ্রিট্‌জ তখন স্টালিনের সমর্থক। পরে ১৯৩৩ সালে তার সঙ্গে প্যারিসে যখন দেখা হলো তখন ফ্রিট্‌জ স্টালিনের কঠোর সমালোচক। স্টালিনের সমর্থক হলেও আমাকে ফ্রিট্‌জ প্রীতির চোখে দেখত। আমার কথা শুনে ফ্রিট্‌জ চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিল। তারপরে আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে বললে, যা ভাবো ভাবো, নিজের মনে রেখো। পাগলামি কোবো না। বুললুম ভয়ের চাপে ফ্রিট্‌জেরও শিবদাঁড়া হুয়ে পড়েছে। আমাকে যদি আঘাত করে কিছু, ক্ষেপিয়ে তোলে কিছু, সেটা হচ্ছে এই জানোয়ার স্থলভ ভয়। ভয়ে মেনে নেওয়ার মতো মনুষ্যত্বের দেউলেপনার নিশানা আর কিছু নেই। সোভিয়েট রাশিয়ার গোটা জীবনের তলা দিয়ে স্টালিনের ত্রাসের ফল্ট একটানা বয়ে চলেছে। আমি তার পরিচয় নানা দিক থেকে এত পেয়েছি। ভয়ে বোবা মানুষ এত আর আমি কোথাও কখনো দেখি নি। এমন-কি, হিট্‌লারের অত্যাচার যখন সপ্তমে চড়েছে, তখনও এত ভয়ে বোবা মানুষ দেখি নি জার্মানীতে। স্টালিনের অগুণতি অপকর্মের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো অশ্রায় স্টালিন যা করেছে সেটি এই অপরাধ—লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের রস, তাদের মনুষ্যত্বের রস নিংরে নিয়ে তাদের পুতুল বানিয়ে দিয়েছে স্টালিন।

এ-সব জানি, তবু একটা প্রশ্ন আমার মনে বারে বারে জেগেছে। ত্রাস, চাতুরী, চক্রান্ত, এ সবই ঠিক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্টালিন যত নীচতা, ক্রুরতা ও মিথ্যার আমদানী করেছে এমন আর কেউ কখনো কয়ে নি—এ তো খুবই সত্যি কথা। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় যে বিরাট পরিবর্তনের ঢেউয়ের চুড়ায় যাকে কেউ কখনো দেখে নি, জলরাশির একটি ফোঁটা যে হিসেবে নিজেকে বগা বলে দাবি করতে পারে, শুধু সেই হিসেবে যে লোক নিজেকে নভেম্বর-বিপ্লব-বগার অংশ বলে দাবি করতে পারে, সেই স্টালিনের পক্ষে এটা কী করে সম্ভব হল, কেন সম্ভব হল বিপ্লবের ঢেউয়ের চুড়ায় যিনি ছিলেন সেই উট্‌স্কিকে এমন করে হটিয়ে দেওয়া? জনসাধারণ তো উট্‌স্কিকে দেখেছে, শুনেছে। তাহা তো

স্টালিনের কোনো কাজই দেখে নি, স্টালিনের নাম তো তারা বিপ্লবের বছ বছর পর থেকে শুনে শুনে শুক করেছে। তারা কেন স্টালিনকে মেনে নিল? শুধু ভ্রাস, চাতুরী, মিথ্যে, ষড়যন্ত্র, দলের যন্ত্র-দখল শুধু এদের দোহাই দিলে সব বলা হয় না।

আমার মতে জনসাধারণের স্বরের সঙ্গে স্টালিনের স্বরের মিল ছিল, যে মিলটা টুট্কির ছিল না। তাই জনসাধারণ সব জেনে শুনে স্টালিনকে গ্রহণ করেছে, টুট্কিকে বর্জন করেছে। এখানে ‘জনসাধারণ’ শব্দটি কী অর্থে ব্যবহার করেছি সেটা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া দরকার। যে অর্থে জনসাধারণ বলতে চাষী মজুর মধ্যবিত্ত বোঝায় আমি সেই চলতি অর্থে এই কথাটি ব্যবহার করি নি। চলার পথে যুগযুগান্তের মহতী সাধনায় যে-সব আত্মিক অভিজ্ঞতা মানুষ সঞ্চয় করেছে সেই-সব অভিজ্ঞতার সঙ্গে কার কতটা সম্পর্ক সেইটা বিচার করে জনসাধারণ বলতে আমি যাদের বুঝি তাদের মধ্যে চাষী আছে, মজুর আছে, ইউনিভারসিটির ডিগ্রীধারী উচ্চ-শিক্ষিতেরা আছে, কবি আছে, দার্শনিক আছে, ব্যারিস্টার, উকীল, জজ সাহেবরা, ড্রইংরুমের সংস্কৃতিবিলাসী ও বিলাসিনীর দল, এরা সবাই আছে। এই দিক থেকে বিচার করে দেখলে এটাও দেখা যায় যে এমন অনেক চাষী মজুর আছে যারা আমার ধারণার জনসাধারণের মধ্যে পড়ে না। আমরা ‘জনসাধারণ’ তাই অর্থনৈতিক সংজ্ঞা নয়, সাংস্কৃতিক সংজ্ঞা। আমার মনের নিঃসংশয় ধারণা যে এই জনসাধারণ কোনো স্তম্ভ জিনিস—সে চিন্তার ফসলই হোক কিম্বা অনুভূতি ও কল্পনার ফসলই হোক—একেবারেই সহ্য করতে পারে না। যা-কিছু তাদের মনের নাগালের বাইরে সে-সব তাদের রাগিয়ে দেয় কেননা বুঝতে না পারাটা তাদের আত্মপ্লাবাকে আঘাত করে। স্টালিন এইখানেই সফল। আর ঠিক এইখানেই টুট্কি একেবারে অচল। স্টালিনের চিন্তা, অনুভূতি, কথা, লেখা, আচরণ, সবই স্থূল, মেদময়, জোলা। টুট্কির চিন্তা ও অনুভূতি যেমন সূক্ষ্ম, তাঁর কথা ও লেখা তেমনি সবল পেশীময় ও জলন্ত। স্টালিনের বক্তব্য জনসাধারণ সহজেই বুঝতে পারে। স্টালিনের কথা যখন শোনে, লেখা যখন পড়ে, জনসাধারণ তখনই ভাবে এত আমাদেরই মতো কোরে ভাবে, আমরা যে রকম করে বলি কিম্বা লিখি, সে রকম করে বলে, সে ধরনেই

লেখে। ট্রট্‌স্কির বক্তৃতা কিংবা লেখা জনসাধারণের মাথার অনেক উপর দিয়ে মহাসমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চলে যায়। একটা বিরাট কিছু ঘটলো সেটা তারা অনুভব করে, কিন্তু বুঝতে পারে না। আর তাদের এই অক্ষমতা ও দৈন্যকে তারা চিন্তাশীল ও সৃষ্টিশীল মানুষের বিরুদ্ধে আক্রোশ ও ঘেঁষে রূপান্তরিত করে। শুলের সঙ্গে শুলের, মোটার সঙ্গে চিকনের আত্মিক যোগ অসম্ভব। জনসাধারণের এই মোটা মনোভাব স্টালিন জানে কেন না স্টালিনের নিজের মনোভাব এইই। তাই ‘ট্রট্‌স্কি ইন্টেলেক্চুয়াল’ এই অপবাদ (!) স্টালিন বারবার এনেছে ট্রট্‌স্কির বিরুদ্ধে। ইন্টেলেক্চুয়ালদের বিরুদ্ধে স্টালিনের অবিশ্রান্ত জেহাদের কারণই হচ্ছে এই যে স্টালিন নিজে এই জনসাধারণের একজন। তাই তার নিজের স্তরের চেয়ে উঁচু এমন কাউকে সহ্য করতে পারে না স্টালিন। ট্রট্‌স্কি এই জনসাধারণের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে বলে হারলেন তিনি স্টালিনের কাছে, তাঁকে মরতে হল স্টালিনের হাতে। এই একই কারণে মরতে হল গান্ধীজীকে। লেনিন বেঁচে থাকলে আজ তাঁকেও মরতে হত এই একই কারণে। আর ক্রপ্‌স্কায়া তো এ কথা একবার বলেওছিলেন যে ভ্লাডিমির ইলিচ (লেনিন) বেঁচে থাকলে তাঁর স্থান হত স্টালিনের কারাগারে। জনসাধারণ স্বল্প জিনিস কোনো যুগে কখনো সহ্য করতে পারে নি। খৃষ্টকে মেরেছে তারা, সক্রোটসকে মরতে হয়েছে তাদের হাতে। আমাদের এই যুগের মতো জনসাধারণের আধিপত্যের যুগ আগে কখনো ছিল না। এ যুগে একটা শুল সাধারণ মন সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষদের মধ্যে একটা নীচু স্তরের ঐক্য স্থাপন করেছে। এই নীচু স্তরের ঐক্যের প্রতীক হচ্ছে জনসাধারণ। তাই এই মোটা কথা ও নীচু স্তরের যুগের নেতৃত্বের টাইপ হচ্ছে হিটলার, মুসোলিনী, ফ্রাংকো, আর স্টালিন। ট্রট্‌স্কিকে হারাতেই হবে কেননা তিনি জনসাধারণ হতে পারেন নি।

কমিউনিজমের মূল সুরটা আমার মনে গেঁথে নেবার জন্যে আমি সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়েছিলুম আর আমার মনের মধ্যে যে সুরটা বাজছিল তার থেকে আমি এইটুকু বুঝেছিলুম যে কমিউনিজম শুধু রাজনীতি নয়। জীবনের প্রতিটি অংশকে কমিউনিজম যে একই সুরের ঠাঁটে বেঁধে রাখে এ

বিষয়ে আমার মনে কোনো সংশয় ছিল না। কিছু রাজনৈতিক মতবাদ আর কিছু অর্থনৈতিক বুলি শিখে কাজে অকাজে তার ব্যবহার করলেই কমিউনিজম বোঝা হল এ ধারণা আমার কোনোদিন ছিল না। জীবনের প্রত্যেক স্তরকে কমিউনিজম কি ভাবে স্পর্শ করছে, কোন্টাই বা তার রাখছে, কোন্টাই বা বর্জন করছে, সেটা জানবার জন্তে ও বোঝবার জন্তে আমার মনে অসীম আগ্রহ ছিল। এই কারণে রাজনীতির নানা সাইজের বড়ি কমিন্টার্নের খলে চব্বিশ ঘণ্টা মেড়ে খাবার কড়া বিধান থাকলেও আমি সেই বিধানের বেড়ায় নিজেকে বন্দী করিনি। রাজনীতির চর্চা ও কর্মের ফাঁকগুলো আমি নিয়ত ভরতুম সোভিয়েট রাশিয়ার সমস্ত জীবন জুড়ে যে-সব নতুন পরীক্ষা চলছিল সেই সব পরীক্ষা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে। গান, সাহিত্য, চিত্র, থিয়েটার, সিনেমা, মজুরদের মধ্যে সংস্কৃতি প্রচারের প্রতিষ্ঠানগুলি, শিশুদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও একান্তভাবে শিশুদের জন্তেই যে থিয়েটার সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই থিয়েটার—কোনো কিছুই আমি বাদ দিই নি সেদিন। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে যে সব কমিউনিস্টরা সোভিয়েট রাশিয়ায় যান তাঁদের উপর কমিন্টার্নের নজর থাকে খুবই কড়া। কমিন্টার্নের ফরমাসি আধ গজি দাঁড়ে বাঁধা বুলির ছোলা চিবিয়েই তাঁদের দিন গুজরান করতে হয়। আমি সেই দাঁড় আর সেই বরাদ্দ খোরাক প্রথম থেকেই অস্বীকার করেছিলুম। আমার মন কমিউনিজমকে আকাশ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, দাঁড় বলে নয়। সেই দিগন্ত-বিস্তৃত আকাশের সীমা স্পর্শ করবার জন্তে ছিল অনন্ত তৃষ্ণা আমার মনে। দাঁড়ের বরাদ্দ খোরাকে সে তৃষ্ণা মিটবে কী করে?

রুশীয় ভাষা চলনসই রকম আয়ত্ত করে নিয়ে আমি যেমন রুশীয় সাহিত্য পড়তে থাকি, তেমনি রুশীয় থিয়েটারও দেখতে শুরু করি। মস্কোতে তখন পাঁচ-ছটি থিয়েটারের খুব নাম ডাক ছিল। একটি থিয়েটারের পরিচালক ছিলেন জগদ্বিখ্যাত প্রযোজক স্টানিস্লাভস্কি। তাঁর প্রযোজনায় ‘হামলেট’ আর মেটারলিংকের ‘ব্লু বার্ড’, এই দুইটি নাটকের অভিনয় দেখলুম। হামলেটের ভূমিকায় প্রসিদ্ধ অভিনেতা চেখভের অভিনয় ভোলবার নয়। ইনি ছিলেন ছোটোগল লেখকদের মধ্যে যার জুড়ি আজও হল না সেই আন্টন্ চেখভের নিকট আসায়। পরে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

স্টানিস্লাভস্কির থিয়েটরে ‘ব্লু বার্ড’ আর ভাগ্‌তান্‌গভ্‌ থিয়েটরে ‘প্রিন্সেস্‌ তুরেন্দত্‌’ দেখে বোধেছিলুম যে রূপকথাকে কিংবা সিংহলিক নাটিকাকে ফুটিয়ে তোলা কত শক্ত। কল্পনার স্ফূর্ততা না থাকলে রূপকথাকে রূপ দেওয়া অসম্ভব। রিয়ালিজ্‌মের সঙ্গে কিছুটা কাল্পনিক মাল-মসলা মিশিয়ে এ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। রূপস্রষ্টাকে প্রথম থেকেই বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার খোলস থেকে মনকে মুক্ত করে নিতে হয় কেননা রূপকথায় কল্পনার যে জগতের ছবি ফুটোতে হবে যেখানে দুয়ের মিলন বরদাস্ত হয় না, মিশলেই রূপের গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটে। সে রূপকথার জগতে বাস্তবে যা কখনো ঘটে না তাকে মেনে নেওয়াই হচ্ছে রিয়ালিজ্‌ম। সেখানে অসম্ভব কিছুই নেই, অপ্রাকৃত কিছু নেই। সেখানে মন ছুটি নিয়েছে প্রতিদিনের জীবনের অভিজ্ঞতার এলাকার অল্প আয়তন থেকে। সেখানে চাঁদ তরতর করে নেমে এসে গাছের ডালে আটকে যায়। গাছগুলো বেড়ে ওঠে আবার ছোটো হয়ে যায়, ছায়াগুলো হাতছানি দেয়, কথা কয়। মানুষের মনের মধ্যে যে শিশু রয়েছে সে স্থায়ী হয় কল্পনার জগতে স্বপ্নের জগতে ছাড়া পেয়ে। সেই স্বপ্নের জগৎ, রূপকথার ও কাহিনীর জগৎকে স্টেজে হাজির করা যে কী অসাধারণ মুন্সিয়ানার পরিচয় তা রূপ-সৃষ্টির এলাকায় ঘাঁরা বাস করেন তাঁরাই জানেন। আমি যে কত অগুনতিবার ‘ব্লু বার্ড’ আর ‘প্রিন্সেস্‌ তুরেন্দত্‌’ দেখেছিলুম। তবুও আমার দেখবার আশ মেটে নি। মালি থিয়েটর-এ তখন ‘লুব্‌ ইয়ারোভায়া’ নাটিকাটির অভিনয় মাসের পর মাস চলছিল। চলনসই বই তার চেয়েও চলনসই অভিনয়। রুজ্‌-লিপষ্টিকে-নিকোনো আধুনিকাদের মুখের মতো রাজনৈতিক মতবাদ এমন পুরু করে নিকিয়ে দেওয়া ছিল নাটকটির গায়ে যে-ঘটনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। রসের-রসায়নের উপাদানগুলিকে মিশিয়ে দেওয়ার যে নিপুণতা হচ্ছে কলার প্রাণ-বায়ু সেই মিশিয়ে দেওয়া ছিল না নাটকটিতে, ছিল চাপিয়ে-দেওয়া আলাদা-থেকে যাওয়া কথার পিণ্ড। গোটা মুখের ছন্দের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেয় বলেই মুখের তিল এত হৃদয়হরা। মুখের ছন্দকে অস্বীকার করে যে উদ্ধত আছিল সে তো মন ভোলায় না। মুখের তিলের সঙ্গে মুখের আচিলের যে প্রভেদ সার্থক সৃষ্টির সঙ্গে এই ধরনের অনাসৃষ্টির সেই প্রভেদ। মঙ্কোর রাজনৈতিক খাসমহলের

সাবাস পেলেও নাটকটি আমার ভালো লাগে নি। আর-একটি কী নাটক মালি থিয়েটারে দেখেছিলুম তার নামটি মনে নেই। শুধু মনে আছে লেনিনকে স্বশরীরে স্টেজে হাজির করে দিয়েছিলেন নাট্যকার আর তার ফলে তাঁর কপালে জয়-তিলক পরিয়ে দিয়েছিল স্টালিনের সরকারী পত্রিকা-গুলি। 'ইহুদী থিয়েটার'টি ছিল তেভেরস্কায়া বুলভারের ধারে। সরেস অভিনয় অনেকগুলি দেখেছিলুম এই থিয়েটারে। একটি অভিনয় মনের মধ্যে এমন একটি রঙ ধরিয়ে দিয়েছিল যে পঁচিশ বছর হয়ে গেছে আজও মনে সে রঙ-ছুট হতে পারে নি। নাটকটির নাম 'গোয়েল্ম'। একটি পুরনো ইহুদী কাহিনী অবলম্বনে লেখা। অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন একজন ব্যাবি (ইহুদী ধর্ম-যাজক) তাঁর শত্রুদের বিনাশ করবার জন্তে অনেক কাল ধ্যান করে একটি মাটির মূর্তি তৈরি করে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন ও তার নাম দেন গোয়েল্ম। ব্যাবির শত্রুদের একের পর এক নাশ করল গোয়েল্ম তাঁরই কথামত। একদিন এল যখন ধ্বংস করবার আর কিছুই রইল না। গোয়েল্ম কিন্তু তখন হিংসার রসে জারিয়ে উঠে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। নাশের নেশায় সে মাতাল, আর-কিছু না পেয়ে সে ব্যাবির লোকদের মারতে শুরু করল, ধর্ষণ করতে উজ্জত হল ব্যাবির মেয়েকে। হিংসার যে দানবীয় শক্তি ব্যাবি সৃষ্টি করেছিলেন শত্রুদের মারবার জন্তে সে শক্তি তাঁকেই আঘাত করল। মানুষের জীবনের এই চিরন্তন ট্রাজেডি—ক্ষমতার রাক্ষসী ক্ষুধা, আত্ম-স্নেহের লোভ-সিক্ত মাটিতে হিংসার জন্ম, সেই হিংসার জতুগৃহে মানুষের বার বার পুড়ে মরা— চিরকালের এই সমস্যাটিকে আমাদের সামনে সার্থক সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ধরে দিয়েছিল এই নাটকটি। গোয়েল্মের অভিনয় আজও আমার চোখের সামনে শুকতারার মতো জ্বলজ্বল করছে। মানুষের চেহারা অথচ মানুষ নয়, একটি মানুষের অন্তরের ক্ষমতা লিপ্সার আর হিংসার ভীষণ মূর্তি, জীবন্ত অথচ চেতনা-বিহীন, এই রূপ ফুটিয়ে তোলা কী অসম্ভব কঠিন! যে অভিনেতা এই চরিত্রকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি কী অসাধারণ শিল্পী তা রসের মহলে যাদের আনাগোনা আছে তাঁদের বুঝতে দেবি হবে না। এমন অভিনয় আমি খুবই কম দেখেছি। রুশীয় ব্যালের নামজাক অনেক কাল থেকে শুনে আসছিলাম। আনা পাভ্লোভার নৃত্য কলকাতার রঙ্গমঞ্চেই আমার

দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন কিন্তু ব্যালের রূপ বুঝতে পারি নি, শুধু দেখেছিলুম এক অতুলনীয় শিল্পীর নৃত্য-কলা। মস্কোতে থাকাকালীন বল্‌সই থিয়েটারে অনেকগুলি ব্যালে দেখেছিলুম। অভিনয় ও নৃত্যের বহুনি নৃত্য-নাটিকা এই ব্যালে রুশীয়দের বড়ো আদরের। ব্যালেকে প্রত্যেক রুশবাসী যে শুধু তাদের জাতীয় সৃষ্টি হিসেবে গণ্য করে, গর্ব করে তা নয়, রুশীয়দের মতে নৃত্য-কলার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হচ্ছে ব্যালে। ব্যালে আমার ভালোই লেগেছিল। কিন্তু এত ভালো লাগে নি যাতে মনের মধ্যে চিরদিনের মতো তৃষ্ণা লেগে থাকে ব্যালে দেখবার জন্যে। ষতবার ব্যালে দেখেছি ততবার আমার মনে হয়েছে যে অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকায় নৃত্য তার ব্যঙ্গনার চরম শিখরে পৌঁছতে পারছে না। অনেক ঘটনার ভিতর দিয়ে নাটক তার পরিণতির চরম মুহূর্তে (Climax-এ) পৌঁছায়। নৃত্যের বেলায় সেই চরম মুহূর্ত কিন্তু একটি অমুভূতির পরিপূর্ণ উপলব্ধিতে ও তার প্রাণময় প্রকাশে। দুটি বিপরীত প্রকাশ-ধর্মী কলাকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে একটা নতুন কিছু তৈরি করা যায় নিশ্চয়ই কিন্তু তাতে কলার শ্রীবৃদ্ধি হয় না। ‘ক্রাস্‌নিই মাক্’ (লাল আফিং-ফুল) নামের একটি ব্যালের সূখ্যাতি-গুঞ্জে মস্কো তখন মুগ্ধ। অনেক আশা নিয়ে দেখতে গেলুম, ফিরলুম নিরস নিরাশা নিয়ে। বল্‌সই থিয়েটার কানায় কানায় ভর্তি। গভর্নমেন্ট ও লাল পণ্টনের কর্তারা তাঁদের স্পেশাল বক্সে জাঁকিয়ে বসে। পাভলোভার সমসাময়িক প্রসিদ্ধা নৃত্য-শিল্পী গেলৎসার প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন এই ব্যালেতে। স্টেজ, নৃত্য, অভিনয় সবই বেশ ভালো হল কিন্তু তবুও যেন কিছুই হল না। একটি মুহূর্তও এল না যখন আমার মন আপনা থেকে বলে উঠল—এই মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করেছিলুম। রূপের এই প্রকাশে রসের সেই প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে। রসে ভরল না মন, মন তৃষ্ণার্তই থেকে গেল। প্রোপাগান্ডার কচুরিপানায় কলার দীপা স্রোত ঢাকা পড়ে গেল। এই প্রোপাগান্ডাই কিন্তু পেল দর্শকদের উচ্ছ্বসিত সমর্থন। ব্যালের স্রোতে যেখানে যেখানে প্রোপাগান্ডার কচুরিপানার অকারণ-আবির্ভাব সেখানেই নেমে এল দর্শকদের করতালির ঘন বর্ষণ।

দেশে থাকতে আমি ম্যারহোল্ড থিয়েটার-সহজে পড়েছিলুম। এবারে

মস্কোয় এসে সেই বই পড়াটাকে নিজের জানার কণ্ঠি-পাথরে ষাটিয়ে নেবার স্বযোগ পেলুম। বইতে পড়েছিলুম, এবারে মস্কোতে এসে আর্ট-রসিকদের কাছে শুনলুম যে সোভিয়েট রাশিয়ায় একমাত্র ম্যারহোল্ড্‌ই একটা নতুন অভিনয়-শৈলী সৃষ্টি করেছেন। গোগলের ‘রিভিজর’, ‘লিয়েস্’, আর ত্রিচিকফের ‘রিচিকিতাই’ (চীনের আত্ননাদ) এই তিনটি নাটকের অভিনয় দেখলুম ম্যারহোল্ড্‌ থিয়েটারে। স্টেজের যে চেহারা বরাবর দেখে আসছি সেই চেনা চেহারা একেবারে বদল হয়ে গেছে দেখলুম। স্টেজের সেই বনেদী চিকন চেহারা আর নেই, মেদ ঝরে গিয়ে তলার পেশী আর হাড় দেখা দিয়েছে। বোঝা গেল যে উপরের সাজের চেয়ে তলার কাঠামোটি দেখানোর দিকেই ম্যারহোল্ডের ঝোক বেশি। স্টেজের চেহারা ধূসর, পেশীময় ও রুক্ষ হলেও শক্তির সংযত প্রকাশ পরিস্ফুট সেই চেহারায়। অনভ্যস্তের ঝাঁকুনি খেয়ে মনের মেজাজ গোড়ার দিকে বিগড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। আমার মনের অবস্থাটা হয়েছিল ঠিক তাই। আলসে মনের স্বভাবই তো তাই। গোড়ামির বেশির ভাগটাই তো হচ্ছে মনের আলসেমির ফল, অলস মনের অপরিবর্তনীয় আদর্শ নির্ণায়ক ভান। উপরের রঙচঙ বাদ দিয়ে যদি কাঠামোর রূপটিকে ফুটিয়ে তোলা যায় তা হলে সেটাও যে স্টেজ সাজানোর একটি বিশেষ প্রাণবান ধরণ হতে পারে সেটা ম্যারহোল্ডের স্টেজ সাজানোর পদ্ধতি থেকে বুঝতে পারলুম। ত্রিচিকফের ‘রিচিকিতাই’ নাটকটির অভিনয় আমার খুব ভালো লেগেছিল। স্টেজ আর প্রেক্ষাগৃহ, অভিনেতা আর দর্শক এই দুয়ের মধ্যে স্থানগত ব্যবধান রইল না। ঘরের মধ্যে থেকে দলে দলে লোক স্টেজে উঠে গেল, নেমে এসে বের হয়ে গেল। আমাদের দেশে যাত্রায় যেমন ঘটে অনেকটা সেই রকম। তবে আমাদের যাত্রার আলাদা করে স্টেজ বলে কিছু সাজানো হয় না। এখানে সেটা ছিল। স্টেজ আলাদাই ছিল তবে সমস্ত ঘরটিকে বার বার স্টেজে পরিণত করে এইটেই বোধ হয় দেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছিল যে যেটা চোখের সামনে ঘটছে সেটা আমরা শুধু দর্শক হিসেবে দেখছি নে, সেটার অংশীদার আমরাই, সেটা আমাদেরই ঘটছে। এই যুক্তিটা কিন্তু আমার নিজের মনের কথা। ম্যারহোল্ডের সঙ্গে দু-একবার আলাপ করেছিলুম থিয়েটার সম্বন্ধে, তখন নাটক ও স্টেজ সাজানো নিয়ে আলোচনা

করেছিলুম, এবিষয়ে কোনো আলাপ হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। আমার মনে হয় যে যাত্রায় অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে যে একাত্মতা ঘটে সেটা অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে বাঁধা স্টেজের ব্যবধান থাকে না বলেই ঘটে। এটা যে বিশেষ কয়েকটি লোক অভিনয় করছে আমাদের দেখাবার জন্যে যাত্রায় এই দূরত্ব বোধ একেবারে হারিয়ে ফেলি আমরা। মনে হয় যেন ঘটনাগুলি আমাদের জীবনে ঘটছে, ঘটনার ধাক্কায় আমরাই এই ভাবে কথা বলছি, কাঁদছি, হাসছি, রাগ করছি। ‘রিচিকিতাই’-এর অভিনয় দেখে আমার মনের ঠিক এই অবস্থাই হয়েছিল। যা দেখেছিলুম তা যেন আমিই করছিলুম এই রকম গভীর বেদনা অনুভব করছিলুম মনের মধ্যে। ‘রিচিকিতাই’-এর অভিনয় আমি কয়েকবার দেখেছিলুম। প্রত্যেকবার আমার মনের মধ্যে এমনই তোলপাড় হয়েছিল বেদনা-জাগানো অনুভূতির ঢেউয়ের ধাক্কায়। স্টেজ সাজানো সম্বন্ধে ম্যারহোল্ডের সঙ্গে আলাপ করলুম— একদিন তাঁর থিয়েটারে একদিন তাঁর বাড়িতে। তিনি কেন এই ধরনের স্টেজ সাজাচ্ছেন—রঙ বাদ দিয়ে এত কড়া ধূসরতার ও আবরণ বাদ দিয়ে নিছক কাঠামোগত রূপের আমদানি করলেন স্টেজে এই ছিল আমার প্রশ্ন। ম্যারহোল্ড বললেন, রঙের দৌরাণ্ডো লোকে গঠনের রূপ ভুলে যাচ্ছে। বাইরের রঙের দিকে চোখ দৌড়চ্ছে, বলে বস্তুর গঠনের মৌলিকত্ব, তার গঠন রেখার সৌন্দর্য আমরা ভুলতে বসেছি। নতুন সৃষ্টি হল গঠনের অভিনবত্ব, রঙে নয়। যেমন নর-নারীর সৌন্দর্য তাদের দেহের নিখুঁত গঠনে, রঙে নয়। গঠনের দিক থেকে লোকের নজর সরে যাচ্ছে। এটা সৃষ্টির পক্ষে মারাত্মক। এটা নতুন সৃষ্টির যুগ, বিশেষ করে সোভিয়েট রাশিয়ায় তো বটেই। তাই স্টেজে আমি বস্তুর গঠনের দিকে ঘোঁক দিয়েছি। উপরের রঙ বাদ দিয়ে বস্তুর গঠনের সৌন্দর্য অনুভব করতে লোকদের শেখানো দরকার। আমার স্টেজে বাড়ি তাই রঙ-ছুট ইটের কাঠামো দেখানো বাড়ি, চোঁকি তাই কাঁঠ জুড়ে নানা গঠন তৈরি করার নিপুণতার নিদর্শন, উপরের বার্নিশের নমুনা দেখবার বস্তু নয়। উপরের চাপানো রঙ বাদ দিলেও প্রত্যেক বস্তুর যে একটা নিজস্ব রঙ আছে সেটা ম্যারহোল্ডকে স্মরণ করিয়ে দিলুম। তাই গঠনের দিকে মনের নজর টানার জন্য বস্তুর সহজাত রঙকে অস্বীকার করতে হবে কেন? তবে

উপরে-চাপানো রঙ যে গঠনের ঠাট্টা ঢাকবার জগ্রে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সে সম্বন্ধে আমি তাঁর সঙ্গে একমত। গঠনের সুষমা সাধনার বস্তু। সেই সাধনার রুচু সাধন এড়িয়ে গিয়ে রুজ লিপষ্টিক দিয়ে গঠনের খুঁত ঢাকবার চেষ্টা তো আধুনিকাদের একমাত্র কর্ম-যোগ। এই অশ্রান্ত চেষ্টার যে কী প্রাণান্ত পরিণাম তা পুরুষদের মনের কথার সঠিক হৃদিশ পেলে আধুনিকারা বুঝতে পারতেন। ম্যারহোল্ড্ হাসতে লাগলেন, বললেন, রঙের দিকে ঝাঁকটা আজকাল বেশি বলেই আমাকে গঠনের দিকে ঝাঁকটা বেশি দিতে হচ্ছে। ‘রিচিকিতাই’-এর অভিনয় দেখে আমার মনে যে ধাক্কাটা লেগেছিল সে কথা তুলে আমাদের দেশের যাত্রার সঙ্গে তাঁর স্টেজের সাদৃশ্য কোথায় আর পার্থক্যই বা কোথায় সেটা ম্যারহোল্ডকে বললুম। ড্রামা সম্বন্ধেও আলোচনা চলল। বললুমঃ সোভিয়েট সাহিত্যিকদের ড্রামা দেখে আমার ধারণা হয়েছে যে তাঁরা ড্রামার বিষয়বস্তু বদল করে দিয়েছেন। ব্যক্তির মনস্তত্ত্বমূলক আলোচনার বহুনি না হয়ে ড্রামা এখন কর্মের বহুনি, বহুলোকের একত্রে করা কর্মের ঘাত-প্রতিঘাতের বহুনি। একটি ব্যক্তির স্বথ-দুঃখ এখন ড্রামার বিষয়বস্তু নয়, জনগণের স্বথ-দুঃখ, তাদের সমষ্টিগত জীবনের সমগ্রা এখন ড্রামার বিষয়বস্তু। ‘রিচিকিতাই’-এর অভিনয় দেখে আমি এইটেই বুঝেছিলুম। আমার ধারণা সমর্থন করে ম্যারহোল্ড্ বললেন যে এতদিন জনসাধারণের জীবন নাটকের বিষয়বস্তু হয় নি। নাটকের মূল চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তোলবার উপাদান হিসেবে জনসাধারণকে ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। জনসাধারণ নাটকের কেন্দ্রে স্থান পায় নি, তাদের স্থান ছিল কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে সীমানার কাছে। জনসাধারণের জীবন, তাদের স্বথ-দুঃখ নাট্যকারকে একেবারেই স্পর্শ করে নি। এবারে সেই অভাব দূর করেছেন এ যুগের নাট্যকারেরা। আমি বললুমঃ মানুষের জীবনকে যেখানে টাকার আল তুলে সহস্র টুকরোয় বিভক্ত করা হয়েছে যেখানে সেই সংকীর্ণ পরিধির জীবনের সঙ্গে পরিচিত যে রস-শ্রুতি শিল্পী সে যে সেই জীবন থেকে তার সৃষ্টির উপাদান জড়ো করবে এটা খুবই স্বাভাবিক। আলের ও-ধারের মানুষগুলির জীবন সম্বন্ধে হয়তো তার মনে কৌতূহল থাকে, কিন্তু সে কৌতূহল অজানা জগতের বাসিন্দাদের সম্বন্ধে আমাদের মনে যে কৌতূহল আছে ঠিক সেই

রকম কোঁতুহল, তার বেশি কিছু নয়। প্রাণের যোগ নেই যে জীবনের সঙ্গে, সে জীবন সৃষ্টির উপাদান হতে পারে না কখনো। আমাদের ভাগ্য যে এখন এমন সব শিল্পী, এমন সব সাহিত্য-স্রষ্টারা দেখা দিয়েছেন যারা আল-বাধা জীবনের অভিশাপ থেকে, তার সংকীর্ণতার কারাগার থেকে সাহিত্যের উপাদানকে মুক্তি দিয়েছেন, সমস্ত জীবন সাহিত্যের উপাদান এ কথা মুখে স্বীকার করলেও আসলে এত দিন সেটা ছিল শুধু নীতির জবানী কবুলতি। এতদিন পরে গোটা জীবনকে স্পর্শ করবার দিকে এগিয়ে চলেছে সাহিত্য ও শিল্প। সাহিত্য যে কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত হতে পারে এটা খুবই সত্যি কিন্তু তাই বলে এটাও ভুললে চলবে না যে বিষয়বস্তুর বিচারের উপর একটি সৃষ্টি সার্থক সৃষ্টি হয়েছে কি হয় নি সেটা নির্ভর করে না। ম্যারহোল্ডের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। তাঁর নাম আজকাল একেবারেই শোনা যায় না। তিনি মরে বেঁচেছেন না বেঁচে থেকেও মরে গেছেন স্টালিনের ক্রুপায় তা আমার জানা নাই। আমি অন্ততঃ তাঁর জন্তে প্রথমটাই কামনা করি।

‘রিচিকিতাই’-এর অভিনয় দেখার পর থেকে নাটকটির রচয়িতা ত্রিচিকফের সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল। ম্যারহোল্ডের সঙ্গে আলাপের পরে সে ইচ্ছেটা আরো খোঁচাতে লাগল মনের মধ্যে। ভক্স প্রতিষ্ঠানের নবমিরস্কির সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁকে বলতেই তিনি ত্রিচিকফের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার পথ সুগম করে দিলেন। নির্দিষ্ট দিনে সকালবেলা ত্রিচিকফের ওখানে গিয়ে হাজির হলুম। এক-একটি লোককে দেখলেই মন কেমন আপনা থেকে গুটিয়ে যায়। মন সরে আসতে পারলে বাঁচে। আবার এক-একটি লোককে দেখামাত্র মন দুই হাত মেলে দিয়ে কাছে টেনে নেবার জন্তে এগিয়ে যায়। ত্রিচিকফকে প্রথম দেখাতেই আমার বড়ো ভালো লেগেছিল, দীর্ঘ ছ’ফিট শরীরখানি ইম্পাতের মতো ঝড়ু, আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতো মুণ্ডিত মাথা, মুখখানি সজ্জদয়তা ও মানবতার আলোতে উজ্জ্বল। তাঁর বসবার ঘরটি ছোটো, দেখলুম ঘরের দেওয়ালে দু-চারখানি সোভিয়েট পোস্টার টাঙানো রয়েছে। ত্রিচিকফ বললেন যে বৎসরকাল চীনদেশে কাটিয়ে তিনি কয়েক মাস হল মস্কোতে ফিরেছেন। ‘রিচিকিতাই’ নাটকটি যে কেন

এত প্রাণবন্ত হয়েছে তা বুঝতে পারলুম। বর্তমান সোভিয়েট সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মত কী তা জানতে চাইলেন ত্রিচিকফ। বললুম : খুব বেশি না পড়লেও যা পড়েছি তাতে সাহিত্যের সন্ধান কমই পেয়েছি, প্রোপাগান্ডাই বেশরো চীৎকারে ভরে রেখেছে সাহিত্যের আসর। তর্ক বেধে গেল। ত্রিচিকফ বলিলেন : আপনার সমালোচনা থেকে এই আশ্বাসই পাচ্ছি যে আমরা ঠিক পথেই চলেছি। আমাদের সাহিত্য এসথেটিজমের দুর্বলতা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন সমাজ গঠনের জন্তে যা প্রয়োজনীয় তারই কথা সকলকে শোনাচ্ছে। আপনার এসথেটিক মনের কাছে সেইটাই প্রোপাগান্ডা বলে ঠেকেছে। বললুম : আপনার ঘরের দেয়ালে পোস্টার টাঙানো দেখেই সাহিত্য ও কলা সম্বন্ধে আপনার ধারণা আন্দাজ করে নিয়েছিলুম। এসথেটিজমের মানে যদি হয় যে এই পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষের জীবনকে সাহিত্যের উপাদান হিসেবে স্বীকার না করা তা হলে আমি সেই এসথেটিজমের ঘোর বিরোধী। আর এসথেটিজম মানে যদি এই হয় যে সাহিত্যের একটি যে বিশেষ প্রকাশ-ধর্ম ও প্রকাশ-রীতি আছে সেটাকে স্বীকার করা ও মানা তা হলে আমি সেই এসথেটিজমের সমর্থক। নতুন সমাজ গঠনের জন্তে যা-কিছুর প্রয়োজন সে-সবের প্রচার যে খুবই জরুরি তা আমি মানি। এমন-কি, সাহিত্য কিম্বা প্রচার-পুস্তিকা এই দুয়ের মধ্যে যেখানে শুধু একটি ছাপা হতে পারে সেখানে বিশেষ অবস্থায় সাহিত্য না ছাপিয়ে প্রচার-পুস্তিকা ছাপাতেও আমি রাজি, কিন্তু তা বলে সেই প্রচার-পুস্তিকাকে সাহিত্য বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করে নিজের রস-বোধের দৈন্য প্রকাশ করতে আমি রাজি নই। এটা শুধু নিজের দৈন্য প্রকাশই নয়—এটা অপরাধ। বুটোকে সাক্ষা বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা যে শুধু রুচির বিকারের পরিচয় তা নয় সেটা নৈতিক অপরাধ। ত্রিচিকফ একটু শ্লেষের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন : আপনার মতে সাহিত্য কাকে বলে জানতে পারি কি? বললুম : আপনার মানতে বাধা থাকলেও আপনার জানতে বাধা কি? সাহিত্যের বিষয়-বস্তুর কথা আগেই বলেছি। আমার মতে সাহিত্যের বিষয়বস্তু একটি বিশেষ এলাকার মানুষের জীবন নয়, সব এলাকার সব মানুষের জীবন। এ জীবনে এমন-কিছু নেই যা সাহিত্যের বিষয়বস্তু না হতে পারে। শুধু

কুচিভেদে রূপকার বিষয় বাছাই করেন। সে বাছাইটাও পুরোপুরি সচেতন নয়। অনেক অচেতন ও অবচেতন সংস্কারও সেই বাছাইয়ের জন্য দায়ী। কিন্তু এই বিষয়বস্তু যাই হোক-না কেন সেই বিষয়বস্তু শুধু তখনই রূপ পায় যখন সেটি রূপকারের, শিল্পীর কিম্বা সাহিত্য-স্রষ্টার গভীর ভাবে উপলব্ধির বস্তু হয়। সেই একান্তভাবে পার্সোনাল উপলব্ধির যখন ইমপার্সোনাল রূপ নিয়ে অর্থাৎ বিশ্বরূপ নিয়ে সকলের উপলব্ধির ও অনুভূতির বস্তু হয়ে দাঁড়ায় শুধু তখনই সেটা সাহিত্য হয়। তার জন্মে খণ্ড কালের ছোট্ট এলাকা থেকে সেই অনুভূতিকে মুক্ত করে ছুটি দিতে হয় অখণ্ড কালের এলাকায়। রস-স্রষ্টার কাজ হচ্ছে তাই। আপনাদের দিমিয়ান বিয়েদনি আলুর চাষের উপর সেদিন যে কবিতাটি লিখেছেন সেটা পড়েছি। ওটা কবিতা হয় নি কেননা ওটা অনুভূতির রঙে রঞ্জিত হয় নি। হৃদয়বেগের রসে সিক্ত হয় নি। দিমিয়ান বিয়েদনি আলুকে যে মন নিয়ে দেখেছেন তাতে আলু তাঁর মুখের লালায় সিক্ত হয়েছে, অন্তরের রসে নয়। বিয়েদনির মুখের লালায় ভেজা আলুটি সর্বকালের সব মানুষের ভালো লাগবে এমন দাবি করতে পারি কী করে? এবারে ত্রিচিকফও হাসতে লাগলেন, বললেন : আপনি বেশ রসিয়ে বলেন, কিন্তু তবুও আপনি বুর্জোয়া এসথেটিজমের মোহ কাটাতে পারেন নি। যেমন আমাদের লুনাচারস্কি। এখনো তিনি আপনারই মতো অখণ্ডকাল, পার্সোনালের ইমপার্সোনাল রূপ ইত্যাদি মিহি কথা আওড়ান। বললেন : শুধু যে আশ্বস্ত হলাম তা নয়। খুসিও হলাম শুনে যে সাহিত্য সম্বন্ধে সরকারী ফরমান উপেক্ষা করে লুনাচারস্কি এখনো সাহিত্যকে দিমিয়ান বিয়েদনির মন দিয়ে দেখেন না, বিচার করেন না। তাছাড়া শুধু লুনাচারস্কিই বা কেন গর্কিও তো আমারই দলে। ত্রিচিকফ একটু অবাক হয়ে বললেন, গোর্কিকে আপনি কী করে আপনার দলে পেলেন? বললুম : সেদিন প্রাভ্‌দাতে গর্কির একটা লেখা পড়ে আমার এই ধারণা হয়েছে। আপনি নিশ্চয় পড়ে থাকবেন যে একজন তরুণ সাহিত্যিক তার কবিতায় একটি মেয়ের হাতের কোমল আঙুলগুলির ও তার মুখের ডালিম ফুলের মতো রঙের তারিফ করেছিল। আর যায় কোথায়? দিমিয়ান বিয়েদনির দল শকুনির মতো বাঁপিয়ে পড়ল সেই হতভাগ্য সাহিত্যিকের উপর। তার প্রাণ বাঁচানো দুষ্কর হল।

বুর্জোয়া না হলে কি সে নারীর হাতের আঙুল কোমল দেখে, তার মুখের রঙে ডালিম ফুলের রঙের হৃদিস পায়। তা ছাড়া সে নিশ্চয়ই বুর্জোয়া মেয়ের প্রেমে পড়েছে, তার স্বপ্নে মশগুল হয়েছে, কেননা মজুর মেয়ের হাতের আঙুল কি কখনো কোমল হতে পারে? সে তো হবে শক্ত কড়া পরা, তার মুখের রঙ ডালিম ফুলের রঙের মতো না হয়ে হবে কয়লাবরণ। এবারে ত্রিচিকফ প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন, তাঁর স্ত্রী চাষের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে এসে চুপ করে বসে আমাদের আলাপ শুনছিলেন, তিনিও হাসতে শুরু করলেন। বললুম : আপনারা হাসছেন কিন্তু সে বেচারী কবির গলায় ফাঁস পড়বার উপক্রম হয়েছিল, হাসবার সাহস তার ছিল না। ভাগ্যিস গর্কি এই কবির হয়ে দিমিয়ান বিয়েদনিদের ধম্কে প্রাভ্‌দায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাই সে যাত্রায় বেঁচে গেল কবি। সেই প্রবন্ধে গর্কি লিখেছিলেন যে মজুর মেয়ের কল-চালানো কড়া হাতের আঙুল প্রেমিকের চোখে যে কোমল হয়ে বাজে, কয়লার গুঁড়োর বিবর্ণ তার মুখ যে ডালিম ফুলের রঙের স্বপ্ন আনে, এ যে না বোঝে সে অহুভূতির ও হৃদয়াবেগের জগতের কোনো খবরই রাখে না। গর্কি ঠিকই বলেছেন। এই অহুভূতি দিয়ে দেখাটাই হচ্ছে আসল দেখা, সৌন্দর্যের দেখা, আর নিজের এই আসল দেখাটাকে সবার দেখার জিনিস করতে গেলে তাকে ছোট্ট সময়ের বাঁধন থেকে মুক্ত করে বিরাট সময়ের মধ্যে থুয়ে দিতে হয়। ত্রিচিকফ বললেন : গর্কির দোহাই দিলেও আপনার কথা আমি মানতে পারলুম না। প্রয়োজন-সাধনই সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য, সৌন্দর্য-সৃষ্টি সাহিত্যের লক্ষ্য নয়। সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য দিলে গড়ে তোলা বাঁধা পাবে। এসথেটিজম হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভিজমের শত্রু। কোনো জিনিসকে সুন্দর করে তোলবার ইচ্ছা মনে থাকলে তার গঠন-প্রক্রিয়ায় বাঁধা পড়ে। বললুম : আপনার কথা আমি একেবারেই মানতে পারলুম না। সৌন্দর্যকে গঠন-প্রণালীর বিরুদ্ধে জিনিস বলে আমি মানি না। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি সৌন্দর্যকে বাহিরে থেকে চাপানো জিনিস বলে মনে করেন। আমি সৌন্দর্যকে বস্তুর গঠনের অন্ততম অঙ্গ, গঠনের চমৎকারিত্ব বলে মনে করি। গঠনের সঙ্গে সৌন্দর্যের শুধু যে বিরোধ নেই তা নয়। গঠন ও সৌন্দর্যের অবচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আর

সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে যদি কিছু থেকে থাকে তো না সে প্রয়োজন-সাধন না সে সৌন্দর্য-সৃষ্টি। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের একটি অংশকে এমন একটি রূপ দিয়ে বেঁধে সকলের সামনে হাজির করা যাতে সকলের মনের আয়নাতে তার রূপটুকু প্রতিবিম্বিত হয়, সকলের অল্পভূতির মধ্যে সে স্থান পায়। আলোচনা-শ্রোত থেমে গেল ঠোঁটের মধ্যে চায়ের গ্লাসের অনধিকার প্রবেশে। তারপরে অনেকবার ত্রিচিকফের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। মতের মিল কখনো হয় নি, তবুও বন্ধু হিসেবে তাঁকে পেয়েছিলুম। ককেশাসে ক্রুষ সমুদ্রের ধারে গাগ্‌রিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেখানে ঢেউয়ে ভেজা বালির উপর বসে অনেক দুপুর কেটেছে তর্কে। পরে তিনি আর তাঁর স্ত্রী যখন ১৯৩০ সালে বার্লিনে এসে মাস খানেক থাকেন তখন রোজই প্রায় তাঁদের সঙ্গে দেখা হত। আমার পরম বন্ধু মহাপণ্ডিত গুটকিন্ডের ওখানে অনেক সন্ধ্যাবেলা ত্রিচিকফ দম্পতি, আমি ও আরো দু' একজন বন্ধু জুটতুম গিয়ে। দেখতে দেখতে যুক্তির চকমকি ঘর্ষণে জলে উঠত তর্কের আগুন। সে আগুন কিন্তু আলো দিত, পুড়িয়ে দিত না। উনিশ শো ত্রিশ সালে আবার যখন মস্কো যাই তখন ত্রিচিকফের খোঁজ করেছিলুম। তাঁর দেখা পাই নি, তিনি ছিলেন না মস্কোয়। আজকাল তাঁর নাম শোনাই যায় না। সোভিয়েট সাহিত্য সম্বন্ধে যতো বই আজকাল বের হচ্ছে তাতে ত্রিচিকফের কোনোই উল্লেখ নেই। সর্বশাস্ত্র-বিশারদ স্টালিনের ফতোয়ার জোরে যেখানে বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন রাতারাতি নীতি বদলায় সেখানে ত্রিচিকফের সাহিত্যিক জীবনের ও ব্যক্তিগত জীবনের মেয়াদের নিশ্চয়তা কোথায়!

সোভিয়েট সিনেমা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। হলিউডের একটানা উচ্ছ্বাস, ভাবুনেগিরি, গ্যাকামি আর বোন সগুদার বেসাতির উপর বরাবর আমার মনে বিতৃষ্ণা রয়েছে। কলাকে এমন করে কদলী প্রদর্শন কী করে ছনিয়ার লোক এতদিন বরদাস্ত করল তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। শিক্ষিত সমাজের উপর এই গুল অশালীন হলিউড-ফিল্মগুলির চটকের প্রভাব এত বেশি। সোভিয়েট সিনেমায় এই বোন গাজলার চিহ্নমাত্র নেই। জীবনে কত সমস্তা রয়েছে। আর সেগুলো যেমন গভীর ভেমনি বেঁধে তরা। সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে সেগুলিকে সকলের

সামনে ধরে দিতে পারলেই তো সার্থক হল শিল্পী। আইসেন্স্টাইনের 'পোট্টেমকিন' দাভচেংকোর 'আরসিনাল', 'জেমলিয়া' প্রভৃতি চমৎকার কয়েকটি ফিল্ম দেখলুম। বুঝলুম আইসেন্স্টাইনে, দাভচেংকো প্রভৃতি অসাধারণ শিল্পীরা জীবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন, সমস্ত জীবনের বাতাস তাঁদের মনকে স্পর্শ করেছে, সমস্ত জীবনের রসে তাঁদের বুকের মাটি সিক্ত হয়েছে, নইলে এমন সৃষ্টি কখনো সম্ভব হত না। আইসেন্স্টাইন তখন 'জেনারেল লিনিয়া' ছবিটি তুলছিলেন। একদিন তাঁর স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলুম। আইসেন্স্টাইন বললেন : যে তাঁর ফিল্মগুলিতে পেশাদার অভিনেতাদের তিনি কখনো নেন না। পথে ঘাটে রেলওয়ে স্টেশনে যেখানে যখন কোনো ভালো টাইপ তাঁর চোখে পড়ে তিনি তখনই তাকে নিয়ে আসেন তাঁর ফিল্মের জন্যে। ফিল্মের বিষয়বস্তু টেকনিক সব বদল করে দিয়েছেন এঁরা। একটি ব্যক্তির জীবন এদের ফিল্মের বিষয়বস্তু নয়, হাজার হাজার লোকের সমষ্টিগত জীবন এখন ফিল্মের বিষয়বস্তু। এই হাজার হাজার লোক যেখানে একক নায়ক-নায়িকার স্থান নেয় সেখানে টেকনিক স্বভাবতই বদল হতে বাধ্য। একের জীবন ফোটানো আর সমষ্টির জীবন ফোটানো একই কলা-কৌশলে কখনো সম্ভব নয়। এখানে ব্যক্তির জীবনের মনস্তত্ত্বমূলক ঘাত-প্রতিঘাতের খেলা ছবিতে ফুটিয়ে তোলা লক্ষ্য নয়, এখানে প্রকৃতির ও সমাজের ধাক্কায় সাধারণ মানুষ কি ভাবে জীবন কাটায় সেইটে ফুটিয়ে তোলাই হচ্ছে শিল্পীর উদ্দেশ্য। একটি লোকের চলার, বলার ও ব্যবহারের একটি স্বর আছে। সে স্বরের সঙ্গে বহু লোকের একসঙ্গে চলার, বলার ও ব্যবহারের স্বরের কোনো মিল নেই। এই বহু লোকের চলার স্বর ও তার প্রবল ছন্দ সিনেমায় ফুটিয়ে তোলা আইসেন্স্টাইনের আগে আর কেউ করেন নি। সোভিয়েট সিনেমা সোভিয়েট সাহিত্যকে পিছনে ফেলে অনেক আগে এগিয়ে গিয়েছে। সোভিয়েট সাহিত্য তার রূপ তার শৈলী কিছুই সৃষ্টি করতে পারে নি। সোভিয়েট সিনেমা একেবারে নতুন শৈলী সৃষ্টি করেছে। আর আইসেন্স্টাইনের অসামান্য প্রতিভা এই সৃষ্টির সূচনা করেছিল, স্টালিনের কতোয়্য নয়। আইসেন্স্টাইনের সঙ্গে আমার আবার দেখা হয় বার্লিনে। হলিউডে কিছুকাল কাটিয়ে রাশিয়ায়

ফিরে যাবার পথে তিনি বার্লিনে কিছুদিন ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেবীকা আর হিমাংশু রায়ের আলাপ করিয়ে দেই আমি। হিমাংশু রায় 'লাইট অফ এশিয়া' ফিল্মটি আইসেনস্টাইনকে দেখান। এই রকম ফিল্ম যে তাঁরা আইসেনস্টাইনকে দেখাতে লজ্জা পেলেন না এতেই আমি লজ্জা পেয়েছিলুম। আইসেনস্টাইনের মতামত দেবীকা কিংবা হিমাংশুকে জানিয়ে তাঁদের অকারণ দুঃখ দেই নি। আইসেনস্টাইনের প্রতিভাও বেশি দিন বরদাস্ত করা হল না স্টালিনের খাস দেওয়ানী ডিক্টেটোরি রাজত্বে। তাঁর ফিল্মে সোভিয়েট সমাজের জীবনের খাঁটি ছবি থাকছে না, তাঁর ফিল্ম সোভিয়েট সমাজ-গঠনের দিকে ঠিক মত ঝোঁক দিচ্ছে না, ইত্যাদি একান্ত অজ্ঞ সমালোচনা শুরু হল আইসেনস্টাইনের বিরুদ্ধে। চিরকালই প্রতিভাহীনদের অজ্ঞ বিদ্রোহ প্রতিভাবানদের ছোবল মারে। আর্টকে তিনি স্টালিনের ফতোয়ার আর অজ্ঞ হিংস্রদের সমালোচনার সেবাদাসী করতে রাজী হন নি এই অপরাধে আইসেনস্টাইনকে অকারণভাবে ঠেলে বের করে দেওয়া হল তাঁর সৃষ্টির এলাকা থেকে। মৃত্যু কিন্তু তাঁর উপর করুণা করেছে।

মস্কোতে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে দেখা হল এক সহকর্মী ভারতীয় বন্ধুর ঘরে। মহেন্দ্রপ্রতাপ এখন জাপান, বার্লিন আর আফগানিস্তান এই তিন মূলকের মধ্যে মাকুর মতো ঘুরছেন। ধীর শাস্ত মহেন্দ্রপ্রতাপ হচ্ছেন ভদ্রতার অবতার। তাঁর উপর রাগ করা অসম্ভব। ধর্ম মানেন না বলে কমিউনিজমের তিনি ঘোর বিরোধী। তর্ক বেধে গেল, কিন্তু হাওয়ায় ঘুসি মারার মতো তাঁর অত্যধিক বিনয়ের উপর আমার কোনো সমালোচনাই দাগ দিল না। নভেম্বর বিপ্লবের পরে তিনি মস্কোয় আসেন ও লেনিনের সঙ্গে দেখা করেন। সেই মূলাকাতের যে বিবরণ মহেন্দ্রপ্রতাপের নিজের মুখ থেকে শুনেছি তা চমৎকার রসালো। লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে যান যখন মহেন্দ্রপ্রতাপ তখন তাঁর চাকরটিকেও সঙ্গে নিয়ে যান। দু-চারটি কথা হবার পরেই মহেন্দ্রপ্রতাপ লেনিনকে জিজ্ঞেস করেন তিনি ভগবান মানেন কিনা। উত্তরে লেনিন বলেন যে তিনি ভগবান মানেন না। মহেন্দ্রপ্রতাপ লেনিনকে বলেন যে তিনি যখন ভগবান মানেন না তখন নভেম্বর বিপ্লব ভেঙে যাবে, সফল হবে

না। উত্তরে লেনিন বলেন যে ভগবান মানেন না বলেই তিনি জয়লাভ করেছেন, নইলে ভগবানের ঘূর্ণিতে পড়ে বিপ্লবের নৌকো বানচাল হয়ে যেত। এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের পরে লেনিন মহেন্দ্রপ্রতাপের চাকরটির সঙ্গে দোভাষী মারফৎ কথাবার্তা শুরু করেন আর প্রায় আধ ঘণ্টা তার মুখ থেকে ভারতবর্ষের সব খবর শোনেন। মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে আর কোনো আলাপই করেন নি লেনিন। তাঁর চাকরের সঙ্গে লেনিন আধ ঘণ্টা কথা বললেন অথচ তাঁর সঙ্গে মাত্র কয়েক মিনিট, এই মারাত্মক অপরাধের জন্য মহেন্দ্রপ্রতাপ লেনিনকে কখনো ক্ষমা করেন নি। বার্লিনে মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে আমার প্রায় রোজই দেখা হত ভারতীয়দের আড্ডা ‘হিন্দুস্থান হাউস’-এ তিনি তখন ‘ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন’ নামক পত্রিকাটি বের করতে মশগুল। পত্রিকাটির গুরুত্ব তার সম্পাদকমণ্ডলীর নাম থেকেই ধরা যাবে। সম্পাদকের নামের জায়গায় লেখা থাকত—প্রতাপ, পিটর, মহম্মদ। এঁরা কারা জিজ্ঞেস করেছিলুম মহেন্দ্রপ্রতাপকে। তাঁর কাছ থেকেই জেনেছিলুম এ সব তাঁরই নাম। ‘ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন’ এর সম্পাদক শুধু প্রতাপ দেখলে পাছে লোকে এটিকে হিন্দুর ব্যাপার বলে ধরে নেয়, এই জন্তে তিনি নিজের নাম দিয়েছেন পিটর ও মহম্মদ। নিজের নাম করণ করে আন্তর্জাতিক সমস্তা সমাধানের এই কঠোর সাধনা মহেন্দ্রপ্রতাপ ছাড়া আর ক’জনই বা করেছেন এই পৃথিবীতে? তাঁর প্রকাণ্ড কালো ওভারকোটের পকেট দুটিতে ‘ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন’ ঠাসা থাকত। পত্রিকাটি তিনি নিজের খরচে ছাপতেন, ডাকটিকিটের খরচা নিজেই বহন করে নানা জায়গায় পাঠাতেন আর বাকিটা আমাদের মতো অবুঝদের বুঝদার করবার আশায় বিলোতেন তিনি। কাগজে দেখেছি মহেন্দ্রপ্রতাপ দেশে ফিরে এসেছেন। দেশে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। এক-এক সময় জানতে ইচ্ছে করে তাঁর ‘ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন’ বাহাল তবিয়ৎ ও খুস মেজাজে আছে কিনা। উনপঞ্চাশী হাওয়া বড়ে। সর্বনেশে, কাকে কখন ঘুরিয়ে মারে বলা শক্ত। মহেন্দ্রপ্রতাপ লোকটি কিন্তু খুবই চমৎকার।

কমিউটারের সঙ্গে যুক্ত থাকায় আমাদের নামাধরনের কাজ লেগে থাকত। নানা দেশ থেকে যে-সব কমিউনিস্টরা আসতেন তাঁদের নানা

প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করতে যেতে হত। কমিন্টার্ন থেকেই প্রোগ্রাম ঠিক করে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হত কোথায় কাকে কবে বক্তৃতা দিতে যেতে হবে। আমাকে নানা জায়গায় বক্তৃতা দেবার জন্তে যেতে হত তার মধ্যে বিশেষ করে মনে আছে মস্কোর ‘ত্রিগোরনি’ নামক বিখ্যাত কাপড়ের কলের মজুরদের সভায়, জার্নালিজম্ শেখবার জন্তে যে শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, সেই শিক্ষাকেন্দ্রে আর মস্কো শহরের বাইরে লাল পন্টনের ব্যারাকে বক্তৃতা দিতে যাওয়ার কথা। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদের কৌতূহলও যেমন অপরিসীম, জানবার আগ্রহও তেমনি প্রবল। ইয়োরোপের অন্য অন্য দেশেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতূহল কম নেই, কিন্তু সেখানে কৌতূহলের বেশিরভাগটা হচ্ছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা। ভারতবর্ষের লোক হাত দেখে সবকিছু বলে দিতে পারে, নানা ম্যাজিক জানে, (যোগী বলতে ইয়োরোপের সাধারণ লোক ম্যাজিক দেখনে-ওয়ালাকে বোঝে) মাটি থেকে উপরে শূণ্যে বসতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি নানা আজগুবি ধারণা তাদের মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। সোভিয়েট রাশিয়ায় যে এই ধরনের ধারণা একেবারে নজরে পড়েনি তা নয় কিন্তু তবুও এটা বলতেই হবে যে মজুর, চাষী, ছাত্র, লাল পন্টন প্রভৃতি সোভিয়েট দেশের জনসাধারণের মধ্যে যেখানে গিয়েছি সেখানে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা, ভারতের চাষী, মজুর, মধ্যবিত্তদের অবস্থা জানবার জন্তে গভীর আগ্রহ দেখেছি। আমাদের দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ের সম্বন্ধে তাদের যে কত দরদ তাও সোভিয়েট রাশিয়ায় নানা জায়গায় ঘোরবার সময় বার বার আমার নজরে এসেছে। বহু জায়গায় বক্তৃতার পরেই তাঁরা একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের আন্দোলনকে সাহায্য করবার কথা ভুলেছে। লাল পন্টনের ব্যারাকে যেদিন বিকেলে বক্তৃতা দিই সে-দিনটা ভোলবার নয়। আমি আর একজন ইংরেজ কমিউনিস্ট, আমাদের দুজনকে পাঠান হয়েছিল সে-দিনকার বৈকালী সভায় বক্তৃতা দেবার জন্তে। লাল ফৌজের শত শত সৈনিক আমাদের ঘিরে বসলো। পন্টনের অধিনায়ক আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার পর আমরা দু’জনে বক্তৃতা দিলাম। এত আগ্রহের সঙ্গে অন্য দেশের খবর যারা শুনছিল তারা বেশীর ভাগই চাষীর ছেলে। নিরক্ষর নয়, কিন্তু যাকে শিক্ষিত বলে, তাও

নয়। অথচ মনকে জাগিয়ে তোলা, নিজের মনের অনির্বাক্য পল্‌তেতে আগুন জেলে দেওয়া যদি শিকার উদ্দেশ্য হয় তাহলে সে-শিকার তাদের হয়েছে বলতেই হবে। আমাদের বক্তৃতার পর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে তারা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। সবশেষে বক্তৃতা দিলেন সেই ফৌজের নায়ক। বিপ্লবের আগে সাধারণ লোকদের কি দুর্দশা ছিল রাশিয়ায় সে কথা আমাদের শোনালেন। লাল ফৌজ সম্বন্ধে বললেন যে, এ-ফৌজ যে শুধু সোভিয়েট রাষ্ট্রের ফৌজ তা নয়, এ-ফৌজ বিশ্ব-বিপ্লবের ফৌজ। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের মুক্তির জন্ত এ-ফৌজ সর্বদাই তৈয়ার। সোভিয়েট রাষ্ট্রের এক তিল জায়গাতেও জনসাধারণের দুশমন সাম্রাজ্যবাদীরা আর কখনো প্রবেশ করতে পারবে না। বলতে বলতে উত্তেজনায় তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছিল যেন মুখের হাজার হাজার রক্তবিন্দুর পল্‌তেতে আগুন জ্বলছে, তারই আভায়ে তাঁর মুখটি জ্বলজ্বল করছে। তাঁর বক্তৃতা শেষ হতেই সৈনিকরা তাঁকে তাদের মাথার উপর উঁচু করে তুলে ধরে জয়ধ্বনি তুলল। আমাদের দু'জনকেও মাথার উপর তুলে ধরে শত শত তুলে-ধরা হাতের উপর দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে নিল। মাটিতে কোনো রকমে দাঁড়িয়েছি অমনি ফৌজের নায়ক আমাদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমো দিলেন। ঠিক এতটা আদরের জন্তে প্রস্তুত ছিলাম না। ইংরেজ বন্ধুটি আমার অনেক আগে থেকেই মস্কোয় বাস করছেন। তাঁর কথা থেকেই বুঝলুম আদর করবার এই কায়দা ভদ্রকার মতোই এখানে, সর্বজনগ্রাহ্য। এ দু'বিষয়ে শ্রেণী-সংঘাত নেই! অনেক রাত পর্যন্ত গান ও নাচ চলল। আমরা ঘিরে বসলুম মাঝে অনেকটা খোলা জায়গা রেখে। লোক-সংগীত, বিপ্লবের গান, লাল ফৌজের গান একটানা গেয়ে চলল সৈনিকরা। কী চমৎকার গলা এদের। তারপর শুরু হল নাচ। বালালাইকার বাজনার সাথে সৈনিকরা নাচতে লাগল। এমন হালকা করে পা' ফেলা ঠেঁজেও খুব কমই নজরে পড়ে। কলা-লক্ষী রুশীয়দের রক্তের মধ্যে সুরের ও ছন্দের রহস্য খুঁয়ে দিয়েছেন। নইলে একটা গোটা জাতি এরকম কলা-সম্পদ পেল কোথা থেকে?

শিক্ষা-নিকেতনের পড়াশুনা, কমিন্টার্নের কাজ, নানা জায়গায় বক্তৃতা

এ-সব চলেইছিল একটানা। তারই মধ্যে যতটুকু অবসর আমার জুটছিল সে সময়টুকু সোভিয়েট সমাজের গোটা চেহারাটা দেখে নেবার কাজে পুরোপুরি লাগিয়েছিলুম। ছোটোদের গল্প লেখক লিডিন, কবি লিস্কভ, বিখ্যাত কবি আনা আখ্‌মাতোভা প্রভৃতি অনেক সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা করেছিলুম। এই-সব নানা আলাপ, নানা ঘোরাফেরার মধ্যে একটা জিনিস দেখেছিলুম যেটার রঙ কালো, আজও ধুয়ে দিতে পারিনি মন থেকে। মস্কোর শিশুদের থিয়েটারের কথা অনেক শুনেছিলুম, একদিন সুরাকে সঙ্গে নিয়ে সেই থিয়েটার দেখতে গেলুম। থিয়েটারের প্রধান পরিচালিকা নাটালিয়া সার্ট্‌স্‌ ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ হল। ছোট ছেলে-মেয়েতে ঘর ভর্তি। মস্কো থিয়েটারের প্রসিদ্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা শিশুদের জন্তে অভিনয় করছেন, দেখলুম শিশু-মনস্তত্ত্ববিদ শিক্ষকেরা শিশুদের মধ্যে বসে তাদের মনের ভাব লক্ষ্য করছেন। নাটকের কোনো জায়গাটা তাদের মনে লাগে নি, তারা চুপ করে আছে, কোনো জায়গায় শিশুদের হাসিতে ঘর আলো হয়ে উঠেছে, শিশুদের মনের এই-সব আলোছায়ার খেলা, তার প্রতিটি রেশ লিখে নিচ্ছেন শিক্ষকেরা। তারপরে শিক্ষকেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নাটকটিকে শিশুদের মনের উপযোগী করে আবার বদল করছেন। এখানে অভিনয় দেখে ইস্কুলে ইস্কুলে সেই নাটকটির অভিনয় করবার জন্তে বাচ্চারা তোড়জোড় করে। শিক্ষকেরা তো উৎসাহ দেনই, থিয়েটারের পরিচালকেরাও ইস্কুলে ইস্কুলে গিয়ে বাচ্চাদের অভিনয় করতে শেখান, শিশুদের মনের মধ্যে কল্পনার যে জগৎ সেই জগতের নানা মহলের দরজা শিশুদের দিয়েই তারা খোলান, নিজেরা হটপাট করে দরজা খুলতে গিয়ে তাঁরা দরজা ভেঙে বসেন না। পুস্কিনের লেখা ‘রাবোচি বল্‌দা’ (বোকা মজুর) আর অন্য একজনের লেখা ‘বাদর ও তার বন্ধু’ এই দু’টি নাটকের অভিনয় দেখেছিলুম। পঁচিশ বছর হয়ে গেছে আজও শিশুদের হাসি আর তাদের হাততালি কানে বাজছে।

আমার ঘরের ভাগীদার ফ্রিটজ্‌ একদিন ‘প্রাত্‌দা’ পড়তে পড়তে বললে; তেভের্‌স্‌কায় পোষ্ট আর টেলিগ্রাফের সেন্ট্রাল অফিসে বিপ্লবী শিল্পীদের প্রতিক্রিয়া ‘আ-খ-র’ তার বাৎসরিক চিত্র-প্রদর্শনী শুরু করেছে।

যদি দেখবার ইচ্ছে থাকে তো যাওয়া যেতে পারে। তারপর দিন সকাল-বেলা ফ্রিটজ্, আর আমি প্রদর্শনী দেখতে গেলুম। ঘরের মধ্যে ছবি দেখছি, হঠাৎ বাইরে থেকে শ্লোগানের ধ্বনি কানে আসতে লাগল। ঘুরে দেখি স্টালিন, বুখারিন, ভরসিলভ্ ও আরো কয়েকজন সোভিয়েট নেতা প্রদর্শনী দেখতে এসেছেন। আমাকে দেখে বুখারিন এগিয়ে এসে হাত ধরে কুশল শুধালেন। রাশিয়ায় যাবার আগেই বুখারিনের নাম শুনেছিলুম, তার লেখা ‘ডায়লেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্’ পড়েছিলুম, রাশিয়ায় পৌঁছবার কয়েক দিন পরেই কমিন্টার্নে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। তারপরে বারবার নানা কাজে নানা অস্থানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, যখনই কোনো মুশকিলে পড়েছি, সোভিয়েট রাশিয়ার কোনো কিছুর সম্বন্ধে আমার মত ব্যক্ত করে বিরুদ্ধতার ঝোড়ো হাওয়ার সৃষ্টি করেছি, আমাকে ছোব্লাবার জন্তে ঈর্ষাকুটিল ফণা তুলেছে, তখনি আমি বুখারিনের কাছে গেছি, সব কথা তাঁকে জানিয়েছি। উদার ধৈর্যের সঙ্গে তিনি সব কথা শুনেছেন, আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, অনেকবার আমি তাঁর মতামত মানতে পারি নি। তাঁকে বলেছি আমার মনের আশঙ্কার কথা। বলেছি যে সোভিয়েট রাশিয়ায় এমন অনেক জিনিসের দেখা আমি পাচ্ছি যা কমিউনিজমের দিকে আমাদের নিয়ে না গিয়ে উল্টো দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বুখারিন আমার আশঙ্কাকে বাঁধা বুলির ধামাচাপা দিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন নি। বলেছেন : ‘এমনি আঁকাবাঁকা পথ দিয়েই আমাদের যেতে হবে, উপায় নেই। আমি তর্ক করেছি তাঁর সঙ্গে, মানতে পারি নি তাঁর কথা। ক্রেমলিনে তিনি থাকতেন না, একটি হোটেলে ছুটি ঘর নিয়ে অতি সাধারণভাবে থাকতেন সেখানেও আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছি। স্টালিনের মতো নিজেকে দুশ্রাপ্য করে তিনি কখনও নিজের কদর বাড়ান নি, কাছ থেকে দেখে যার ব্যক্তিত্বের আলো মরীচিকা বলে বোধ হয় বুখারিন সেই স্টালিন-জাতীয় লোক ছিলেন না আদর্বেই। যত কাছে গেছি তত তাঁর আলো আরো জলজল করে উঠেছে। তখন আমি বুঝি নি যে, তাঁর মনেও ঝড় উঠেছে, তিনিও স্টালিনের হিংস্রতা ও মানবতা বিরোধী কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, তখন ট্রটস্কির বিরুদ্ধে স্টালিনের লড়াইতে বুখারিনই যুক্তি যোগালেন স্টালিনের অপকর্মের

যে সমালোচনা করছিলেন ট্রট্‌স্কি সেই সমালোচনার উত্তরে। স্টালিনের সেই কদৰ্শ হিংস্রতাকে সমর্থন করে যে দুর্বলতা দেখালেন বুখারিন সেই দুর্বলতা যে শুধু তাঁকে আর আরো অনেক বিপ্লবীদের হত্যা করার স্বযোগ দিল স্টালিনকে তা নয়, সেই দুর্বলতা কমিউনিজকেও মারাত্মক আঘাত হানল। দুর্বলতার দেনা বুখারিন তাঁর জীবন দিয়ে মেটাতে চেষ্টা করেছেন, শোধ হয়তো হয় নি আজও, নইলে আজও স্টালিন হত্যার পর হত্যা, বর্বতার পর বর্বরতা বেপরোয়াভাবে করে চলেছে কী করে? ১৯৩০ সালে আমি যখন আবার মস্কোয় যাই তখন বুখারিনের কথা জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে তিনি আর স্টালিনের নেকনজরে নেই। স্টালিন তাঁকে দিয়ে ট্রট্‌স্কির বিরুদ্ধে লড়াইটা চালিয়ে নিয়ে যেই ট্রট্‌স্কিকে হারিয়ে দিল অমনি তখন বুখারিনকে কী করে সরানো যায় তার জন্ত বড়যন্ত্র শুরু করে দিল। স্টালিন যে কত ভোঁতা কত নীচুধরের লোক এটা যারা বছরের পর বছর তার সঙ্গে গুঁঠা-বসা করে জেনেছে তারা বেঁচে থাকতে তার নগণ্য অতীতের উপর স্টালিন চিরকালের মত ঢাকনা দিয়ে দেয় কী করে? কী করেই বা এই পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত বড়লোক এসেছেন তাঁদের সকলের চেয়ে জ্ঞানে, প্রতিভায়, শৌর্ষে, বীর্ষে নিজেকে বড়ো বলে চালিয়ে দেয় স্টালিন? স্টালিনের মতো লোকেরও তো নির্লজ্জতার একটা সীমা আছে। সরল, উদার, জ্ঞানী বুখারিনের কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। বুখারিন সম্বন্ধে লেনিন একবার বলেছিলেন যে উপায় নেই বুখারিনকে না ভালোবেসে, লেনিন খুব ঠিক কথাই বলেছিলেন।

“আ-থ-র” প্রদর্শনী দেখে বুঝলুম যে, না টেকনিক, না শিল্পনৈপুণ্য, না ভাব কোনো দিক থেকেই যাদের তাঁরা বুর্জোয়া শিল্পী বলে নাক সিটকোন তাঁদের থেকে সোভিয়েট শিল্পীরা এক পাও এগিয়ে গেছেন। টেকনিকও যেমন সেই মাকাতা আমলের, দৃষ্টিভঙ্গিও তেমনি সনাতন। শুধু লাল কাপড়ে গা ঢেকে সেকাল আপনাকে একাল বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। ধনীদের মূঠোর বাঁধা দেশগুলিতে হিওল্‌বুর্গ, চার্চিল, আইসেনহোয়ার প্রভৃতির ছবি হাজারে হাজারে ঐঁকে থাকেন সেই-সব দেশের শিল্পীরা। এই-সব ছবির ম্যাজিক দিয়ে জনসাধারণের মনকে অভিভূত করাই হচ্ছে তাঁদের উদ্দেশ্য। সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যাঙের ক্ষীতিমাকে

দেখানোই হচ্ছে এই রূপকারদের মতলব। ব্যক্তিত্বকে আমি আদবেই অস্বীকার করি না। তা ছাড়া এই অস্বাভাবিক স্ফীতিমা দেখানোর সঙ্গে ব্যক্তিত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। সমুদ্রের অসীম জলরাশির সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউয়ের যেমন নিবিড় সম্বন্ধ আমার মতে সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ তেমনি গভীর, তেমনি অবিচ্ছিন্ন। ঢেউয়ের সঙ্গে জল-রাশির সম্বন্ধ স্বীকার করার মানে যেমন ঢেউকে লঘু করা নয়, তেমনি ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সত্য সম্বন্ধ স্বীকার করার মানে ব্যক্তিত্বকে লঘু করা কিংবা তার মহত্বকে খর্ব করা নয়। যে কথা বলছিলুম, ‘আ-খ-র’ প্রদর্শনীতে দেখলুম অগুন্তি ছবি স্টালিনের আর ভরসিলভের। অগ্ন্যাগ্ন বংশোদ্ভিক নেতাদের ছবিও দু-একটি ছিল। ভরসিলভের ছবির সঙ্গে হিগেনবুর্গের কিংবা কিচনারের যে-সব ছবি দেখেছি তাদের কোনো তফাত নেই। স্টালিনের ছবিগুলোও ঠিক তেমনিভাবেই আঁকা হয়েছে যে কায়দায় পঁয়কারে কিংবা নেপেলিয়ঁর ছবি এঁকেছেন ক্যাপিট্যালিস্ট দেশের শিল্পীরা। বুঝলুম ‘বিপ্লবী শিল্পী’ এই তক্কা লাগিয়ে ঘুরলেও সোভিয়েট শিল্পীদের মধ্যে এমন একজনও শিল্পী এখনো দেখা দেননি যিনি ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সত্য সম্বন্ধ-রস উপলব্ধি করে তাকে রেখা ও রঙে রূপ দিতে পারেন। মার্শাল হওয়া, অর্ডার অব স্টালিন খেতাব পাওয়া সবই সম্ভব স্টালিনের হুকুমে কিন্তু প্রতিভা, সৃজনী-শক্তি সে স্টালিনেরও হুকুম মানে না।

রুশীয় জনসাধারণের জীবনপ্রণালীর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্য শিক্ষা-নিকেতন থেকে আমরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে কেউবা গ্রামে চাষীদের মধ্যে কেউবা কারখানায় মজদুরদের মধ্যে একমাস থেকে আসতে গেলুম। আমি বেছে নিয়েছিলুম কারখানার কাজ। মস্কো থেকে ট্রেনে এক ঘণ্টার পথ পাদল্‌স্ক, একটি ছোট্ট শহর। পুরো শহরও ঠিক বলা যায় না। কারখানাটিকে ঘিরে যে-সব বাড়ি উঠেছে, রাস্তা হয়েছে সেইটুকুই শহর। সেখানে সেলাইয়ের কলের কারখানার কাজ করবার জন্যে ইংরেজ, চীনে, আমেরিকান, পোল, জার্মানী ও ভারতীয় নানা দেশ থেকে আগত আমরা আটজন গিয়েছিলুম। প্রকাণ্ড কারখানা, প্রায় তিন হাজার লোক কাজ করে কারখানাটিতে। বিপ্লবের আগে এটা ছিল কোম্পানীর সম্পত্তি। বিপ্লবের পরে অজ্ঞান কোম্পানীর মতো এটাও বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া

হয়েছে। এখন কারখানাটিকে এমন করে গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে যে দরকার হলে যে-কোনো মুহূর্তে যুদ্ধের উপকরণ তৈরি হতে পারে কারখানাটিতে। কারখানা থেকে কিছু দূরে মজদুরদের জন্য একটি প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। আমরা সেই বাড়ির একতলার দুটি ঘর নিয়ে নিজেদের থাকবার ব্যবস্থা করে নিলুম। তখন শরৎকাল, বৃষ্টি লেগেই থাকে। আর শহরটির পথে এমনি কাদা যে পথ চলা দায়। কারখানার বাঁশি বাজতেই আমরা কাজে যাই, সঙ্গে নিয়ে যাই স্যান্ডুইচ কাগজে মুড়ে। একটা নাগাদ আধ ঘণ্টার জন্যে ছুটি হয় তখন স্যান্ডুইচ খেয়ে আমাদের দুপুরের খাওয়া সারি। বিকেলবেলা কারখানা ছুটি হলে সোজা রেস্টোরাঁয় গিয়ে হাজির হই। মাত্র একটি রেস্টোরাঁই ছিল শহরটিতে। কাঠের দোতলা বাড়ি, লোকে ভর্তি হয়ে যায় কারখানা ছুটি হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এদেশের লোকেরা আমাদের মতো নোংরা, ঘরের মধ্যে থুথু না ফেলতে পারলে যেন স্বস্তি হয় না, রেস্টোরাঁর চামচ-কাঁটা-প্লেট এমনি অপরিষ্কার যে, আমরা কাঁটা চামচ সঙ্গে নিয়ে যেতুম। কারখানার কী কাজই বা আমি জানতুম যে কাজ করব! তাই অপটু আমাকে মেশিন সাফ করবার কাজ দেওয়া হয়েছিল। সাত ঘণ্টা তেল আর কালি নিয়ে কারবার করে বিকেলবেলা কালিঝুলি মেখে রেস্টোরাঁয় যেতে বেশ একটু গর্ব অনুভব করতুম। কালিঝুলি মেখে বেরাদারির মধ্যে স্থান পেয়েছি। জাতে উঠেছি এইরকম ছেলেমানুষি জাঁক তখন জায়গা পেত মনের মধ্যে। আশেপাশে যারা কাজ করত তাদের অবস্থা জানবার জন্যে নানা প্রশ্ন করতুম। অবিশ্রি যে-সব বাবু বেড়ানেওয়াল এক সপ্তাহ কিম্বা বড়োজোর একমাস একটি দেশে থেকে কতকগুলো কেতা-দুরন্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে দেশে ফিরতে না ফিরতেই তিনশো পাতার একটা বই লিখে ফেলেন তাঁদের সঙ্গে কোনো বিষয়েই পাল্লা দেবার মনোবৃত্তি আমার সেদিনও ছিল না, আজও নেই। আমি খবর কুড়োতে ব্যস্ত ছিলাম না। আমি সোভিয়েট সমাজের নতুন বাঁধুনিটা রোববারে জন্মে, তার সম্বন্ধে ঝরঝরে ধারণা মনের মধ্যে খিতিয়ে নেবার জন্যে উঠেপড়ে লেগে গিয়েছিলাম। কোন্ পথে আমরা চলেছি, শ্রেণীভেদ লুপ্ত মানব-সমাজের দিকে আমরা এগোচ্ছি, না শুধু শ্লোগানের চক্ৰমকি ঠুকে মরীচিকা সৃষ্টি করছি—এই প্রশ্ন অবিভ্রান্ত থাকে

দিচ্ছিল আমার মনের মধ্যে। শুধু যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলগুলো ভাঙতে হবে তাই নয়, যারা রাষ্ট্রের কর্ণধার তারা না আবার নতুন আল বেঁধে নিজেদের মরাইতে বেশি ধান তোলে সেটাও দেখা দরকার। মজুরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমি এই সবই বোঝবার চেষ্টা করছিলুম। তলাটাকে উপরের সঙ্গে এক মস্তুরে মিলিয়ে দেওয়া যায় না সত্যি, কিন্তু তলা থেকে মানুষগুলোকে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় আর উপরের মানুষগুলো যাতে অগুনতি মানুষের মাথার উপর পা-রেখে আরো উপরের দিকে উঠতে না পারে তার জন্তে অর্থনৈতিক ধাপগুলোকে ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব। তখনো ‘স্টাঘানোভিজম’-এর নাম করে অর্থনৈতিক বৈষম্যর নানা মহলে বাস করাবার বন্দোবস্তকে পাকাপোক্ত ভাবে কায়েম করাটাকে ‘কমিউনিজমের দিকে এক ধাপ এগোনো’ বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা হয় নি।

‘অর্ডার অব স্টালিন’—এই বিভীষিকা যে একদিন সৃষ্টি হবে এ দুঃস্বপ্নও কেউ সেদিন দেখে নি। তখন সবে বছর চারেক হয়েছে লেনিন মারা গেছেন। তিনি যে পথ রচনা করে দিয়ে গিয়েছিলেন সে পথ তখন স্টালিনের নীতির মারাত্মক আধির ধুলোয় ঢাকা পড়ে যায় নি। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্তে লেনিন ব্যবস্থা করেছিলেন যে, খুব কম মাইনে পায় যে-সব মজুর তাদের মাইনে যে হারে বাড়বে যারা বেশ মোটা মাইনে পায় তাদের মাইনে তার চেয়ে অনেক কম হারে বাড়বে। তা ছাড়া যারা কম মাইনে পায় তারা যে হারে বাড়ি ভাড়া দেয়, যে দামে জিনিস কেনে কো-অপারেটিভ থেকে সেটা বেশি-মাইনের মজুরেরা যে হারে বাড়ি ভাড়া দেয়, যে দামে জিনিস কেনে তার চেয়ে কম। এই উপায়ে নীচের তলার আর উপরের তলার মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ঘুচাবার ব্যবস্থা করেছিলেন লেনিন। এই নীতি অনুযায়ী তখন মজুরির হার বাঁধা হচ্ছিল সব কারখানায় সব স্তরের মজুরদের জন্তে। মানুষের মনের কত কালের এই চাহিদা-টাকার-পাঁচিল-দিয়ে-ভাগ করা সমাজের এই তলাগুলো এক হয়ে যাক। এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের অন্তরের দীপ্তির তারতম্য বোঝা যায়, বেশি আলো বার মন থেকে ছড়িয়ে পড়েছে বাইরে থেকে তাকে প্রজ্জ্বল করা যায়। কিন্তু বাইরের গিণ্টির দরে মানুষের মূল্য-

বিচার—এ অপমান মানুষ কী করে সহবে? তাই বহুদিনের এই ঐক্যের ডাককে একেবারেই উপেক্ষা করা যায় না। স্টালিন এই সমতার দাবিকে বিদ্রূপ করেছে, উপেক্ষা করেছে। ১৯২৭-২৮ সালে স্টালিন কিন্তু এই আয়ের বৈষম্য, ভোগের বৈষম্যকে সোশালিজম বলে চালিয়ে দিতে সাহস করে নি। লেনিনের পথ তখনও সোভিয়েটের বুক জুড়ে রয়েছে, আগুন-জ্বালা সুরে সে পথ ডাক দিচ্ছে মানুষকে শ্রেণী-বিষমতা-লুপ্ত সমাজের দিকে এগিয়ে যেতে। সে পথকে ত্রাসের আঁধারে ঢেকে দিতে কয়েক বছর লেগে যাবে স্টালিনের। আমাদের কারখানায় মিটিং লেগেই থাকত। নানা রকমের মিটিং—কারখানার উৎপাদন-ব্যাপার নিয়ে, বলশেভিক দলের দলীয় ব্যাপারে, দেশের খাদ্যসমস্যা নিয়ে, রাষ্ট্রের শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, খাদ্যনীতি নিয়ে, মিটিং-এর পর মিটিং। যে একমাস আমি এই কারখানায় ছিলাম, একটি মিটিংও আমি বাদ দিই নি। মজুরেরা সত্যি তাদের অংশ নিচ্ছে কিনা, এই সব মিটিংয়ে এইটেই ছিল আমার লক্ষ্য করবার জিনিস। কারখানার বলশেভিকদের যে সভা হল তাতে দলের তরফ থেকে সেক্রেটারি বক্তৃতা দিলেন। দলের সেন্ট্রাল কমিটির নির্দেশ এইটে তিনি বার কয়েক বললেন, স্টালিনের নাম বারবার মস্তকের মতো আওড়ালেন, আর প্রত্যেক বার নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে শুরু হল হাততালির শিলাবৃষ্টি। সবটাই যন্ত্রের মতো ঘটে গেল, হাততালিও বেসুরো বাজলো, কেননা এটা নেহাৎ জোর করে আদায় করা হচ্ছে এটা পরিষ্কার বুঝলুম।

ফ্যাকটরির উৎপাদনসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে যে মিটিং হল সেটা কিন্তু একেবারে অগ্ন জ্বাতির মিটিং। সেখানে উৎসাহের অন্ত নেই। একজনের পর একজন মজুর বক্তৃতা দিতে এগিয়ে এল উৎপাদন-ব্যবস্থার সমালোচনাও শোনা গেল যথেষ্ট। একজন মজুরের উৎপাদনসংক্রান্ত প্রস্তাবকে চেপে দেবার জন্য কারখানার ডিরেক্টরকে বেশ একটু কড়া ভৎসনা শুনতে হল। বড়ো আনন্দ পেয়েছিলুম এই মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে। শুধু যে নাম-কা-ওয়াস্তে মজুরের উৎপাদন প্রণালীর মালিক নয়, সত্যি সত্যিই যে তারা মালিকানা পেয়েছে এইটে বোধ হচ্ছিল সেই মিটিংয়ে। শত অপূর্ণতা ও স্থালনের ভিতর দিয়ে যে আমরা এগোচ্ছি এইটে অস্বস্তি করে বড়ো

আনন্দ পেয়েছিলুম। কয়েক বছরের মধ্যে সে আশার আলোও নিবিয়ে দিল স্টালিন তার নতুন নতুন পিছু-হটানো হুকুমের বিধাস্ত নিশ্বাসে। সৃষ্টি করে মজুরদের মধ্যে অর্থনৈতিক বিষমতা শতগুণ বাড়িয়ে দিল স্টালিন। কারখানার স্টাঘানোভিজমের মজুরদের কমিটির ক্ষমতা কমতে কমতে প্রথমার চাঁদের কীর্ণতা প্রাপ্ত হল। আর কারখানার ডিরেক্টরদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণচন্দ্রের আকার ধারণ করল স্টালিনে কুপায়। যে পথ দিয়ে আমরা এগোচ্ছিলুম ভবিষ্যতের আলোর দিকে, সে পথ আবার মুখ ফিরিয়ে মিলিয়ে গেল অতীতের অন্ধকারে।

পাদোল্‌স্ক থেকে সাত মাইল দূরে পোখরা নদীর তীরে ছোট্ট গ্রাম আগাফোনোভা। আমাদের সেলাই কলের কারখানার ইভানের বাড়ি এই গ্রামে। প্রতি শনিবার কারখানার ছুটির পরে ইভান চলে যায় তার গ্রামে, সোমবার সকালে গ্রাম থেকে এসে কারখানার কাজে যায়। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সে পাদোল্‌স্কেই থাকে। ইভান আমার পাশের মেশিনটাতে কাজ করত। রোজই আমার আলাপ চলত তার সঙ্গে। গ্রামে যাবার ইচ্ছে জেনে সে খুশি হয়ে আমাকে শনিবার তার সঙ্গে তার বাড়ি যাবার আমন্ত্রণ করলে। শনিবার দিন কারখানা ছুটির পরে মাঠের পথ ধরে মাইল সাতেক হেঁটে আমরা গ্রামে গিয়ে পৌঁছলুম। নদীর ধারেই ইভানের বাড়ি। ছোট্ট বাড়িটি ধরতে গেলে মাত্র একটিই ঘর। বাড়িতে ঢোকবার মুখে একটি ছোট্ট ঢাকা বারাণ্ডা, তারপরে একটি ছোট্ট ঘর। সেই ঘরের দেয়ালে কয়েক জোড়া জুতো টাঙানো, ঘরের এক কোণে বস্তার মধ্যে নানা রকমের ভাঙ্গা জিনিস জড়ো করা হয়েছে। ঘরের আর-একটি কোণে ভাঙা চেয়ার, তার একটি পায়ের অভাব মিটিয়ে নিচ্ছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। এই ছোট্ট ঘরটির পরে একটি বড়ো গোছের ঘর। ঘরের মধ্যখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে চিম্নী। চিম্নীর গায়ে থাকের উপর বাসনপত্রর স্তুপাকার করে রাখা। টেবিলের উপর একগাদা কালো রুটি, ডিম আর সসেজ। চিম্নীটি ঘরের অনেকটা অংশকে আড়াল করেছে। চিম্নীর একধারে বিছানা। তার কিছু দূরে ঘরের এক কোণে একটি টেবিল আর টেবিলের ধারে দুটো বেঞ্চি আর দু-তিনটে চেয়ার। জানালার ধারেও একটি বেঞ্চি পাতা। চিম্নীর

আর-একধারে পর্দা দিয়ে আড়াল করা আর-একটি বিছানা। এই বিছানাটা বাড়ির বুড়ো কর্তা আর গিন্নির জন্তে। পরিবারের কর্তা নিকোলাই নিকোলায়েভিচ মস্কোতে কলে কাজ করেন। তিনি মস্কোতেই থাকেন, প্রতি শনিবার বাড়ি আসেন। বাড়ির গিন্নি গ্রামের বাড়িতে থেকে সংসার দেখাশুনো করেন। ঘরের একটি কোণে একটি বিছানা। বিছানার উপর ঝোলানো রয়েছে কাপড়ের তৈরি একটি ছোট্ট দোলনা। এইটে হচ্ছে ইভানের ছোট্ট খোকার রাজস্বি। দেয়ালের গায়ে খুস্টের আর মেরীর গোটা তিন-চার ছবি টাঙানো রয়েছে। তারই কাছাকাছি রয়েছে লেনিনের একটি ছবি।

এই পরিবারের বড় ছেলে হচ্ছে ইভান। বাড়িতে তার স্ত্রী সুরা আর ছোট্ট দু'টি ছেলেমেয়ে। কর্তার ছোট ছেলে ভদকার মহাভক্ত। ইভানের বোন, তার বয়স হবে বছর ষোলো, বাড়ির কর্তার আত্মরে মেয়ে সে। গোলগাল মুখ, বেশ মোটামোটা, মেয়েটি যেন কালীঘাটের বেনে-বউ-পুতুলের নকশায় গড়া। বাড়ির গা-ঘেঁষে পোখরা নদীটি বেজায় আঁকাবাঁকা, মেয়েদের মতোই তার চাল চলন, সোজা চলতে জানে না সে। নদীর দু' ধারে যবের ক্ষেত, বেশির ভাগ কালো যব, যার থেকে তৈরি হয় কালো রুটি। বাকী জমিতে কপির চাষ আর গোরু আর ঘোড়ার খাবার জন্তে বোনা হয় একরকম মটর। কপিই হচ্ছে এ অঞ্চলের প্রধান ফসল। নদীর ওপারে ঢালু মাঠ, যতদূর চোখ যায় সবুজ রঙের ঢেউ চলেছে। সেই সবুজের উপরে হলুদে গোলাপী রঙের মেঠো ফুলের নকশা আঁকা। দূরে গাছের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে গ্রামের ছবি, আরো দূরে বনের ছায়া। নদীর ধার থেকে যখন বেড়িয়ে ফিরলুম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সুনলুম বাড়ির কর্তা মস্কো থেকে এসেছেন। বাড়ি পৌঁছেই তিনি শয্যা গ্রহণ করেছিলেন পর্দার আড়ালে। টেবিলের ধারে আমরা চার-পাঁচটি প্রাণী, টেবিলের উপর এক কোণে মিটমিট করে জ্বলছে লণ্ঠন আর বকবক শব্দ করে ফুটে চলেছে সামোভার। আমি প্রশ্ন করছিলুম আর ইভান, তার স্ত্রী, আর ইভানের বোন আমার উত্তর দিয়ে চলেছিল। পরিবারের সম্পত্তি বিঘে দশ-বারো জমি, দুটি ঘোড়া, একটি গরু, গোটা কুড়ি-পঁচিশ মুরগি, তিনটে হাঁস,

তিনটে কুকুর আর গুটি চার-পাঁচ বেড়াল। ইভান একশো ত্রিশ টাকা আন্দাজ মাইনে পেত কলে কাজ ক'রে। সুরাকে বিয়ে-করা নিয়ে বাপ-মা'র সঙ্গে মন কষাকষি হচ্ছে কয়েক বছর থেকে। তাই সে শিষি অণ্ড জায়গায় বাড়ি করে উঠে যেতে চায়। অ-বনিবনার কারণ কি জিজ্ঞেস করে জানলুম যে একটি কানাকড়িও না নিয়ে ইভান যে সুরাকে বিয়ে করেছে তার জন্তে ইভানের মা ভীষণ রেগে আছেন। চাষী-গ্রামে এমন লক্ষ্মীছাড়া কাণ্ড কেউ করে না। খুব কমসময় করেও সাতশো-আটশো টাকা আদায় করে ছেলের পক্ষ মেয়ের বাপের কাছ থেকে। আর ইভান! সে কলে কাজ করে, একশো ত্রিশ টাকা মাইনে পায়, সে কিনা তার কিস্মৎটা মেয়ের বাপকে বুঝিয়ে দিল না, বিনা-দরে নিজেকে বিক্রিয়ে দিল। ছেলের এই বোকামি গিন্নি ক্ষমা করতে পারেন নি। আর ঠিক আমাদের দেশের মতো গিন্নীর রাগের গনুগনে আগুনের হলুকা ঠিকরে পড়ল পরের মেয়ে বউ-এর উপর। অনেকদিন মায়ের অত্যাচার ইভান সহ্য করেছে, আর সহ্য করা চলছে না, তাই সে স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অণ্ড জায়গায় চলে যেতে চায়। গ্রামের খবর নিচ্ছিলুম ইভানের কাছ থেকে। জমির খাজনা কী হারে গভর্নমেন্ট নেয়, যে-সব চাষী কলে কাজ করে তাদের আয়কর দিতে হয় কিনা, সব জানছিলুম। রাত বেড়ে চলেছিল। চাষী-পল্লীতে একটিও আলোর রেখা দেখা যায় না। আকাশে চাঁদ হেলে পড়েছে বিরজা গাছগুলির উপর। আর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু আমরা চারজন টেবিলের ধরে বসে কথা বলছিলুম। আমাদের চারজনের সেই ঘরে কী করে জায়গা হবে তা ভেবেই পাচ্ছিলুম না। সুরাকে এই অসাধ্য সাধনের ভার দিয়ে ইভান আর আমি নদীর দিকে বের হয়ে পড়লুম। বিরজা গাছের মধ্যে দিয়ে সরু পথ নেমে গেছে নদী পর্যন্ত। পথের ধারে একটা ইটের তৈরী বাড়ি চোখে পড়ে। শুনলুম বিপ্লবের আগে এটা একজন জার্মানের ফ্যাকটরি ছিল। বিপ্লবের পরে সেই জার্মান চলে যাওয়ায় সেই ফ্যাকটরি বন্ধ হয়ে গেছে। ইভান বলল যে ফ্যাকটরিকে আবার চালাবার কথা হচ্ছে। বাড়ি ফিরে এসে দেখি ইভানের স্ত্রী বেকির উপর ও ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে রেখেছে। ঘরে এক তিলও জায়গা নেই। পাশ ফিরলে, অণ্ডের গায়ে পড়বার

আশঙ্কা। তার উপর কুকুরগুলো, বেড়ালগুলো, হাঁস, মূর্গি—সেই ঘরের মধ্যেই তাদের সবার রাতের ডেরা। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। ছারপোকা আর পিঁপড়ার কামড়ে আমার চোখে একবিন্দুও ঘুম ছিল না। ঘরের মধ্যে সে কী কনসার্ট! মানুষের নাক-ডাকানির সঙ্গে সুর মেলালে কুকুর বেড়াল হাঁস মূর্গির নানা সুরের আওয়াজ, মনে হচ্ছিল যেন একটা আদিম কালের জঙ্গলের মধ্যে রাত কাটাচ্ছি। রাতের অন্ধকারের ঢাকনার তলায় নানা প্রাণী ঢাকা রয়েছে, শুধু শুনছি তাদের নিশ্বাসের ধ্বনি। পরদিন সকালে একটু বেলা বাড়লে ইভানকে সঙ্গে নিয়ে নদীর অপর পারে গাঁয়ের সোভিয়েটের সেক্রেটারির বাড়ি যাবার জন্তে বের হয়ে পড়লুম। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই বৃষ্টির মধ্যেই আমি আর ইভান নদী পার হয়ে দু'ধারের কপি-ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে ভিজতে ভিজতে একহাঁটু কাদা ভেঙ্গে গ্রাম্য সোভিয়েটের সেক্রেটারির বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলুম।

ইভান তাঁকে জানাল আমার আসার উদ্দেশ্য। তিনি বললেন যে বিপ্লবের আগে তিনি মস্কোয় বাস করতেন। তাঁর নিজের অবস্থা তখন এখনকার চেয়ে যদিও ভালো ছিল, সাধারণ চাষীদের অবস্থা আগেকার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে বিপ্লবের পরে। গরিব চাষীদের জন্তে গাঁয়ের সোভিয়েটের তরফ থেকে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে কিনা শুধালুম। তিনি বললেন যে গোরু, ঘোড়া, লাঙল কেনবার জন্তে গ্রাম্য সোভিয়েট থেকে গরিব চাষীদের সাহায্য করা হয়। খাজনা রেহাই দিয়ে গোরু, ঘোড়া কেনবার জন্তে অর্থ সাহায্য করে নানা উপায়ে গরিব চাষীদের সাহায্য করছে সোভিয়েট গভর্নমেন্ট। অন্যদিকে ধনী চাষীদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অর্থনৈতিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে সোভিয়েট রাষ্ট্র। ধনী চাষীদের খাজনা বেড়েই চলেছে। তাদের কোনো রকম অর্থ সাহায্য করা হয় না।

আমার মনে পড়ে গেলো ইভানের ঘরে যিশু খৃষ্টের আর মেরীর যে-সব ছবি টাঙানো দেখেছিলুম সেগুলোর কথা। জানতে চাইলেম গাঁয়েতে গীর্জের প্রভাব কমেছে কি বেড়েছে। ইভান উত্তর দিল। সে হেসে বললে যে বহুদিন সে গীর্জের ছায়া মাড়ায় নি, তা ছাড়া শুধু সে

কেন, তার সমবয়সীরা প্রায় কেউই আর গীর্জায় যায় না। ইভানের কথায় সায় দিয়ে সেক্রেটারি মশায় বললেন : এরা গীর্জায় যায় না বটে কিন্তু এরা যে সবই নাস্তিক হয়েছে তা ভাববেন না। ‘মানি না’, এটা বলতে এরা এখনো ভয় পায় ঠিক যেমন ‘মানি’ বলতে এদের আর বিশ্বাসের সাহস নেই।

বললেন : ইভানের ঘরে তো অনেকগুলো ‘আইকন’ দেখলুম খুঁটির আর মেরীর। ‘মানি’ এই কথা বলবার সাহসের অভাব তো তার থেকে প্রমাণ হচ্ছে না। ইভান বললে, ওগুলো অনেকদিন থেকে কোণে টাঙানো রয়েছে। মা বাবা ওগুলোকে টাঙিয়েছেন, ওতে আমাদের কোনো হাত নেই। আমি ওর পাশেই তাই লেনিনের ছবি টাঙিয়ে দিয়েছি। মা-র সেটা ভালো লাগে নি, শুধু ভয়ে চুপ করে আছেন। বললেন : ইভানের কথা শুনে মনে হচ্ছে গাঁয়ের লোকদের মন থেকে ধর্মে বিশ্বাস একেবারে লোপ পেয়েছে, এ কথা আমি মানি কি করে? মস্কোয় নানা গীর্জাতে দেখেছি লোক ধরে না। সেই শহরেই যখন এই অবস্থা তখন গ্রামে যেখানে বিচারশীলতার একান্ত অভাব সেখানে ধর্ম লোপ পেয়েছে এটা বিশ্বাস করা শক্ত। ইভান বললেন : আমার কথা থেকে আপনি বোধ হয় একটু ভুল বুঝেছেন। ধর্মে বিশ্বাস গ্রাম থেকে নিশ্চয় লোপ পায় নি। গাঁয়ের বুড়ো-বুড়ীর দল তো মানেনই, এমন-কি তরুণদের মধ্যেও ‘ধর্ম মানি না’ একথা জোর করে বলবার লোক খুবই কম। তার মেয়ে জিনার জন্মের পর ইভান তাকে গীর্জায় নিয়ে গিয়ে দীক্ষিত করেনি বলে ইভানের মা এক বছর কোলে নেন নি তাঁর নাতনীকে।

কথায় কথায় বেলা বেড়ে গিয়েছিল সে খেয়াল ছিল না। বৃষ্টি ধরে গিয়েছিল। গ্রাম্য সোভিয়েটের সেক্রেটারির কাছ থেকে বিদায় নিলুম।

আবার সেই যবের ক্ষেত, কপির ক্ষেত, মেঠো ফুলে ছয়লাপ ঢালু সবুজ মাঠ, আকাবাকা খেয়ালী নদী আর নদী ধারের বাড়ি ইভানের। তারপর দিন সকালে পাদোল্কে ফিরে এলুম। এক দিন এই ছোট্ট শহরটিতে থাকার মেয়াদও ফুরিয়ে গেল। মস্কো থেকে তলব এল

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের আন্তর্জাতিক কংগ্রেস হতে দেয় নেই।
মক্কায় ফেরা দরকার।

এই ক্যাপিটালিস্ট সমাজের হিংসা-কুটিল কালো আকাশের বুক চিরে
নভেম্বর বিপ্লবের বিদ্যুৎ পৃথিবীস্বন্ধ লোকের চোখ ঝলসে দিয়েছিলো
উনিশ-শো সতেরো সালে। তার দু বছর পরে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের
বজ্র-ধ্বনি সচকিত করে তুলল বিশ্ববাসীকে। সেই ধ্বনিতে পরশ্রমজীবী
অত্যাচারীরা গুনলো তাদের মৃত্যুর সংকেত আর সব-খোয়ানো মানুষেরা
গুনলো তাতে মুক্তির ইসারা, নতুন দুনিয়ার আগমনী গান।

তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের কথা আমি প্রথম গুনি উনিশশো-চব্বিশ
সালে। তার অর্থ কিন্তু তখন একেবারেই অস্পষ্ট ছিল আমার কাছে।
তারও বছর দেড়েক বাদে যখন ‘বঙ্গীয় শ্রমিক কৃষক দলে’ যোগদান করি
তখন সহকর্মীদের মুখে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের কথা প্রায়ই গুনলেও
তার অর্থ আমার কাছে আগের মতোই আবছায়া থেকে গিয়েছিল। কেননা
তখনকার সহকর্মীরা তৃতীয় ইন্টারন্যাশানাল নামটি খুব ভালো করে
রপ্ত করেছিলেন বটে কিন্তু শব্দমাহাত্ম্যের মতো নামটি আমার যেমন
তেমনি তাদেরও জিভের ডগাতেই থেকে গিয়েছিল, সেটি জ্ঞানের কোঠায়
পৌঁছতে পারে নি। ত্রিশ বৎসর আগেকার ভারতবর্ষে কমিউনিজম
ও তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের তাৎপর্য বোঝাবার সুযোগ ছিল না বললেই
চলে। তখনো কমিউনিজম বিরোধী স্টালিনের লেখাগুলি প্রায় বিনামূল্যে
বিতরণ করবার যুগ শুরু হয় নি। তখনো কমিউনিজম বিপদসঙ্কুল ছিল।
কফি হাউসের বিলাসসামগ্রী হয় নি।

যখনকার কথা বলছি তখন আমার মনে ছিল প্রচণ্ড ব্রিটিশবিদ্বেষ,
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ নয়, ব্রিটিশবিদ্বেষ, আর ছিল
দেশের পরাধীনতার সম্বন্ধে গভীর বেদনাবোধ আর ছিল সেই পরাধীনতা
থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্যে অন্তরে বেদনামাথা তীব্র ব্যাকুলতা।
আমার মনের মাটিতে স্বাদেশিকতার এই পরস্পরসংলগ্ন মনোভাব দুটি
বিকশিত হয়েছিল অতি তরুণ বয়সেই। তাই তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের
কথা যখন প্রথম গুনলুম তখন আমার ইন্টারন্যাশনালিস্ট মন বিদেশী শাসন থেকে
ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার উপায় হিসেবেই তৃতীয় ইন্টারন্যাশানালকে

দেখেছিল। পৃথিবীব্যাপী ক্যাপিটালিস্ট সমাজের ভিত-নাড়ানো শক্তি হিসাবে দেখে নি। সে দেখার শক্তি আমার তখন একেবারেই ছিল না, কমিউনিজমকে সত্যি করে জানা ও বোঝার দিক থেকে আমি তখন নিতান্তই কাঁচা ছিলাম। বিচার ও বিশ্লেষণের কোনো শক্তি আমি তখনো সঞ্চয় করে উঠতে পারি নি। আমার কাঁচা মন তখন আবেগের উন্মত্ত জোয়ারে কানায় কানায় ভরা। আর চিরকালের সব কাঁচা মনের মতো সেদিন আমিও আবেগকেই মুক্তি বলে চালিয়ে দিয়েছিলাম।

উনিশ-শো-সাতাশ সালে যখন মস্কোয় গিয়ে পৌঁছলাম, আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে তখন আমার কোনো ধারণাই ছিল না। সেই অজ্ঞানতার দামও দিতে হল সত্য সত্য। অজ্ঞানতা কম লজ্জায় ফেলল না আমায় একদিন। মস্কোয় পৌঁছবার কয়েকদিন পরেই তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের সেন্ট্রাল কমিটির সেক্রেটারি পিয়াংনিস্কির কাছ থেকে তলব এলো। নানা কথার মধ্যে বৃদ্ধ পিয়াংনিস্কি বাংলার টেররিস্ট দলগুলির সঙ্গে আমাদের কৃষক-শ্রমিক দলের কি রকম যোগাযোগ আছে সেটা জানতে চাইলেন। সে প্রশ্নের উত্তরে আমি বলে বসলাম যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিটি আন্দোলনে টেররিস্ট দলগুলির কর্মীরা আমাদের একান্ত নির্ভরযোগ্য সহকর্মী।

‘ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন’—আমার এই কথাগুলি বার দুয়েক ঝাঁক দিয়ে আওড়ে বৃদ্ধ পিয়াংনিস্কি ঘরটি ভরে তুললেন হাসিতে। বুঝতে দেরি হল না নিজের ভুল। আমার নায়ে অজ্ঞানতার ছেঁড়া পাল ছিলো সত্যি, কিন্তু নিবুন্ধিতার ফুটো ছিলো না। আধুনিকদের এই কপালজোর আমার ছিলো না, তাই ভরাডুবির প্রগতি থেকে আমি বেঁচে গিয়েছিলাম।

পাদোল্‌স্ক থেকে মস্কোয় ফিরে এসে প্রায় রোজই দুপুরটা কাটতো কমিন্টার্নে। তখন ষষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেসের জন্ম থিসিস্, রিপোর্ট, ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে কমিন্টার্নের দপ্তরে। বিশ্ব বিপ্লবের খাস দপ্তর তখন বসন্তের বনের মতো মুখর নানা দেশের বিপ্লবীদের গুঞ্জে। উনিশ-শো-সাতাশ সালে যখন আমি মস্কোয় পৌঁছিই তখন ভারতবর্ষের ভার ছিলো পেত্রভ্‌স্কির উপর। ইতিমধ্যে ট্রট্‌স্কি নির্বাসিত হয়েছেন সাইবেরিয়ায়, এবারে বুখারিন ও তার মতাবলম্বীদের সরাবার পালা শুরু হোল। প্রথমে কমিন্টার্নের প্রতিটি

দপ্তরে গুরু হল অদল-বদল। স্টালিনের প্রতিটি নিবুঁদ্ধিতা ও পাশবিকতাকে অশ্রান্ত সত্য বলে মানবে না, মুখে না বললেও তার মনের মধ্যে প্রতিবাদ গুজরোতে থাকবে, এ সন্দেহ যার সম্বন্ধে জেগেছে তাকেও স্টালিন রেহাই দেয় নি। ক্ষমতালোলুপ লোক যে কত হিংস্র হতে পারে, অমানুষিকতার যে কত তলানিতে মানুষ পৌঁছতে পারে, আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্তে তা স্টালিনের রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস যে না জানে সে কিছুই জানে না। ইতিহাস বোধহয় স্টালিনকে সৃষ্টি করেছিল ক্ষমতালোলুপতার চরম বীভৎসতার প্রমাণ দেবার জন্তে। কমিন্টার্নের কংগ্রেসের কিছুকাল আগেই পেত্রভ্‌স্কিকে সরিয়ে দিল স্টালিন ভারতবর্ষের দপ্তরের পরিচালনা থেকে। তার জায়গায় এল যে লোকটি তার নাম স্তবিন। মাথায় খাটো এই লোকটির ছিলো মাথাভর্তি টাক। তার দেহটি ছিল মেদে ও মুখটি ছিল চতুরতায় ভর্তি। মাথার কেশবিরলতার দুঃখ চিবুকের দাড়ির ঝোড়ো দাক্ষিণ্যে ঘুচিয়েছিল স্তবিন। লোহানীর কাছ থেকে লোকটির রাজনৈতিক জীবনের কিছুটা খবর পেলুম। স্তবিন ছিল হাড়-পাকা মেন্‌শেভিক, বলশেভিক দলের ঘোর দুশমন। নভেম্বর বিপ্লবের সময় স্তবিন তার একরক্মি ক্ষমতায় যতটা বাধা দিতে পারে তা দিয়েছিল। তার পরে সে কোথায় তলিয়ে ছিল কেউ জানত না। স্টালিন কিন্তু এই ধরনের লোকগুলির খবর সব সময়েই রাখত। তাদের জিইয়েও রেখেছিল স্টালিন তার চক্রান্তের কাজে লাগাবার মতলবে। এই ধরনের লোক যে স্টালিনের প্রতিটি নিখাসের সঙ্গে তাল রেখে ছলবে, প্রতিটি ইঙ্গিতে ঐকবে বেকবে সে তো অতি স্বাভাবিক! সেই শর্তেই তো স্টালিন তাদের প্রাণে না মেরে জিইয়ে রেখে দিয়েছিল! লেনিনের যুগের বলশেভিকদের দিয়ে তো এই গোলামী করানো সম্ভব ছিল না স্টালিনের পক্ষে। যারা বিপ্লবের জন্তে সব-খোয়ানের সংকল্প নিয়ে একদিন ঝোড়ো পথে এসে দাঁড়িয়েছিল, লেনিন যাদের নির্লোভ আত্মনিবেদনের দীক্ষা দিয়েছিলেন, তারা কী করে লোভ-পঙ্কের কীট স্টালিনের অমানুষিকতাকে মেনে নেবে? স্টালিন সেটা জানত, সে জানত যে লেনিনের তৈরি বলশেভিকেরা সবাই তার বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক লড়াইয়ে দাঁও-স্বরূপ তারা হয়তো নিরুপায় হয়ে কখনো উপরে উপরে মেনে নেবে তার মত কিন্তু আসলে

তারা যে কখনো মানতে পারে না স্টালিনবাদকে, এটা স্টালিন নিঃসন্দেহে জানত। তাই প্রথম যুগের বলশেভিকদের বিশ্বাস করা দূরের কথা, তাদের খুন করা ছাড়া আত্মপ্রাণাত্মকামী স্টালিনের উপায় ছিল না। ডিক্টেটরি যার উদ্দেশ্য খুনী তাকে হতেই হবে। যে কথাটা বলছিলুম প্রথম যুগের বলশেভিকদের বিরুদ্ধে, তার ষড়যন্ত্রে স্টালিন মেই-সব বাছাই-করা লোকদের ব্যবহার কবেছিল যারা বলশেভিক দলের আর নভেম্বর বিপ্লবের ঘোরতর শত্রুতা করেছে। ডেনিকিনের সঙ্গে জুটে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার আশ্রয় চেষ্টা করেছিল মেই মাইস্কিকে স্টালিন সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করে লগুনে। ভিখিন্সকিও সেই একই জাতের জীব ছিল, বিপ্লবের পূর্ণিমা যখন স্টালিনের অমানিশায় ঢাকা পড়ে গেছে সেই অন্ধকারে নভেম্বর বিপ্লবের ঘোরতর শত্রু এই ভিখিন্সকির আবির্ভাব। স্টালিন ঠিক লোককেই তার জন্মদায় হিসেবে বেছে নিয়েছিল লেনিনের সহকর্মীদের হত্যা করবার জন্তে। স্তবিন ছিল এই জাতেরই জীব, বিপ্লবের অগ্নিশিখায় যখন দিগন্ত রাজ্য তখন ছিল লুকিয়ে; ষড়যন্ত্রের সূড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকার পাকে তার ব্যক্তিত্বের খোলতাই হল। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে বুখারিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলবার জন্তে স্তবিন, কুসিনি প্রভৃতি তার একান্ত আশ্রিতদের স্টালিন প্রতিটি দপ্তরের মাথায় বসিয়ে দিচ্ছিল। স্তবিনের সঙ্গে কয়েকদিন আলোচনা হলো। কী যে তার মত সেটি বুঝবার যো নেই। তার কথাগুলো তার টাকের মত মসৃণ, পিছলিয়ে যায় মনের উপর থেকে। মনের পটভূমিতে তাদের কোনো দাগই পড়ে না।

কংগ্রেসের তোড়জোড় যখন পুরো দস্তুর চলেছে তখন মানবেন্দ্রনাথ রায় খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর কানের ভিতরে ঘা হয়ে তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। তাঁকে যখন দেখতে গেলুম তখন তাঁর বেশি কথা বলবার মতো অবস্থা নয়। কংগ্রেস শুরু হবার হুঁটা তিনেক আগেই তিনি বার্লিনে চলে গেলেন চিকিৎসার জন্তে। সেই যে তিনি রাশিয়া ছাড়লেন আর ফিরলেন না রাশিয়ায়। কংগ্রেসের সময় মস্কোয় আসবার জন্তে তাঁকে বার বার অনুরোধ করা হয় কিন্তু সে অনুরোধ তিনি এড়িয়ে যান। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল থেকে যে তাঁকে বিতাড়িত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করা হয়েছে, মনে হয় সে খবরটি তাঁর বন্ধু টিভেলের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন। টিভেল ছিল স্টালিনের সেক্রেটারিয়েটের একজন, তাই কোনো খবরই তার অজানা ছিল না। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেস শুরু হবার আগেই মানবেন্দ্রনাথ রায়কে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল থেকে বহিস্কৃত করা হয়। এই বহিস্কৃতির কারণসম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথ রায় পরবর্তী কালে বলেন যে, স্টালিনের সঙ্গে মতবিরোধ তার কারণ। একথা সত্য নয়। রায়ের বহিস্কৃতি-সম্বন্ধীয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রস্তাবটি আমি দেখেছি। সে প্রস্তাবে যে-সব কাবণ দর্শানো ছিল, রায়ের বহিস্কৃতি সম্বন্ধে তাতে মতবিরোধের কথা ছিল না, গর্হিত আচরণের কথা ছিল। অবনী মুখার্জীকে বিপদে ফেলবার জন্যে অতি নিন্দনীয় ষড়যন্ত্রের কথা তাদের অন্যতম। স্টালিনের সঙ্গে মতবিরোধের কাহিনীটি রচিত হয়েছিল অনেক পরে, ভক্তদের ভক্তির খোরাক জোটানোর চতুর উদ্দেশ্যে। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো এমন উঠতে স্টালিন, বসতে স্টালিন—স্টালিনগত-প্রাণ লোক ১৯২৭-২৮ সালে আমি খুব কমই দেখেছিলুম। মনে আছে, একবার মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ঘরে আমাদের সন্দের ভোজ ছিল। রায় নিজে দু-একটা দেশী রান্না রেঁধে আমাদের খাইয়েছিলেন। টিভেল, টিভেল-পত্নী, রায় ও রায়ের স্ত্রী হ্যা, লোহানী আর আমি—আমরা এই ক’জন ছিলাম সেদিন সন্দের আসরে। কথায় কথায় উঠল স্টালিনের কথা। যেখানে টিভেল আর মানবেন্দ্রনাথ রায়, স্টালিন-সর্বস্ব-প্রাণ এই লোক দুটি রয়েছেন সেখানে স্টালিনের স্তব একেবারে বাদ পড়ে যাবে এও কি কখনো সম্ভব! স্টালিনের কথা উঠতে মানবেন্দ্রনাথ রায় বললেন—সোভিয়েট রাষ্ট্রের বনেদ পাকা করতে স্টালিন যতো করেছেন, লেনিনও ততো করেন নি। স্টালিন এদিক দিয়ে লেনিনের চেয়েও বড়ো। টিভেলের দিকে তাকিয়ে দেখলুম মানবেন্দ্রনাথ রায়ের এই চাটুবাণী শুনে তার মুখটি শিবের বাহনটির মতোই আত্ম-তৃপ্ত রূপ গ্রহণ করেছে। যত দিন মানবেন্দ্রনাথ রায় মস্কোয় ছিলেন তত দিন তিনি ছিলেন স্টালিনের পরম ভক্ত। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল থেকে বহিস্কৃত হওয়ার পর মানবেন্দ্রনাথ জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির মস্কো অফিসমোদিত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ব্রাণ্ডলার ও খাল হাইমারের নেতৃত্বে যে বিরোধী দল গড়ে উঠেছিল সেই দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে বার্লিনে তাদের

পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল থেকে বিতাড়িত হবার পর মানবেন্দ্রনাথ স্টালিনের সঙ্গে তাঁর মতবাদমূলক পার্থক্য আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের প্রয়োজন কি ছিল তা আগেই বলেছি—বহিষ্কৃতির আসল কারণগুলিকে গোপন করাই ছিল তখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য। কমিন্টার্নের দপ্তরে স্তবিন একদিন খবর দিল যে শওকৎ ওসমানী আরো দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষ থেকে এসে পৌঁছেছেন ষষ্ঠ কংগ্রেসে যোগদান করবার জন্তে। ভারতবর্ষে ওসমানীর সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয় নি। মুজফ্ফর ও নলিনীর কাছ থেকে তার কথা শুনেছিলুম মাত্র। দেশে থাকতেই বুঝেছিলুম যে, মুজফ্ফর ও নলিনীর সঙ্গে ওসমানীর বিশেষ বনিবনা নেই। এখানে ওসমানীর সঙ্গে দেখা হতে ওদের সম্বন্ধে তার মনোভাব বুঝতে দেরি হল না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করবার জন্তে যে কমিশন বসেছিল তারি এক অধিবেশনে ওসমানীর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। সেই কমিশনের অধিবেশনে অবনী মুখার্জিও হাজির ছিলেন। ওসমানী দু-একবার মুখ খোলার পরই বুঝতে পারলুম মূল গায়েরটি কে। মানবেন্দ্রনাথ রায় এত দিন অবনী মুখার্জিকে কমিন্টার্নের কোনো কাজে এগোতে দেন নি। এবারে ওসমানীকে ভেঁপু বানিয়ে অবনী মুখার্জি তার গং বাজাতে শুরু করলেন। সেদিন কমিশনের অধিবেশনে ওসমানীর সঙ্গে আমার যা আদান-প্রদান হল তাকে কথার ফুলকির তীর ছোঁড়াছুঁড়ি বলা চলে। ভারতবর্ষে আমাদের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাকেই লঘু করে ওসমানী বক্তৃতা দিল। বুঝলুম, মুজফ্ফরদের বিরুদ্ধে তার প্রাণের রুদ্ধ আক্রোশ মস্কোয় এসে ফুটে বের হচ্ছে। অধিবেশন শেষ হবার পরে ওসমানী এসে আমার সঙ্গে আলাপ করল। বললে যে, সে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চায় না। বললুম তাকে যে, যদি ভারতবর্ষে আমাদের সব প্রচেষ্টার নিন্দে করে মুজফ্ফর প্রভৃতির উপর তার যে রাগ আছে সেটা মিটাতে চায়, তা হলে শুধু যে ঝগড়া হবে তা নয়, বিদ্রোহ-চমকানো বাজ-ডাকা ঝগড়া হবে। কথার মধ্যে অবনী মুখার্জি এসে হাজির হলেন। বিকেলবেলা তাঁর ওখানে চায়ের নেমস্তন্ন করলেন।

অবনী মুখার্জির সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা। তাঁর কথা আগেই

ওনেছিলুম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি এতকাল মস্কোতে থাকাসময়ও। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে ঝগড়ার দরুন কমিন্টার্নে তাঁর গতিবিধি খুবই কম ছিল। কৃষকদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'ক্রেসিনটার্গে'র সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন আর ভারতবর্ষের কৃষিসমস্যা ও ভূমিসমস্যা বিষয়ে তিনি বক্তৃতাও দিতেন কমিউনিস্ট আকাডেমিতে। মানবেন্দ্রনাথের বিখ্যাত বই 'ইণ্ডিয়া ইন ট্রানজিশন'-এর প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদপটে লেখা যে, বইটি লেখা হয়েছে অবনী মুখার্জির সহযোগিতায়। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক আত্মপ্রাধাণ্য লাভের স্বপ্নের ফলে এই দুই বন্ধুর মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক কোথায় গেল তলিয়ে দুশমনির বেনো জলের তলায়! মানবেন্দ্রনাথ তাঁর সত্য-নিষ্ঠায় স্টালিনের যোগ্য সাক্ষরদ। বিকেল বেলা অবনীর ওখানে গেলুম। অবনী ও তাঁর কন্যায় স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। ওসমানী ও তার সঙ্গে যে দুটি লোক মস্কোয় এসেছিল তারাও উপস্থিত ছিল সেই চায়ের আসরে। ওসমানীর এই দুই সহযাত্রীদের মধ্যে একজন ছিল পুলিশের লোক। কিছুদিনের মধ্যেই তার ভবলীলা সাক্ষ হল গোপেয়ুর গুলীতে। সারা সঙ্গে অবনীর ওখানে আমাদের আলাপ চলল। বুঝতে দেরি হল না যে ওসমানী সেই ভাগ্যবানদের একজন যাদের নিজের মত বলে কিছুই থাকে না, কতটা যে দিকে যখন চালাচ্ছে তখনই সে দিকেই তারা চলে। এই ধরনের আত্মগত্যের একটা সুবিধেও আছে। এই নিয়মাত্মবর্তিতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিবুদ্ভি লোককে বাঁচিয়ে দেয় তার নিবুদ্ভিতা ধরা পড়ে যাবার লজ্জা থেকে। দু'জাতের লোক আছে যারা কর্তৃপক্ষের মত নির্বিচারে গ্রহণ করে—নিবুদ্ভি লোক আর গুছোনদার লোক। এই গুছোনদার লোকের কাছে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার চেয়ে বড়ো আর কিছু নেই।

ভালো লোক ওসমানী এই প্রথম দলের একজন। অবনী ছিলেন এই দ্বিতীয় জাতের লোক। ওসমানীকে সামনে রেখে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সব ব্যবস্থাই অবনী করলেন এইবার। বুখারিনের বিরুদ্ধে স্টালিনের ষড়যন্ত্র তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। ট্রটস্কি আলস ইয়াটার নির্বাসনে। ট্রটস্কির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় বুখারিনকে দরকার ছিল। বুখারিন ছাড়া ট্রটস্কির যুক্তির উত্তর দেবার মতো লোক তো আর একটিও

ছিল না স্টালিনের স্বপক্ষে সেদিন। কিন্তু আর সে প্রয়োজন নেই। এখন বুখারিনকে না সরাতে পারলে তো প্রভুত্ব নিরঙ্কুশ হয় না। তা ছাড়া বুখারিন থাকলে একজন লোক বড়ো কাছাকাছি থেকে যায়, মুখে না মানলেও যার সামনে প্রতিভার মাপকাঠিতে নিজেকে ছোটো মনে হবেই। তাই এই কংগ্রেসের সময় থেকেই বুখারিনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলছিল স্টালিন। অবনী ওসমানীকে সে বিষয়ে কিছু হুঁশিয়ারি দিয়ে দেন। আরো বাতলে দেন যে এরকম অবস্থায় বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে বেড়া-পন্থী হয়ে চুপটি করে থাকা। বুখারিনের সমালোচনা কিছুটা করা ভালোই হবে, তার খুব বেশি না করাই ভালো। কেননা প্রেমের মতো রাজনীতিতে ভরা-ডুবি হওয়া তো একেবারেই বিচিত্র নয়।

মস্কোর 'ট্রেড ইউনিয়ন-ভবন'-এ কংগ্রেসের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভবনটির দোতলায় ছিল একটি বিরাট ঘর, হাজার খানেক লোক সেখানে স্বচ্ছন্দে স্থান পেতে পারে এত বড়ো ঘর। ঘরটির মেঝে, থামগুলি সব সাদা মার্বেলের—ঘরটির এক ধারে লম্বা বারান্দা, সেটিও সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি। একদা এই ভবনটি ছিল জমিদারদের ও ধনীদের ক্লাব ও নাচঘর। মদের ফোয়ারা বহুত এই ভবনের বারান্দায় আর বিরাট ঘরটিতে নৃত্যের ঢেউ বহুত সারা রাত। সুন্দরীদের চরণ-স্পর্শে ঘরটিও বোধহয় আবেশে আনন্দে অধীর হত। সেই ভবনে সেই নাচঘরে বসল এবার ষষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেসের অধিবেশন। মহাকালের রসিকতার কি তুলনা আছে? যেখানে ওয়ালস্-পোঙ্কার সুরের হাওয়ায় সুন্দরীরা ঢেউয়ের মতন ঢলতেন ও ঘুরতেন সেখানে বিশ্বমানবের মুক্তির গান শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হল, বিশ্ববিপ্লবের ঢেউয়ের গর্জন ঐ ঘরটিতে অবিরাম বাজতে লাগল একমাস ধরে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা এসে হাজির হলেন মস্কোতে। কমিনটার্ন-ভবনটি যেন ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠল। অফুরন্ত আনাগোনা ও ঘরে ঘরে প্রতিটি দেশের কমিউনিস্টদের বৈঠক চলতে লাগল।

শুরু হল একদিন সন্ধ্যাবেলা কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। লেনিনের বিরাট ছবি মঞ্চের উপর। মঞ্চে রয়েছেন তৃতীয় ইন্টারন্যাশানালের

নেতৃবৃন্দ—রুশীয় ও অন্যান্য দেশীয়। তৃতীয় ইন্টারন্যাশানালের কমিটির চেয়ারম্যান বুখারিন কংগ্রেসের উদ্বোধন করলেন, ‘আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন’—এই বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা দিয়ে। সব প্রতিনিধিরা উঠে দাঁড়িয়ে ‘ইন্টারন্যাশানল’ গানটি গেয়ে বুখারিনকে অভ্যর্থনা করলেন। সেই সন্ধের অধিবেশনে বুখারিন দু ঘণ্টারও বেশি বক্তৃতা দিলেন, তাঁর বক্তব্য কিন্তু তখনো শেষ হয় নি। পরের দিনের জন্ম মূলতুবী রেখে সন্ধের অধিবেশন শেষ হল। পরের দিন সকালের ও বিকেলের অধিবেশনে বুখারিন তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। তিনি রুশীয় ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আর সেই বক্তৃতা সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজী ফরাসী ও জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে আমাদের পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল আমাদের কানে লাগানো যন্ত্রের মাধ্যমে। দিন দশেক ধরে বুখারিনের ‘আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা’ সংক্রান্ত থিসিস নিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা আলোচনা করলেন। তাঁরা যে-সব সমালোচনা করলেন ও প্রশ্ন তুললেন বুখারিন সেগুলির উত্তর দিলেন তাঁর শেষ বক্তৃতায়। তাঁর থিসিস গ্রহীত হল কংগ্রেসের অধিবেশনে। একদিন সকালে কংগ্রেসের অধিবেশনে গিয়ে প্রতিনিধিদের চোখে মুখে একটা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করলুম। কয়েকজন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কী যেন আলোচনা করছেন। কনফারেন্স-ঘরের বারাণ্ডায় ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে চাপা গলায় ডেলিগেটদের আলোচনার গুঞ্জন কেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হতে লাগল। কারণটি জানতে বেশি দেরি হল না। তাঁর নির্বাসনের স্থান হুদুর আলমা ইয়াটা থেকে ট্রুটস্কি তৃতীয় ইন্টারন্যাশানালের এই ষষ্ঠ বিশ্ব-কংগ্রেসের ডেলিগেটদের জন্মে একটি রাজনৈতিক থিসিস লিখে পাঠিয়েছেন বলশেভিক দলের সেন্ট্রাল কমিটির কাছে। সেই থিসিসটি প্রত্যেক দেশের ডেলিগেটদের জন্ম কয়েক কপি করে দেওয়া হয়েছে। পড়া শেষ হয়ে গেলে সেগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ট্রুটস্কির থিসিসের একটি কপি জোগাড় করে পড়লুম। স্টালিনের ঘরোয়া নীতির ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন ট্রুটস্কি সেই প্রবন্ধে। স্টালিনের মারাত্মক ভুল নীতির ফলে সোভিয়েট রাশিয়া যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার আদর্শ ত্যাগ করে

জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ সড়ক ধরে চলতে শুরু করেছে—যার প্রমাণ, এক দেশে সোশালিজম প্রতিষ্ঠা হতে পারে স্টালিনের এই আশ্রয় ও আন্তর্জাতিক বিপ্লব-বিরোধী নীতিতে স্থম্পষ্ট—সে কথা ট্রটস্কি অপূর্ব স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যক্ত করলেন। এখন যে বলশেভিক দলের হাতে সোভিয়েট রাশিয়ার পরিচালনার নেতৃত্ব নেই—আছে শুধু দলের জেনারেল সেক্রেটারির অর্থাৎ স্টালিনের হাতে, স্টালিন বলশেভিক দলকে একেবারে খতম করে দিয়ে ষড়যন্ত্র ও পুলিশী ত্রাসের ব্যবহার—এই দুই উপায়ে সব ক্ষমতা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়েছে—এ-সব তথ্য বিশ্বয়কর নির্ভীকতার সঙ্গে ট্রটস্কি কংগ্রেসের ডেলিগেটদের শোনালেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে চীনদেশে চাং কাইশেকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার যে নীতি তখন স্টালিন বরোদিন ও মানবেন্দ্রনাথ রায় মারফৎ চালিয়ে আসছিল তারও তীব্র সমালোচনা করলেন ট্রটস্কি। দেড়শো দুশো পাতার ট্রটস্কির সেই থিসিসটির কপি ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে আমার আদবেই ছিল না, কিন্তু শুবিনের শকুনি-দৃষ্টি এড়িয়ে সেটি রাখা সম্ভব হল না। কয়েকদিন যেতে না যেতে শুবিন সেটি চেয়ে নিল। স্টালিনের কমিউনিজম-বিরোধী রুশীয় জাতীয়তাবাদী নীতির সম্বন্ধে আমার বিরূপতা ক্রমশই স্পষ্ট রূপ নিল আমার মনে। আমার মনে আর কোনো সংশয়ই রইল না যে সোভিয়েট রাশিয়ায় কমিউনিজমের নাম করে যে নীতি চলছে সেটি কমিউনিস্ট নীতি নয়, লেনিন-প্রদর্শিত কমিউনিস্ট বিপ্লবের নীতিও নয়, সেটি হচ্ছে স্টালিনবাদ—বলশেভিজম ও মেনশেভিজম—এই দুই মতবাদের জগাখিচুড়ি।

একদিন কংগ্রেসের অধিবেশন চলা-কালে চীনদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ডেলিগেটরা স্টালিনের সমর্থনে ট্রটস্কির থিসিসের বিরুদ্ধে প্লোগান তুলল। ১৯২৮ সাল থেকেই চীনের কমিউনিস্টরা স্টালিনবাদের ভেলায় চড়ে বিপ্লবের দরিয়া পার হবার সংকল্প গ্রহণ করেছিল। তাই চীনদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অতীত ইতিহাস যারা জানে তাদের কাছে মাও সেটুংবাদ (স্টালিনবাদেরই চৈনিক সংস্করণ) আশ্চর্য পরিণতি বলে আদবেই মনে হবে না।

এবারে শুরু হল ঔপনিবেশিক দেশগুলির সমকালীন চরিত্রটি কী ও

তাদের জাতীয় মুক্তির আন্দোলন কোন্ পথ ধরে চলবে তার আলোচনা। স্টালিনের অতি অল্পগত চেলা কুজিনি এই থিসিস পেশ করলেন কংগ্রেসের অধিবেশনে, আর ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির আরকোলি (আসল নাম তলিয়াতি) এই থিসিসের পরিপূরক একটি থিসিস দাখিল করলেন কংগ্রেসে। কুজিনি ছিলেন ফিনল্যান্ডের লোক, অধ্যাপনা করতেন এককালে, পরে কমিন্টার্নে উপনিবেশসংক্রান্ত দপ্তরটির ভার এর উপরই ন্যস্ত করা হয়। চেহারাতে বুদ্ধি দীপ্তির চেয়ে চাতুরির আলো-ছায়ার খেলার ছাপ ছিল বেশি। ছোটখাটো মানুষটি বেশ ভালো করেই মক্শ করে নিয়েছিলেন যখন যে-রকম রাজনৈতিক হাওয়া বইছে জীবনের পালে তখন সেই রকম বাতাস ভরে নিয়ে তরুতরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কৌশল। আপাতত স্টালিনের বাতাসে কুজিনির রাজনৈতিক জীবনের পালটি ছিল ভরা। বকশিশও তিনি ভালো পেয়েছিলেন স্টালিনের কাছ থেকে। স্টালিন যখন ফিনল্যান্ডকে একেবারে অকারণে আক্রমণ করে তার একটি অংশ দখল করে নিল তখন কুজিনিকেই স্টালিন সেই অধিকৃত অংশের শাসনের ভার দিয়েছিল।

কুজিনির বক্তব্য শেষ হওয়ার পর আরকোলি (তলিয়াতি—বিখ্যাত ইতালীয় কমিউনিস্ট) তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন কংগ্রেসে। তারপরে আলোচনা চলল কদিন ধরে এই দুজনের থিসিস নিয়ে। আমিও সেই আলোচনায় অংশ নিয়েছিলুম। সোভিয়েট রাশিয়ায় থাকবার সময়ে আমি স্পেনসর নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিলাম। কংগ্রেসে যখন যোগ দিলাম তখন ‘নারায়ণ’ এই নাম গ্রহণ করেছিলুম। ওসমানীও ‘সেকন্দর সুর’ এই নাম নিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেছিল।

আমাদের ‘শ্রমিক-কৃষক দল’ নিয়ে তখন বিরূপ সমালোচনা চলছিল কমিন্টার্নে। কংগ্রেসেও যে সেই বিরূপতার ঢেউ এসে পৌঁছবে সে তো স্বাভাবিক। কমিন্টার্নের খোদ কর্তারাই তো এই বিশ্ব কংগ্রেসের কর্তাদল! স্টালিনের তালিম দেওয়া নকীবের দল এক সুরই তো ভাঁজবেন সর্বক্ষেত্রে—নইলে নোকরী বজায় থাকা তো অসম্ভব হয়ে পড়ত।

কুজিনি তাঁর থিসিসে বললেন যে, কৃষক ও মজুর—এই দুই শ্রেণী নিয়ে একটি দল তৈরি করা ভুল, কেননা রাজনৈতিক দল হচ্ছে একটি শ্রেণীর

সংগঠন—এর ফলে বৈপ্লবিক মজুর আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি আরো বললেন যে, ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইতে যোগ দেবে। ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীকে তাই জাতীয় বিপ্লবের অংশীদার হিসেবে, সমর্থক শক্তি হিসেবে গণ্য করতে হবে।

সেকেন্দার সুর (শওকৎ ওসমানী) কুজিনিনের সুরে সুর মিলিয়ে বক্তৃতা দিলেন। আমার ভাগ্য মন্দ। জন্মক্ষেত্রে কোন্ দেবতা যে আমার জীবনের সুর বেঁধে দিয়েছিল জানি নে, যদি সেই দেবতার কিন্না উপদেবতার নামবীজের সন্ধান পেতুম তবে নিশ্চয়ই একবার তার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করতুম—এ রসিকতার অর্থ কি? সুর মিলোনোর মেঘ-বৃষ্টি যেখানে মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে স্বীকৃতি পাচ্ছে—সেখানে সারাটা জীবন নিজের সুর—তা বেসুরোই হোক আর বেতলাই হোক—বাজাবার এমন অসামাজিক বুদ্ধি আমাকে দেওয়ার কারণটা কি?

ছনিয়া স্কন্ধু মানুষ উঠল ক্ষেপে আমার উপর—আর আমার অবস্থা? সে কথা না বলাই ভালো!

কুজিনিনের থিসিসের সমালোচনায় কংগ্রেসের অধিবেশনে আমি বললুম, কুজিনিনের বক্তৃতা অধ্যাপকস্বলভ কেতাছরস্ত গোঁড়ামির পরিচয় দিয়েছে। ভারতবর্ষে বিশেষ অবস্থায় জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক দল গঠন আদবেই ভুল হয় নি। কোথায় তখন সংগঠিত মজুর আন্দোলন, কিন্না মজুরের বৈপ্লবিক চেতনার কণামাত্র উন্মেষণ? ভারতবর্ষের কলওয়াল ও জমিদারদের বিরুদ্ধে তাদের মনকে জাগিয়ে তোলবার এই প্রথম চেষ্টা আমরা করেছি। আইনসম্মত বৈধ রাজনৈতিক দল হিসেবে একে গড়ে তুললেও এই দলের পরিচালনার জন্তে আমরা যে একটি গোপন কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছি সে কথাও ভুললে চলবে না।

ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতের জাতীয় বিপ্লবের কখনো সমর্থক নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তারা বার বার আপস করবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তাই মজুর-কৃষকদের আন্দোলনকে কখনো আইনের গণ্ডী পার হয়ে বৈপ্লবিক রূপ নিতে দেয় নি—কেননা মজুর-কৃষকের বৈপ্লবিক আন্দোলন ভারতীয় বুর্জোয়াদের গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করতে বাধ্য। ভুললে চলবে না যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেছে নভেম্বর

বিপ্লবের ফলে। শুধু সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বুর্জোয়া শ্রেণীগুলি নয়, ঔপনিবেশিক দেশগুলির বুর্জোয়া শ্রেণীরা সব-থোয়াবার আশঙ্কায় বার বার রফা করবে নিজেদের মধ্যে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার খাতিরে। তাই ভারতের জাতীয় বিপ্লবে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা আছে মনে করলে অত্যন্ত ভুল করা হবে। এই ধারণার ফলে মজুর-কৃষকদের আন্দোলনকে লাগাম ধরে টেনে রাখতে হবে, পাছে ভারতের বুর্জোয়া বিগড়ে যায়, জাতীয় আন্দোলনে তার তথাকথিত বৈপ্লবিক (!) ভূমিকার খেল দেখাতে নারাজ হয়।

আমার আপত্তি বানের জলে খড়কুটোর মতো কোথায় ভেসে চলে গেল! তখনো চাং কাইশেকের সঙ্গে স্টালিনের দোস্তির যুগ চলছে, যদিও ক্যানটনে হাজার হাজার মজুরদের জবাই করে চাং কাইশেক স্টালিনের সঙ্গে তার দোস্তির ইজ্জৎ রাখতে কসুর করে নি! চীনদেশেই যখন এই বুর্জোয়া তোষণনীতির মোসুম চলেছে, তখন ভারতবর্ষের কথা নিয়ে বিশেষ করে মাথা ঘামায় কে? তা ছাড়া স্টালিনের নীতির সমালোচনা করে নিজেকে অকারণে বিপদগ্রস্ত করবে, এমন নিবুঁদ্ধিই বা কজন আছে? সেকেন্দর শূর (শওকৎ ওসমানী) তাই শূরের মতোই বক্তৃতা দিলেন স্টালিনের নীতির সমর্থনে। কমিন্টার্নে আমার অবস্থা হল হরিজনের মতো। লোহানী এড়িয়ে চলে, তার ঘরে গেলে তাকিয়েও দেখে না—কেই বা আর-এক নিবুঁদ্ধির পাল্লায় পড়ে বিপদে পড়তে চায়?

কংগ্রেসের অধিবেশনগুলি ক্রমশ ঝিমিয়ে এল। একদিন কনফারেন্স ঘরের বারাণ্ডায় বুথারিনকে একলা পেয়ে বললুম—আপনার ফুরসৎ মতো আমাকে একদিন একটু সময় দেবেন কি? ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার কতকগুলো জরুরি কথা আছে আপনার সঙ্গে। বুথারিন বললেন—নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন কয়েকটা দিন বড়ো ব্যস্ত আছি। বুথারিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই কোথা থেকে শুবিন দৌড়ে এসে একেবারে নির্লজ্জের মতো আমাদের কী কথা হচ্ছে তাই শোনবার জন্তে মাথা বেকিয়ে দাঁড়াল আমাদের গা ঘেঁষে। বুথারিন আমার দিকে একবার তাকিয়ে একটু হেসে চলে গেলেন।

এবারে একটি ঘটনা ঘটল যাতে কমিন্টার্নের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের

রাশিচক্রের ঘরে পুরো শনির দৃষ্টি পড়ল। কংগ্রেসে যোগদান করবার জন্তে ক্রেমেন্স দত্ত মস্কো এসেছিলেন। সুবিখ্যাত রজনী পাম দত্তের ভাই ক্রেমেন্স ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ভারতবর্ষ থেকে এসে যখন প্যারিসে পৌঁছই, তখন। উত্তর প্রদেশের একটি হালুইকর যুবককে মুজফ্ফর আহমেদ মস্কো কমিউনিজমের শিক্ষালাভের জন্ত পাঠিয়েছিলেন। তার মস্কো যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করবার জন্ত ক্রেমেন্স দত্ত প্যারিসে এসেছিলেন। ক্রেমেন্স ছিলেন অতি সুপুরুষ, তার ওপর দামী চমৎকার সূটের কুপায় চেহারার আরো খোলতাই হয়েছিল। উত্তর প্রদেশের সেই যুবকটি মস্কোতে আচকফ্ নামে পরিচিত ছিল। প্যারিসের কিছু দূরেই ভার্গাই ফ্রান্সের রাজাদের প্রমোদ-ভবন। ভার্গাই-এর একটি বিখ্যাত রেস্টোরাঁয় ক্রেমেন্স আচকফ্কে নিয়ে গিয়ে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছিলেন তা আচকফ্‌র মুখ থেকেই শুনেছিলুম। অবিগ্রি আচকফ্কে মস্কো পাঠানোর খরচের খাতেই এই রেস্টোরাঁর খরচটি স্থান পেয়েছিল।

মস্কোতে যখন ক্রেমেন্স দত্তর সঙ্গে দেখা হল তখন তার বেশ কন্ডুইতে তালি-দেওয়া কোট আর ইস্তিরির সঙ্গে সম্পর্কহীন ট্রাউজার। মনে মনে হাসলুম, বুদ্ধির তারিফ না করেও পারলুম না। আমাদের দেশের ‘মিটিং কা কাপড়া’র মতো ‘মস্কো কা কাপড়া’ যে তৈরি করে রেখেছে সেটা বুঝতে দেরি হল না। আজকের দুনিয়ায় নিজেকে উপরে তুলতে গেলে এই বুদ্ধির ব্যবহার না করে কোনো উপায় নেই।

ক্রেমেন্সের ছিল দাবা খেলার ঝোঁক, আমারও ছিল এই নেশা। আমরা মাঝে মাঝে দাবা নিয়ে বসতুম, খেলাতে মন দিতুম যত না, আলাপ চলত তত বেশি।

একদিন ক্রেমেন্স এলেন আমার ঘরে, বললেন—কমিন্টার্ন থেকে ভারতে একজনকে পাঠাচ্ছে। সে খবর কিছু জানেন? এ বিষয় আমি কোনোই খবর জানি না—তাঁকে বললুম। তিনি বললেন—আমরা কমিন্টার্নের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয়েরা এখানে উপস্থিত থাকতে আমাদের কোনো কিছুই জানানো হল না—এ ভারী অন্তায়। এর প্রতিবাদ করা উচিত। আমি তখনই রাজী হলুম এর প্রতিবাদ করতে। ক্রেমেন্সকে বললুম—চলুন

আমরা কুজিনিদের সঙ্গে দেখা করি গিয়ে। আমরা ছুজনে কমিন্টার্ন-ভবনে গিয়ে কুজিনিদের সঙ্গে দেখা করলুম।

কুজিনিকে বললুম—তুনলুম আপনারা ভারতবর্ষে লোক পাঠাচ্ছেন। একথা কি সত্যি? যদি সত্যি হয় তো আমরা ভারতীয় কমিউনিস্টরা এখানে রয়েছি, আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তো পারতেন! কুজিনি বললেন—কে আপনাকে বলেছে যে আমরা ভারতবর্ষে লোক পাঠাচ্ছি? তার নাম আমি জানতে চাই।

ক্লেমেন্সের দিকে তাকিয়ে দেখলুম তার মুখটি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, তয়ের উত্তেজনায় তার চিবুক ও গাল কাঁপছে। ঘুণায় আমার মন সংকুচিত হল, নোংরা জিনিসের সংস্পর্শে মন যেমন অশুচি বোধ করে ঠিক সেই রকম অশুচি বোধ করতে লাগলুম। এই হল কমিউনিস্টের অস্তরের চেহারা।

বললুম—আমাকে মাপ করবেন। আমি তার নাম আপনাকে বলতে পারব না। তাকে আমি কথা দিয়েছি তার নাম প্রকাশ করব না।

কুজিনি বললেন—ও-সব:বুর্জোয়া কুসংস্কার। কমিউনিস্টদের মধ্যে ও-সব কুসংস্কারের আদবেই স্থান নেই। নাম আপনাকে বলতেই হবে। আমি আপনার নাম কন্ট্রোল কমিশনে পাঠাচ্ছি এই গোপন করার অপরাধের জন্য আপনার বিচার হবে। বললুম—আপনি যা ভালো মনে করেন তাই করবেন। কিন্তু কে আমাকে বলেছে তার নাম আমি জানাতে পারব না। কথা-দেওয়া যদি বুর্জোয়া হয় তো সে অপরাধে আমি নিশ্চয়ই অপরাধী।

এবারে আলোচনার ধারা ঘুরিয়ে কুজিনি বললেন—আপনি বিপ্লবী কিসে কথা মানি—কিন্তু আপনি লেনিনবাদী নন।

বললুম—কমরেড কুজিনি, লেনিনবাদী আমি এই দাবি আমি করছি নে। তবে কমিউনিজমকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি ও তাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছি। কিছুই আমার জানা ছিল না, এখন অনেক জিনিস আমি বুঝতে পারছি। আমার সময় লাগবে লেনিনের মতবাদকে ঠিকভাবে বুঝে নিতে। তবে চেষ্টা যে আমি করছি সে-বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ হতে পারেন।

কুজিনি আর কিছু বললেন না। উঠে পড়লুম। ক্লেমেন্সের দিকে

তাকিয়ে দেখলুম—মুখের রঙ স্বাভাবিক হয়েছে আর সে নিশ্চিন্ত মনে সমানে পাইপ টেনে চলেছে। বুঝলুম, স্টালিনবাদী হওয়ার যোগ্যতা আমার কোনোদিক দিয়েই নেই। ঘরে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলুম—আমার স্থান হবে কি কোথাও এই পৃথিবীতে? নিজের বুদ্ধির দাঁড়িপাল্লায় সব জিনিস মেপে নেওয়ার এই যে আমার মনের গঠন—এটা কি কোথাও আমাকে মিলতে দেবে? কখনো কি আমাকে সোয়াস্তি দেবে এই দাঁড়িপাল্লার হাত থেকে? টেরারিস্ট আন্দোলনের রোম্যান্টিক মোহ কাটিয়ে এসেছিলুম গান্ধীবাদের পথে, ভারতীয় বুর্জোয়াদের জাতীয় বিপ্লবের শরিক করে রাখবার জন্তই হোক, এ ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া শ্রেণীর জাতীয় বিপ্লবে বৈপ্লবিক ভূমিকা আছে, স্টালিনবাদের এই মতের সঙ্গে গান্ধীবাদের বিশেষ পার্থক্য আছে কি?—আর ধীরে ধীরে বুর্জোয়াদের পশুমনকে পরিবর্তিত করে তাদের বিবেক জাগ্রত করা যাবে গান্ধীজীর এই অবাস্তব স্বপ্নবিলাসী ধারণার জন্তই হোক গান্ধীবাদের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থনের রূপটি যখন মনের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল, যখন গান্ধীবাদ প্রচারিত অহিংস নীতি যথার্থ অহিংসনীতি নয় বলে মনে সন্দেহ জাগল, তখন গান্ধীবাদের পথ ছেড়ে কমিউনিজমের পথে এলুম। কম অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় নি তখন! তবুও বিচারের নীতি বর্জন করে অন্ধ ভক্তির কাছে আত্মসমর্পণের আবিলতা আমি স্বীকার করতে পারি নি। সমস্ত প্রাণ দিয়ে কমিউনিজমের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলুম। নিজের জীবনের শিকড় গভীরতম ভালোবাসার মৃত্তিকা থেকে উপড়ে ফেলে রক্তাক্ত হৃদয় দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় এসেছিলুম কমিউনিজমের বাস্তব প্রতিফলনের রূপ দেখবার জন্ত। সেখানে এসেও বা কী দেখলুম! স্টালিনের উপদেশীয় চক্রান্তের বীভৎস নীচতা, সারা জীবন ধারা বিপ্লবের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা দোষারোপের নির্লজ্জ ব্যবহার, স্টালিন ও তার উপদলীয় চক্রান্তের সেবকদের ব্যক্তিগত জীবনে ভোগপ্রাচুর্যের কদর্যতা, পৃথিবীর নানা দেশের কমিউনিস্টদের কমিউনিজমের সেবক না করে স্টালিনের গোলাম-বানানোর ইতর খেলা, অকথা ত্রাস-ব্যবস্থার দ্বারা রুশ জাতিকে বোবা করে তোলার মর্যাস্তিক প্রয়াস, সাহিত্য ও শিল্পকে স্টালিন-পূজার কাজে লাগানোর ব্যবস্থা—এই কি কমিউনিজম?

এইজন্তে কি এত মানুষ প্রাণ দিয়েছে, এত মানুষ মর ছেড়ে বের হয়ে পড়েছে ?

বুকের মধ্যে প্রশ্নগুলি চেউয়ের মতো তোলপাড় করছিল, বুকের শিরাগুলো কাঁপছিল ব্যথায়। সোভিয়েট রাশিয়ায় যা দেখছি, যা ঘটছে সেটা যে কমিউনিজম নয়, সেটা যে স্টালিনবাদ—সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সংশয় ছিল না। এই সিদ্ধান্ত আমার নিজের অভিজ্ঞতার ফল, আমার বিচারপন্থী মনের সিদ্ধান্ত। ট্রটস্কির বেশির ভাগ লেখার সঙ্গে তখন আমার কোনো পরিচয় ছিল না। ১৯২৭-২৮ সালেই ট্রটস্কির লেখা বইগুলি সোভিয়েট রাশিয়ায় পাওয়া দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। যাদের কাছে ছিল তারাও ভয়ে ভয়ে সেগুলি সরিয়ে রাখত। লিওর মুখ থেকে ট্রটস্কির কথা শুনতুম মাঝে মাঝে—কিন্তু সেটা আদবেই যথেষ্ট ছিল না ট্রটস্কির মতকে গ্রহণ করবার পক্ষে। বরঞ্চ ট্রটস্কি সম্বন্ধে আমার মনে বিরূপতাই ছিল প্রথম দিকে। সোভিয়েট রাশিয়ায় যখন পৌঁছলুম তখন স্বভাবতই অজ্ঞানতাবশত স্টালিনবাদকেই কমিউনিজম বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করেছিলুম। বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল স্টালিনবাদের স্বরূপ আবিষ্কার করতে। তাই মস্কোয় গিয়ে আমি রাতারাতি ট্রটস্কিপন্থী হয়ে গিয়েছিলুম—মুজফ্ফর আহমদের এই যুগান্তকারী উক্তি তাঁর অতলস্পর্শী নিবুদ্ধিতার ও স্টালিন-পূজার ফল। এমন-কি পরবর্তী কালেও আমি কখনো ট্রটস্কিপন্থী হই নি। ট্রটস্কির সব মত আমি নির্বিচারে জানতে পারি নি যেমন করে ভারতের ও সিংহলের ট্রটস্কিপন্থীরা মেনে থাকেন।

লিও, নিনা, সুরা, রুদানোভ্‌স্কায়া—এদের আমার মনের অবস্থাটা খুলে বললুম। স্থির করলুম যে কয়েকমাস সোভিয়েট রাশিয়ায় থাকব। সে কয়েকমাসের মধ্যেই সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে বই লিখে ফেলব।

প্রায় মাসখানেক ধরে কংগ্রেসের অধিবেশন চলল। জুলাই মাসে অধিবেশন শেষ। শেষ হওয়ার দু-এক দিন আগে স্টালিনের আকস্মিক আবির্ভাব—কংগ্রেসের মধ্যে। হঠাৎ সবাই দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিতে লাগল। প্রথমে বুঝতেই পারি নি এত হাততালির উচ্ছ্বাস কী কারণে! পাশের লোকটিকে জিজ্ঞেস করে জানলুম যে স্টালিন এসেছেন, তাই ভক্তমণ্ডলীর এত অবিশ্রাম হাততালি! দেখলুম, স্টালিন দাঁড়িয়ে

আছে নিখর মূর্তির মতো—চতুরতা ও মানবতাবোধহীন হিংস্রতার খনি তার চোখদুটি। হাততালি খামিয়ে ভক্তমণ্ডলী ‘ইনটারন্যাশানল’ও গেয়ে দিল। দেবতার অন্তর্ধান হল।

কংগ্রেস শেষ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই মস্কো প্রায় খালি হয়ে এল। সবাই মাসখানেকের বিশ্রামের জন্তে মস্কো ছেড়ে নানা জায়গায় চলে গেল। আমিও চলে গেলুম ককেশাসে। গাগরী—ব্ল্যাক-সীর ধারে ছোট্ট শহরটি—সমুদ্রের তপ্ত হাওয়ায় নিশ্চিন্ত মনে এলিয়ে পড়ে আছে সুন্দরীর মতো। কোনো ভাবনা নেই, পৃথিবীর কোনো সমস্টাই তাকে স্পর্শ করে নি। সুন্দরীদের মুখের মতোই গাগরীর মুখ—চিন্তার কোনো বলিরেখা নেই তার মুখে। সে যে সুন্দরী এইটে জানিয়েই সে খুশি। নীল সমুদ্র, ক্ষীণ পীত সৈকত, ছোট্ট শহর, শহরের গা ঘেঁষে সবুজ বনে ঢাকা ককেশাস পাহাড় উঠে গেছে। নিনাও এসে হাজির হলো গাগরীতে। সোভিয়েট রাশিয়ার উপর বই লিখতে শুরু করেছি তখন। নিনা আসাতে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ করবার সুযোগ পেলুম। পাহাড়ের গায়ে একটি বাড়িতে ঘর পেয়েছিলুম। সকালে সমুদ্রের তীরে নেমে যাই। সমুদ্রে অনেকক্ষণ ধরে স্নান সেরে রেন্টোর’য় থেয়ে ঘরে ফিরি। নিয়ে আসি পীচ আর আঙ্গুর—যেমন সস্তা তেমনি স্বাস্থ্য। রাস্তিরের খাওয়াটা পাউরুটি, পীচ আর আঙ্গুর দিয়েই সারি বেশির-ভাগ দিন। নিনা যেদিন আসে সেদিন ককেশাসের বিখ্যাত আঙ্গুরের সুরাও নিয়ে আসে সে।

সেদিনকার মতো সন্ধ্যাবেলার নিয়মিত লেখায় ছেদ পড়ে। মনটা কাব্যরসের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াবার ছুটি নেয়।

রোজই লিখছি—অফুরন্ত লিখছি দিনভোর। কলমটা যেন পক্ষীরাজ ঘোড়া—খামতেই চায় না—ক্লান্তি নেই তার। আমার মনটাও তখন কানায় কানায় ভরা—তথ্য, তত্ত্ব, স্বপ্ন—কী যে তাতে নেই! জীবনের সেই ভরা কোটালের দিনগুলি মনে পড়লে মন কেমন করে।

বই লেখটা কিছুটা এগিয়ে গেলেই নিনাকে মুখে মুখে ইংরিজীতে অভ্যুবাদ করে শোনাই। একদিন তাকে শোনালুম সোভিয়েট রাশিয়ার গৌড়ামি ও কুসংস্কারের অন্ধ পীড়ন সম্বন্ধে যা লিখেছিলুম সেই অংশটুকু। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নিনা বললে—তোমার যে কি হবে আমি জানি

নে। বললুম—আমিও জানিনে। আর জেনেই বা কী হবে? নিনা বললে—তুমি পাগল, তুমি এই আষ্টে-পৃষ্ঠে শিকল-পরা মতবাদের বন্দীশালায় এলে কেন, বলতে পারো? বললুম—একদিন রাশিয়াতে বন্ধনমুক্ত মনের অধিকারী পাগলদের বড়ো আস্তানা ছিল। আজও তারা আছে, তবে এখন তাদের স্থান হয়েছে স্টালিনের কারাগারে আর সাইবেরিয়ায়। এই পাগলদের আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। আমাকেও বোধহয় ক্ষমতাবাজদের হাতে লাক্ষিত হয়ে ‘একরোখা পাগল’ এই আখ্যা নিয়েই দিন শেষ করতে হবে। নিনার নীল চোখদুটিকে ঘিরে অশ্রু ছলছলিয়ে উঠল। সে কিছু না বলে উঠে চলে গেল।

ব্ল্যাক-সীর তীরের অনেকগুলি সুন্দর জায়গা—সোফি সুখুম্ নোভয়াফোন—আমরা কয়েকজন ঘুরে এলুম। ককেশাসে বেড়ানো শেষ করলুম ‘খোস্তা’ বলে একটি নিরালা গ্রামে দু-চার দিন কাটিয়ে। বাড়িটি ছিল একটি উঁচু টিপির উপর, চারপাশে ছিল তার পীচ, আপেল আর আঙ্গুরের বাগান—ঘর থেকেই সমুদ্র দেখা যেত।

মাঝে মাঝে সেই দিনগুলি যখন মনের মঞ্জুষা খুলে বের হয়ে আসে তখন দেখি আমার যৌবনের সেই দিনগুলি বিষাদভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা যেন বলছে—এখনো মিলিয়ে চলতে শিখলে না? এখনো রোম্যান্টিক থেকে গিয়ে জীবনকে শুধু ক্ষেপিয়ে তুলবে বারে বারে? কী লাভ এত আঘাত পেয়ে?

মস্কোয় ফিরলুম সেপ্টেম্বর মাসে। গাছের পাতা সোনালি হয়ে ঝরে যাবে—সেই দিনগুলি ঘনিয়ে এলো। সুরা আসে, তার সঙ্গে বসে রুশীয় কবিতা অনুবাদ করে চলেছি। লিও আসে, তার সঙ্গে রাজনীতির আলোচনা চলে। রুদানোভ্‌স্কোয়ার ঘরে সামোভার ঘিরে আমাদের মজলিশ জমে। মাঝে মাঝে কমিন্টার্নে যাই সোভিয়েট রাশিয়া থেকে বিদায় নেবার বন্দোবস্ত করবার জগ্গে। কমিন্টার্নে নতুন নতুন মুখ দেখি, যাদের সঙ্গে চেনা ছিল তারা ভদ্রতাটুকু রেখে এড়িয়ে যায়। উপরে দেখাই বেপোরোয়া ভাব কিন্তু বুকের ভিতরটা কেমন যেন ব্যথা করতে থাকে।

রাশ রাশ বই পড়ছি আর সংগ্রহ করছি সঙ্গে নিয়ে যাবার জগ্গ। সোভিয়েট রাশিয়ার উপর বই লেখাও শেষ হয়ে গেল। হেমস্তের সোনালি

দিনগুলি শেষ হতে না হতেই শীত এসে পড়ল। সোনালি পাতাগুলো ছড়িয়ে দিল উত্তরে হাওয়া। গাছের নগ্নতাকে ঢেকে দিল বরফের শুভ্র উত্তরীয়। নভেম্বর-বিপ্লবের বার্ষিক উৎসবের দিনও এসে পড়লো। আনা মিরকিনা আর আমি জনসাধারণের আনন্দের উত্তাপটুকু অনুভব করবার জগ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলুম। গত বছরের আনন্দের উত্তাল তরঙ্গ যেন অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে বলে মনে হল—হয়তো বা সেটা স্টালিনের মতবাদকে যারা স্বীকার করে নিতে পারেনি তাদের বিরুদ্ধে স্টালিনের বর্বর ত্রাস-ব্যবস্থার ফলে ঘটেছিল, শ্রমিকদের মনে অসন্তোষের বহিঃপ্রজ্জ্বলিত ছিল তাই আনন্দে ভাঁটা পড়েছিল। কিংবা এই এক বৎসরে আমার ধারণার যে গভীর পরিবর্তন ঘটেছিল, তার ফলে আমার আনন্দের উৎস-মুখে মোহভঙ্গের বিরাট পাথর এসে আনন্দের ঝরনাধারার বের হওয়ার পথ রুদ্ধ করেছিল। তেভেরস্কায়া উলিংসার ব্রিস্টল হোটেলে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ১৯২৮ সালের নভেম্বর উৎসব শেষ করলুম।

কমিন্টার্নে ঘন ঘন ডাক পড়তে লাগল। অদৃশ্য কালিতে কী করে লিখতে হয় সে-সবের তালিম নিলুম। অস্ট্রেলীয় এক কমিউনিস্টের পাশপোর্টে আমার নেকটাই-পরা ছবি সঁটে দেওয়া হল। এই প্রথম আমি নেকটাই পরলুম। ডিসেম্বরের শেষাংশে একদিন সন্দের দিকে মস্কো ছাড়লুম। লিও, সুরা, রুদানোভ্‌স্কায়া, মিরকিনা আর কমিন্টার্নের দু-একটি লোক আমাকে বিদায় দিতে স্টেশনে এসেছিল।

একটি ফাস্ট ক্লাস কুপে আমার জগ্গ রিজার্ভ করা ছিল। কুপেতে ঢুকে কাপড় ছেড়ে আরাম করে বসলুম। সঙ্গে যে-সব জরুরি কাগজপত্র ছিল সেগুলি শাটের তলায় পিঠের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলুম লম্বা ফিতে দিয়ে। ঠিকই করেছিলুম বার্লিন না পৌঁছনো পর্যন্ত কুপে ছেড়ে কোথাও যাব না। ট্রেনের লোক এসে বিছানা করে দিয়ে গেল। রাতের খাওয়াও কুপেতে নিয়ে আসবার জগ্গ বলে দিলুম তাকে। পরদিন বিকেলে হঠাৎ ইচ্ছে হল ট্রেনের রেস্টোরঁয় একটু ঘুরে আসি। রেস্টোরঁয় গিয়ে মিনিট পনেরো বসেছি, মনে কেমন অসোয়াস্তি হতে লাগল—কুপে ছেড়ে এসে ভালো করি নি। তাড়াতাড়ি কুপেতে ফিরে গেলুম। কুপের দরজা খুলতেই দেখি ট্রেনের লোকটি আমার বাঁশ্ব খুলে হাতড়ে দেখছে কী আছে

আমার এটাচি কেসে। আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি ডালাটা বন্ধ করে ঘর সাফ করবার কাজে লেগে গেল। পরে দেখি কিছু ডলার আমার খোয়া গেছে। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনগুলিতে প্রত্যেক গভর্নমেন্টের চরদের জবরদস্ত চক্রবৈঠক। এদের মধ্যে রেযারেবিও আছে, এলাকা ভাগ করাও আছে। সঙ্কেবেলায় ওয়ারসয় পৌঁছলুম। তারপর দিন সঙ্কেবেলা পৌঁছলুম গিয়ে বার্লিনে। স্টেশনে নলিনী গুপ্ত এসেছিল। সে আমাকে নিয়ে গেল তার আস্তানায়। অনেক রাত পর্যন্ত নানা বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা চলল।

পরের দিন সঙ্কেবেলায় গ্রেটে এল। ১৯২৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ঘরে গ্রেটের সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দেন মানবেন্দ্রনাথের তৎকালীন স্ত্রী লু। গ্রেটে তার স্বামী (আইনসম্মত বিবাহিত নয়) মুলারের সঙ্গে চীনদেশে প্রায় দুবছর কাটিয়ে মস্কোয় আসে জার্মানিতে ফিরে যাবার পথে। চীনদেশেই মানবেন্দ্রনাথ ও লুর সঙ্গে তার ভাব হয়। কয়েকদিন মস্কোতে থেকে গ্রেটে বার্লিনে ফিরে যায়। মস্কো থেকে ভারতবর্ষে পাঠানোর জন্য সব চিঠি আমি গ্রেটেকে পাঠাতুম। গ্রেটে বার্লিন থেকে সেগুলো ভারতে পাঠিয়ে দিত। আমার মস্কোবাস গোপন রাখবার জন্য এই ব্যবস্থা আমি করেছিলুম। ভারতবর্ষ থেকে আমার যে-সব চিঠি আসত সেগুলোও আসত গ্রেটের ঠিকানায়। সে সেগুলিকে প্রতি সপ্তাহে আমার মস্কোর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিত। গ্রেটের সমস্ত পরিবারটিই ছিল বিপ্লবী পরিবার। গ্রেটের পিতা শ্রীযুক্ত ফুট্রান ছিলেন সোশাল ডেমোক্র্যাটিক দলের সভ্য। পরে রোজা লুক্সেমবুর্গ-এর ‘স্পার্টাকুস’ দলে যোগদান করেন। জার্মান পণ্টনের কয়েকজন অফিসার যখন রোজা লুক্সেমবুর্গ ও কার্ল লিৎথেক্ট-কে হত্যা করে তখন ফুট্রানকেও হত্যা করে। গ্রেটে আর তার দুই ভাই জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। বড় ভাই আলবার্ট—রোজগারের দিকে তার বেশি নজর ছিল না। ছোট ভাই ছিল বেশ ভালো গায়ের। নানা ক্যাবারেতে গান গেয়ে উপার্জন করত। গ্রেটের মাকে ছেলেমেয়েরা ‘টইবি’ বলে ডাকত। আমিও তাদের দেখাদেখি বৃদ্ধাকে ‘টইবি’ বলে ডাকতুম। এককালে তিনি যে সুন্দরী ছিলেন তা এ বয়সেতেও বোঝা যেত। জীবনের নিষ্ঠুর আঘাত

তাঁর মুখে চিহ্ন রেখে গেলেও মুখের শ্রী ও লাবণ্য একেবারে নিঃশেষ করতে পারে নি। বিষাদমাখা প্রশান্তি তাঁর চোখের দৃষ্টিকে বিরল অপরূপতায় ভরে দিয়েছিল।

১৯২৭ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় যাওয়ার আগে মাসখানেক বার্লিনে ছিলুম। তখন সোশাল ডেমোক্র্যাটিক দলের হাতেই প্রাসিয়ার গভর্নমেন্ট। নাৎসি দল গজিয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু তার দাপট তখন শুরু হয় নি। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন সোভিয়েট রাশিয়া থেকে ফিরে এলুম বার্লিনে, তখন যে রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখলুম বার্লিনে তা বিস্ময়কর। নাৎসিদের মিটিং চলছে শহরের নানা জায়গায়, প্রায়ই শহরের নানা এলাকায় নাৎসিদের ঝটিকা বাহিনীর (storm troopers) সঙ্গে—কমিউনিস্ট পার্টির লাল বাহিনীর সংঘর্ষ চলছে রাস্তায় রাস্তায়। স্টেনগান ও রিভলভারের আদানপ্রদানে দুই দলের লোক হত ও আহত হচ্ছে।

ফুফুস্টনডাম ও উলাগুস্ট্রাসের কোণে কাফে মোঁরিং নামে একটি কাফেতে বসেছিলুম সন্ধ্যাবেলা। হঠাৎ রাস্তা থেকে স্টেনগানের আর রিভলভারের আওয়াজ কানে এল। দু-একটি গুলি এসে লাগল কাফের রাস্তার ধারের বন্ধ জানালার কাঁচে। কাফের মধ্যের আলো নিভে গেল, দু-একটি মেয়ে ভয়ে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল। বাইরে গেলুম, দেখলুম ফুটপাথে রক্তের দাগ, পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

রেমার্কের ‘পশ্চিম যুদ্ধ ফ্রন্টে নতুন কিছু ঘটে নি’ ফিল্মটি দেখতে গিয়েছিলুম একদিন সন্ধ্যাবেলা। যুদ্ধের ভয়াবহ অমানুষিকতাকে অপূর্ব-ভাবে চিত্রিত করেছিল ফিল্মটি। এই ফিল্মটি যে দেখবে সে যুদ্ধবিরোধী না হয়ে পারে না—অবশ্য সে যদি একেবারে মানবতাবোধহীন না হয় নাৎসিদের মতো। প্রেক্ষাগৃহের ভর্তি দর্শকে, ঘর অন্ধকার, হঠাৎ মেয়েদের চীৎকারে ঘর ভরে গেল। আলো জলে উঠল—দেখা গেল সাদা ইঁদুরে ঘর ভর্তি। নাৎসীরা এক গাদা সাদা ইঁদুর নিয়ে এসে অন্ধকারে ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল। মেয়েদের পায়ের উপর ইঁদুরগুলো উঠতেই প্রেক্ষাগৃহে যা ধ্বনি উঠল তাতে সবাই ত্রস্ত সচকিত।

একবার হিটলারের বক্তৃতা শুনে ‘স্পোর্ট পালাস্ট’-নামক সেই

বিরাট ঢাকা জায়গায় গিয়েছিলুম। হাজার হাজার লোকে ঘর ভর্তি। ঘরের দুপাশে হিটলারের গুণ্ডাদল—ব্রাউন শার্ট-পরা ‘এস-এ’-রা লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মধ্যে দিয়েও একদল ‘এস-এ’ সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে। বক্তৃতামঞ্চের পেছনে দেওয়াল জুড়ে বিরাট আকারের নাৎসিদের উন্টো স্বস্তিকা। তার সামনেই একেবারেই কালো পোশাক-পরা হিটলারী গুণ্ডাদের মধ্যে অভিজাত যারা সেই ‘এস-এ’ বাহিনীর লোকেরা নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। এদের কালো পোশাকের বুকে দুটো হাড় আর তার মধ্যে মড়ার খুলি ঝাঁক। অস্ত্র ছ’কিট লম্বা মোনালি চুল আর নীল চোখ না হলে কেউ ‘এস-এ’-এ যোগ দিতে পারবে না। খাঁটি আর্থ হওয়ার প্রমাণ হল নীল চোখ আর মোনালি চুল। নাৎসিরা তো নিজেদের আর্থ বলেই জাহির করছিল। ঘরের মধ্যে উত্তেজনার ঢেউ বইছে। হঠাৎ শোনা গেল রেডিওতে—ফ্যারার এখন উইলহেল্মস্ট্রাসের প্রধানমন্ত্রীর ভবন থেকে বের হচ্ছেন। রেডিওতে শুনতে পেলুম উইলহেল্মস্ট্রাসে দণ্ডায়মান জনতার কণ্ঠের—‘হাইল হিটলার’ ধ্বনি। রেডিওতে শুনতে লাগলুম—‘ফ্যারারের চারপাশে শত শত খাঁটি আর্থ জার্মান মেয়েরা নতজানু হয়ে তার হাত চুম্বন করছেন। ফ্যারার এখন এই রাস্তায় এসেছেন। শুধুন জনতার জয়ধ্বনি’। সেই বিরাট ঘরে অপেক্ষমান জনতা অগ্নিগর্ভ বৈদ্যুতিক তারের মতো অস্তরে জ্বলতে লাগল। সেই বিরাট জনতার জ্বলন্ত হলুদ আমার মতো ফ্যাসিজম-বিরোধী লোককেও স্পর্শ করে কাঁপিয়ে দিল। হঠাৎ ‘স্পোর্ট পালার্ট’-এর সব আলো নিবে গেল। সেই অন্ধকারে সেই বিরাট জনতা যেন আদিম যুগের কোনো প্রাক-ঐতিহাসিক জন্তুর মতো নিশ্বাস ফেলতে লাগল। একটি তীব্র আলো অন্ধকারের বুক চিরে এসে পড়ল সেই বক্তৃতামঞ্চের উপর যেখানে হিটলার দাঁড়িয়ে শুধু সেই জায়গায়। বাদবাকী মঞ্চটিও অন্ধকারে ঢাকা। জনতার জন্তে, অদ্ভুত নাটকীয় পরিবেশের সৃষ্টি করল নাৎসিদের প্রচার বিভাগের কর্তা—গোয়েবল্‌স্। তার তারিফ না করে পারলুম না। স্টালিনপন্থীদের কাছ থেকে প্রচার-কৌশলে হাতে-খড়ি নিয়ে গোয়েবল্‌স্ তাদের থেকে অনেক অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল প্রচারের কলাকৌশলে।

রুশীয় জনগণের কাছ থেকে নিজেকে সুরিয়ে রেখে রুশীয় চরিত্রে

অচেনা অজানা সম্বন্ধে যে গভীর আকর্ষণ আছে সেই ‘মিস্টিক’ মনোভাবকে স্টালিন খোরাক যোগাত, তাকে তৃপ্তি দিত। ঈশ্বরের মতোই স্টালিন অচেনা, অজানা, অদৃশ্য ও রহস্যময়। হিটলারের বেলা কিন্তু সে কথা বলা চলে না। লক্ষ লক্ষ লোক তাকে নিয়ত দেখছে, তার বক্তৃতা শুনছে। এই অবস্থাতেও তাকে রহস্যময় করে রাখা জনগণের কাছে—এটা কম বাহাদুরীর কথা নয়। হিটলারের বক্তৃতা শুরু হল। মনে হল যুগীরোগাক্রান্ত একটি লোক প্রলাপ বকছে। এত অর্থহীন, কুরুচিপূর্ণ, শূন্য কথার বক্তৃতা যে কী করে জার্মান জাতির মতো একটি বুদ্ধিমান জাতিকে অভিভূত করতে পারে তা ভেবেই পেলুম না।

জার্মান জাতির মানসিক ও ভাবময় গঠন বোঝাবার জন্যে ইচ্ছে জাগল মনে। সেটি না ধরতে পারলে কী কারণে জার্মান জাতি হিটলারের নাৎসিজম গ্রহণ করেছে সেটা বোঝা সম্ভব নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মিত্রশক্তিগুলি জার্মানির প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছিল সেই দুর্ব্যবহার, ভাঙ্গাই সন্ধির অপমান—এইগুলিকেই জার্মানিতে নাৎসিজম-এর উদ্ভবের কারণ হিসেবে ধরা হয়। এগুলি যে একেবারেই কোনো কারণ জোগায়নি নাৎসিজম-এর উদ্ভবের, তা বলছি নে, কিন্তু এগুলি একেবারে উপরের ভাসা-ভাসা কারণ। যখন নাৎসিজম সম্বন্ধে কিছুটা পড়াশোনা করলুম তখন বুঝলুম যে জার্মান জাতির অতীত ইতিহাসের যুক্তিকাতেই নাৎসিজিমের শিকড় কিভাবে বহু যুগ ধরে প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

বহু যুগ থেকে ধর্মে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তার আত্মিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে জার্মান যাকে গর্বের সঙ্গে ‘জার্মানীয়তা’ বলে তার অতি সচেতন সংঘাত চলে আসছে। জার্মানরা যাকে ‘কুলটুর’ বলে সেটি আমরা যাকে কালচার কিম্বা ‘সংস্কৃতি’ বলে থাকি সেটির কোনো সম্বন্ধ নেই। ‘কুলটুর’ বলতে জার্মানরা যা বোঝে সেটি হচ্ছে প্রভুত্ব, এমন একটি নিরন্তর সংগ্রাম যা কোনদিনও একটি চরম পরিণতিতে পৌঁছে দিয়ে সম্ভ্রাম দেয় না। এ ছাড়া ‘কুলটুর’ বলতে জার্মানরা বোঝে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির সঙ্গে জার্মান জাতির একটি বিশেষ

নিবিড় সম্বন্ধ। একমাত্র জার্মান জাতিই এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলির অর্থ যথার্থভাবে বুঝতে পারে।

১৮০৮ খৃস্টাব্দে ফিখ্টে তাঁর ‘জার্মান জাতিকে চৌদ্দটি বক্তৃতা’-নামক বইতে লিখেছিলেন যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির সঙ্গে কী করে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় তার প্রণালী জানে একমাত্র জার্মানরা। ফিখ্টে জার্মান জাতিকে স্বরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে একমাত্র তারাই হচ্ছে আদিম জাতি (উরফোল্ক) আর একমাত্র তারাই সেই আদিম জাতির ভাষা (উরস্প্রাখে) বলে। এই জন্মেই তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। আর এই কারণেই জার্মান জাতির মন অগ্র-সব জাতীয় মনের চেয়ে অতি সহজে আদিম যুগের সহজ প্রবৃত্তি ও আদিম যুগের চিন্তাজগতে ফিরে যেতে পারে। পশ্চিম জগতের সভ্যতা, প্রাচীন চিন্তাধারা ও খৃস্টধর্মের শিক্ষার প্রভাবে এই আদিমতা থেকে মুক্তি হওয়ার চেষ্টা করেছে। ফিখ্টের এই ধারণাগুলির সঙ্গে হিটলারের নাৎসিজমের, এক কথায় জার্মান ফ্যাসিজমের ধারণাগুলির আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য আছে। মনে হয় ফিখ্টের চিন্তাধারা বিংশ শতাব্দীতে নাম বদল করে ‘নাৎসিজম’—এই নামটি গ্রহণ করেছে।

ফিখ্টের চিন্তাধারার সঙ্গে মাঝে মাঝে আরো সব চিন্তাধারার প্রবাহ এসে মিশেছে—যেমন রাষ্ট্রসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেল-এর ধারণা, বিশেষ করে প্রুশীয় রাষ্ট্রসম্বন্ধে তাঁর অভিমত, নিটশের খৃস্টধর্মে-বিরোধী ও মানবতাবাদ-বিরোধী চিন্তাধারা ও হুস্টন চেম্বারলেন্ নামক এই ইংরেজ যিনি জার্মানিকে তাঁর স্বদেশ করে নিয়েছিলেন, ‘জাতি’ সম্বন্ধে ও জাতির স্বরূপসম্বন্ধে তাঁর মতবাদের ধারা এইভাবে প্রাচীন সভ্যতা-বিরোধী ও খৃস্টধর্মবিরোধী নানা মতবাদের স্রোত জার্মান জাতির মানস খাতে বয়ে চলেছিল দীর্ঘ কাল ধরে। ১৮০৪ খৃস্টাব্দে লেখা জার্মান মহত্ব সম্বন্ধে একটি অসমাপ্ত কবিতায় প্রসিদ্ধ কবি শিলার লিখলেন যে একমাত্র জার্মান জাতি পবিত্র বস্তুগুলি বোঝবার ক্ষমতা রাখে কেননা একমাত্র এই জার্মান জাতিই বিশ্ব আত্মার সঙ্গে আলাপ করে থাকে। শিলারের এই অর্থহীন প্রলাপের সঙ্গে হিটলারের নিবুন্ধি উক্তিগুলির যদি তুলনামূলক বিচার করে দেখা যায় তো দেখা যাবে যে তারা এক জাতেরই নিবুন্ধিতা।

ফিখ্‌টে এ কথাও শুনিয়া দিলেন যে সকলের চেয়ে ক্ষমতাশালী যে জাতি তার নিজের তৈরি নিয়ম খাটে। তা ছাড়া তার জন্তে আর কোনো নিয়ম নেই এ জগতে। জার্মান জাতি সব জাতির চেয়ে ক্ষমতাশালী বলে তার নৈতিক অধিকার আছে ছলে বলে কৌশলে। যেমন করে হোক, যে চরম জাতীয় পরিণতি শুধু তারই লভ্য—সেটি লাভ করা। দার্শনিক হেগেল এই ধারণাগুলিকেই আরো পুষ্ট করে তুললেন। তিনি লিখলেন যে যুদ্ধই হচ্ছে রাষ্ট্রের এই অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র উপায়, আর প্রশ্নীয় রাষ্ট্র যদি উপায় ব্যবহার না করে তো সে সাংঘাতিক অন্ত্যায় করবে। তাঁর মতে একমাত্র যুদ্ধই জড়তা ও অনগ্রসরতা থেকে জাতিকে মুক্তি দেয়। তা ছাড়া মানবসমাজের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে ভারসাম্য রাখবার জন্তে যুদ্ধই হচ্ছে অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। এই কারণেই যুদ্ধের মতন এমন একটি মহৎ উপায়কে, ঈশ্বরের মহৎ দানকে মানব জাতি কখনই উপেক্ষা করতে পারে না।

কথাগুলো নিশ্চয়ই বেশির ভাগ লোকদের একেবারে নির্বাক করে দেবে বিশ্বয়ে। একজন দার্শনিক, তার উপর আবার মামুলী দার্শনিক নয়। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, তিনি যে এত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী হতে পারেন, আর যুদ্ধবাজ হতে পারেন, এটা ভাবতে মন সঙ্কুচিত হয়। তবুও এই সত্যটুকু মেনে নিতেই হবে যে হেগেল ছিলেন প্রশ্নীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান সমর্থক, আর যুদ্ধের একান্ত পক্ষপাতী ক্লাউসভিৎস্ থেকে লুডেনডর্ফ—যেসব রক্তপিপাসু সামরিক লোক যুদ্ধকে জাতির অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলেছেন, তাঁরা সকলেই ফিখ্‌টে, হেগেল প্রভৃতি পূর্বসূরীদের চিন্তাধারা আত্মসাৎ করে একটু ভোল বদল করে শুনিয়েছেন।

এই এতক্ষণ যে আলোচনাটুকু করলুম মনে হয় তার থেকে সুস্পষ্ট হবে যে পশ্চিম মহাদেশে মানব-সত্তার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়ে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে তাকে ধূলিসাৎ করাই হচ্ছে ‘জার্মানীয়তা’ ও তারই ইতিহাস-ভিত্তিক পরিণতি নাৎসিজম্-এর চরম উদ্দেশ্য। তাই মানবতাবাদ, ব্যক্তিগত অধিকারের স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিকতা—এই তিন আদর্শের ভিত্তিতে পশ্চিম জগতে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে বহু শতাব্দীর অশ্রান্ত চেষ্টায়, সেই সভ্যতার ভয়ংকর বিরোধী শক্তি ও শত্রু হচ্ছে জার্মান ‘কুলটুর’।

১৩৭ সালে জেনারল হারমান গোয়েরিং তাঁর একটি বক্তৃতায় সদর্পে ঘোষণা করেন যে, তিনি হচ্ছেন আত্মমুখী লোক। তিনি শুধু তাঁর নিজের জাতির কাছেই নিবেদিত। এই পৃথিবীতে তাঁর নিজের জাতি ছাড়া তিনি আর কিছুকেই স্বীকার করেন না। তিনি তাঁর শ্রষ্টাকে ধন্যবাদ দেন তাঁর এই নিজস্ব জাতীয়তাবাদের জন্যে। বাস্তবতা-বিমুখতা ও একান্ত আত্মমুখী চিন্তাকে জাতীয় রূপ দিয়ে গ্রহণ করা ও প্রতিষ্ঠা করা—এই হচ্ছে জার্মান ফ্যাসিজিম্-এর (নাৎসিজিম্-এর) অন্ত্যতম বিশেষত্ব। জাতিই তার আচরণের নিয়ম ও মানদণ্ড সৃষ্টি করবে। বিশ্বমানবতার কাছে জাতির কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। জাতি, বিশেষ করে জার্মান জাতি হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ। এই জগতের সীমানার বাইরে সে আর-কোনো মানবীয় বিচার-ব্যবস্থার প্রভুত্ব স্বীকার করে না।

একটি বেড়া-দেওয়া গোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব নিয়মের অধীন। তার গোষ্ঠীর সীমানার বাইরে যে-সব নিয়মের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি সে আদবেই স্বীকার করে না। একেই বলে উপজাতীয় মানসিকতা। আদিম উপজাতিগুলি তাদের নিজেদের গোষ্ঠীর সৃষ্ট নিয়মগুলি ছাড়া আর কোনো নিয়ম মানে না। জাতীয়তাবাদ (ন্যাশনালিজম) এই উপজাতীয় মানসিকতার পরিচায়ক, আর নাৎসিজিম্ এই উপজাতীয় মানসিকতা বীভৎস ও বর্বর নিদর্শন। নাৎসিদের কাছে তাদের জাতীয় গণ্ডির বাইরে ব্যক্তির অস্তিত্বের কোনো অর্থই নেই।

আগেই হুস্টন্ স্টুয়ার্ট চেম্বারলেনের নাম উল্লেখ করছি। এই ইংরেজটি জার্মানীতেই বাস করতেন ও আইনসম্মতভাবে জার্মান নাগরিক হয়েছিলেন। বাস্তবতামুখিনতার বিরুদ্ধে চেম্বারলেন্ জেহাদ ঘোষণা করেন। পূর্ব-নির্ধারিত কোনো ধারণাকে মেনে না নিয়ে বিজ্ঞান যে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার কাজ করতে পারে—চেম্বারলেন্ সেটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তাঁর মতে একটি বিশেষ সংস্কৃতির কাছে বশতা স্বীকার করেই বিজ্ঞান কাজ চালাতে পারে। স্বাধীনতার অধিকার সব মানুষের প্রাপ্য—এটাকে নিবুঁদ্ধি লোকের মত বলে চেম্বারলেন্ উপহাস করেছেন। প্রতিটি মানুষের দৈহিক ও নৈতিক গুণের বিচার করে যতটা স্বাধীনতা সে পাওয়ার যোগ্য, শুধু সেইটুকু স্বাধীনতা তাকে দিতে হবে। যে-জাতি রাষ্ট্রগঠন করবার

ক্ষমতা রাখে, একমাত্র সেই জাতিই এই স্বাধীনতা পূর্ণভাবে পেতে পারে। বলাই বাহুল্য যে, চেম্বারলেন্-এর মতে শুধু জার্মান জাতিই এই স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য।

চেম্বারলেন্ বলেছেন যে ব্যক্তিত্ব একজন ব্যক্তিবিশেষের গুণ নয়। জাতির সমর্থনেই অবিমিশ্র জাতীয় প্রভাবেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। কোনো ব্যক্তিই তার জীবনাদর্শ সৃষ্টি করতে পারে না। এই আদর্শ তার গোষ্ঠীর বা জাতির সৃষ্ট আদর্শ। কোনো বাস্তবতানির্ভর মানদণ্ড নেই সাধারণ মানুষকে বিচারশীল জীব হিসেবে গণ্য করে তার সঙ্গে ব্যবহার করবার। শুধু এক বিশেষ ধরনের মানুষের অভিজাত্য স্বীকার করে নিয়ে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। এই বিশেষ ধরনের অভিজাত মানুষ হচ্ছে জার্মান মানুষ।

নাৎসিদের জাতিসম্বন্ধীয় মতবাদের সর্বপ্রধান নীতিবিদ্ রোজেনবার্গ এই চেম্বারলেন্-এরই শিষ্য। রোজেনবার্গ-এর অন্ধ জার্মানীয়তার অটেল প্রলাপ থেকে কিছু প্রলাপ বাছাই করে শোনাই। রোজেনবার্গ-এর মতে খৃস্টান ধর্ম ও মানবতাবাদ অতি অনিষ্টকর ভ্রান্ত ধারণা। এই ধারণাগুলির অপদার্থতা প্রমাণ হয়ে গেছে। রক্তের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তিসত্তার কোনোই মূল্য নেই। বুদ্ধিকেও মানুষের বিচারপ্রবণতাকে তার গোষ্ঠীমূলক বা জাতীয় উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে মানবতাবাদ। এইভাবে প্রকৃতির স্বপ্ন থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। শুধু বিমূর্ত শূন্যের বলি হয়েছে মানুষ। বিজাতীয় রক্তের ধারা মিশেছে এসে ব্যক্তির দেহে।

একটি মানবজাতি বলে কোনো কিছু নেই। এটা মূর্খদের ধারণা। সব জাতিকে এক ধর্মে, এক ভাষা ও রীতি দিয়ে সংগঠিত করবার খৃস্টধর্মীয় উদ্দেশ্যকে রোজেনবার্গ 'রোমীয় উদারতা' নাম নিয়ে বিদ্রোপ করেছেন। তাই এই নাৎসিপুঙ্গবের মতে বিশ্বমানবের ঐক্য, বিশ্বাত্মবোধ একেবারে বাজে কথা। সব মানুষকে সংগুণ শেখানো সম্ভব—সক্রেটিস্-এর এই মহৎ ধারণাকে রোজেনবার্গ একেবারে অচল ধারণা বলে বাতিল করেছেন। রোজেনবার্গ উল্লসিত—তার প্রাণপ্রিয় জার্মান জাতি এতদিন পরে জেগেছে। এই জাতির ভিতরে যে অল্পম জীবন-রস আছে তার বিশেষত্ব সম্বন্ধে নাৎসিজম্-এর কৃপায় সে সচেতন হয়েছে। জাতির চেতনা পরিষ্কার

বুঝেছে যে তার সমগোত্রীয় যে-সব ধারণা আছে শুধু সেগুলিই তার গ্রহণযোগ্য। অন্য সব ধারণা বর্জনীয়, সেগুলি ভালো কি মন্দ তার বিচার করে নয়। সেগুলি জার্মান জাতির জাতিত্বের বিরোধী বলে বর্জনীয়, জার্মান জাতীয় সত্তার আন্তর কাঠামোর সঙ্গে তাদের মিল নেই বলে বর্জনীয়। জার্মান আত্মার 'নরডিক' জীবকোষগুলি তৈরি করে তোলাই হচ্ছে এই যুগে জার্মান জাতির মহোত্তম ব্রত। বিজ্ঞানও রক্তের সৃষ্টি—বিশেষ করে জার্মান রক্তের সৃষ্টি—শক্তির সৃষ্টি। দয়া, ভালোবাসা, তিতিক্ষা—এগুলি খৃস্টান কুসংস্কার—বিশেষ করে সেগুলি যখন জাতীয় সম্মানের বিরুদ্ধ শক্তি।

জাতি হচ্ছে বিশেষ ধরনের মানব-সমষ্টি। এই মৌলিকত্বের দরুন তাদের তৈরি নিয়মের অধীন হবে তা নয়, সাবা পৃথকী এই জাতির তৈরি নিয়মের অধীন হবে। অবিশিষ্ট এই জাতি আদ কে হতে, জার্মান জাতি ছাড়া! একটি বিশেষ দৈহিক ও আত্মিক ছাঁচে-ঢালা মানুষেরা তারাই স্বাধীনতা সত্য সংস্কৃতির সব-কিছুর অধিকারী হবে। এক ছাঁচে-ঢালা একটি মানবগোষ্ঠী হচ্ছে আদিম উপজাতীয় ধারণা। বোজেনবার্গের মতবাদ এই উপজাতীয় ধারণারই বিংশ শতাব্দীর নাৎসি-সংস্করণ। এই বিশেষ ছাঁচে-গড়া মানুষের কোনো মানবীয় যুক্তির বা বিবেকের অধীন নয়। তাই তারা তাদের কোনো আচরণের জন্যে তাদের গোষ্ঠীর বাইরের কোনো লোকের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়।

বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ মানব-সমাজের প্রগতির ইতিহাসের সব অভিজ্ঞতা-বিরোধী বোজেনবার্গ-এব এইসব আদিম যুগের বর্বর মানুষের উপযুক্ত ধারণাগুলির ফিরিস্তি এইখানেই শেষ কবি। পাক ঘাঁটতে ঘাঁটতে মন ঘুলায় ভরে উঠছে, বিশেষ এই জাতের পাক যাতে পদ জন্মাবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

নাৎসি ফিত্রিখ্, হিল্শার সাম্রাজ্য সম্বন্ধে যে-সব রূপকথা সৃষ্টি করেছেন তারও মূলে জার্মান জাতির অলৌকিক অসামান্যতা সম্বন্ধে আধিগ্রস্ত মনের অবিদ্বান্স ধারণা। এই সাম্রাজ্য জার্মান সাম্রাজ্য-ব্যতিরেকে আর কিছুই হতে পারে না। হিল্শার বলেছেন যে এই জার্মান সাম্রাজ্যে যা-কিছু পার্থিব সবই স্বর্গীয় সত্তায় পরিপূর্ণ। অপরিমিত শক্তির ও গভীর অন্তর্মুখিতার

মিলন ঘটবে এই জার্মান সাম্রাজ্যে। প্রকৃতির নিয়ম-অনুসারে এই সাম্রাজ্য শাসিত হবে। উপজাতীয় গোষ্ঠীজগতের বাইরে যা-কিছু আছে সবই ভুয়ো। ব্যক্তিসত্তা হচ্ছে শুধু একটি ঢেউমাত্র, সাম্রাজ্যের জোয়ারের মধ্যে সে তাব প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাবে, আর সেখানেই তার সার্থক পবিণতি।

হিল্শার এইভাবে একটানা মানসিক বিকারগ্রস্ত প্রলাপ বকে চলেছেন। এই বিরামহীন প্রলাপের মধ্যে থেকে বক্তব্য খুঁজে বের করা অতি দুকহ কাজ। আমি যেটুকু হিল্শাবের পাগলামিতে ছড়িয়ে-পড়া ধৃলাব স্তব থেকে আবিষ্কার কবেছি সেটুকু হচ্ছে এই—জার্মান জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সাম্রাজ্য স্থাপন করবার অধিকার একমাত্র এই জার্মান জাতির। মানব-চেতনার শক্তি দিয়ে নয়, প্রকৃতির নিয়মে এই সাম্রাজ্য শাসিত হবে, অর্থাৎ বনে জঙ্গলে জন্তুগুলো যেভাবে প্রকৃতির নিয়মে জীবনধারণ কবে পরস্পরকে নিধন করে সেই নিয়মে এই “স্বর্গীয় সত্তায় পরিপূর্ণ” জার্মান সাম্রাজ্যে মানবসমাজ পবিচালিত হবে। গোষ্ঠীজীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন।

মানব-চেতনাকে একেবারে ববখাস্ত কবে দিয়ে প্রকৃতির অচেতন বাজ্যের হিংস্রতাব বেদীতে মানুষকে বলি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে জার্মানীয়তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

প্রসিদ্ধ জার্মান কবি সেক্সান গেয়র্গে নাৎসি মতবাদকে পরোক্ষভাবে কম সাহায্য করেন নি! জাতির মাহাত্ম্যই সর্বোত্তম মাহাত্ম্য। মানব-সমাজের নৈতিক শক্তি ছাপিয়ে জাতির বিশেষ শক্তির প্রাধান্য, বিশেষ ছাঁদের মানুষের জন্তে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা সব মানুষের জন্তে নয়—এই-সব বিশ্বমানববিবোধী সংকীর্ণ উপজাতীয় ধারণা গেয়র্গে-এর কবিতাগুলিতে আত্মপ্রকাশ কবল। জাতির দেহ ও মন নিয়ে অমিতশক্তিশালী আধ্যাত্মিক শক্তি গেয়র্গের ভাষায় ‘এরস্’ একটি অমূল্য জাতীয় সত্তা তৈরি করবে। আর অন্তর্ভূতির বাঁধনে-বাঁধা এই গোষ্ঠীকে ঈশ্বরের মতো সর্বগুণের আধার এক শাসক পরিচালিত করবে।

প্রাচীন রোমের সেই শয়তান-প্রতিম সম্রাট হেলিওগাবেলেস্-এর উপর গেয়র্গে কবিতা লিখলেন। সব নৈতিক আদর্শকে ও খৃস্টীয় ধর্মের জীবনমূল্যবোধকে ছাপিয়ে যে এক রহস্যময় বিশ্বশক্তি আছে, সেই শক্তির

ও মানুষের আদিম প্রবৃত্তির সন্ধান পেলেন গেরগে এই শয়তানের মধ্যে। এই সম্রাটের সব বর্বরতা ও কুপ্রবৃত্তির আতিশয্যের মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের সীমানা অতিক্রম করবার শক্তির পরিচয় পেলেন গেরগে। গেরগে বললেন যে, এই ঈশ্বর-সমতুল্য শাসক এই ‘আধ্যাত্মিক নেতা’ স্বজনশীল প্রতিভার আধার, এই কারণেই কোনো মানবীয় বিচারনীতি ও মূল্যবোধকে সে স্বীকার করে না। তবে নিজের অন্তরে যে শক্তি বিরাজমান, শুধু তাকেই সে মানে। এই নেতা নিজের ব্যবহারের জন্য নিজেই নিয়ম তৈরি করে ও বিশ্বমানবের উপর এবং নানা বিষয়ের উপর তার অসাধারণত্বের ছাপ দিয়ে দেয়। এই হচ্ছে গেরগের কল্পনার ও ধারণার ‘আধ্যাত্মিকের রাজ্য’। বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না, কিছুদিনের মধ্যেই এই আধ্যাত্মিক নেতা ‘আধ্যাত্মিক রাজ’ হিটলার ও নাৎসি-শাসিত রাজ্যের রূপ নিয়ে দেখা দিল। রোমীয় সম্রাট হেলিওগবেলেস্-এর সঙ্গে সম্রাট নডিক হিটলারের আশ্চর্য সাদৃশ্য—দুজনেই আদিম প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি ও শয়তানী প্রবৃত্তির উল্লঙ্গ অবতার।

গেরগের এই ‘আধ্যাত্মিক রাজ্য’ হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে একটি বন্ধ উপজাতীয় এলাকা যার মধ্যে তাদের উপযোগী অতি সংকীর্ণ ও অল্পদার একটি সত্যতা গড়ে উঠেছে।

এই আধ্যাত্মিক নেতা হচ্ছে সেই বীর পুরুষ যে এই বিশেষ গোষ্ঠী সৃষ্টি করবে। জীবনের সত্য ও গভীর সব মূল্যবোধ সবই এই নেতা দান করবে তার গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের। বিচারশক্তি নয়, শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, সেই ঐশ্বরিক প্রসাদ, যা ভগবান এই নেতাকে দিয়েছেন মানুষদের আকর্ষণ কুরবার জন্যে। ‘আধ্যাত্মিক নেতা’ ‘ঈশ্বরের প্রসাদধন্য বীর’ ‘পাখিব বিচার ব্যবস্থার দ্বারা নাগাল পাওয়া যায় না এমন একজন শাসক’—এই-সব উপজাতীয় ধারণা গেরগে জুটিয়ে দিলেন নাৎসিদের।

অচিরেই তারা, এইরকম একজন ‘আধ্যাত্মিক নেতা’র সন্ধান পেল। সে হচ্ছে ঈশ্বরের প্রসাদধন্য বীর নেতা হিটলার।

গেরগের শিষ্য হেরমান ড্রান তাঁর গুরুকে পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেলেন জার্মানীয়তার আরাধনায়। রক্তের স্তবগান শুরু করলেন প্রাকৃতিক নিয়মের দাস আদিম মানুষের মতন। ড্রান বললেন যে

প্রথমে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এমন-সব নিয়ম তৈরি করবে ও কার্যকরী করবে যার ফলে নতুন নতুন প্রবৃত্তির জন্ম হবে। তারপর অভিনব শক্তির উদ্ভব হবে রক্ত থেকে। এই গোষ্ঠী সমস্ত মানব-সমাজকে তার হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে।

এই-সব প্রলাপ শুনে মনে হয় না কি যে একটি লোক তার মনের মধ্যে আদিম চিন্তাধারার ও আবেগের যে দুর্দমনীয় ঢেউ তুলেছে তারই ধাক্কায় সে চোখ বন্ধ করে পিছমুখো হাঁটছে? আর আমরা চোখ খুলে তার সঙ্গে পিছমুখো হাঁটছি?

গেয়র্গে-র আর-একটি ভক্ত হান্স ব্রুহার নাৎসিদের যুব-আন্দোলনের নীতি জোগানদার তত্ত্ববিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বেরলোয়া লোক ব্রুহার নাৎসি যুবকদের শেখালেন যে মানব জাতির মধ্যে কোথাও কোনো ঐক্যের বন্ধন নেই। এই পৃথিবীতে দু-ধরনের জাতি আছে—প্রাথমিক জাতি (Primary race) আর নিম্নস্তরের জাতি (Secondary race)। প্রথমটি হচ্ছে, অভিজাত মানুষের দল আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আটপোরে মানুষের দল।

এই দুনিয়ার উন্নতির জন্যে প্রাথমিক জাতির লোকেরাই হচ্ছে দরকারি লোকের দল, শুধু এরাই সৃজনশীল ও মহৎ। এরা নিজেদের অন্তরের দ্বন্দ্ব মেনে চলে। আর আটপোরে সাধারণ লোকেরা? তারা হচ্ছে নিরর্থক সমাজ-বহিষ্ঠৃত লোকের দল, তারা পথ-ভ্রষ্ট, তারা শুধু গোলমাল পাকাতে ওস্তাদ। মানব-সমাজের সব সমস্যার সমাধান করবে এই প্রাথমিক জাতি। নিম্নস্তরের জাতির সাধা নেই মানব-ইতিহাসের অগ্রগতি সাধনে কোনো অংশ গ্রহণ করবার। এই নিম্নস্তরের মানুষদের নিরুৎসাহিতার শেষ নেই। তারা ধরে নিয়েছে যে সব মানুষই অধিকারী হতে পারবে ও একটি মহৎ আদর্শকে কার্যকরী করে তুলবে। এদের এই মূর্খামির ভিত্তির উপরেই মানব-সমাজের উন্নতি, ক্রমাভিব্যক্তি, গায় বিচার ব্যবস্থা, মানবতাবোধ—এই-সব সাংঘাতিক ভাঙ্গি প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র জার্মান জাতিই হচ্ছে স্বভাবগত ভাবে প্রাথমিক জাতি, তারাই আদিম প্রাথমিক জাতি। নর্ডিক জাতিই হচ্ছে একমাত্র অভিজাত শাসক জাতি। ব্রুহারও অচেতন প্রকৃতির দাস। আদিম প্রবৃত্তির কশাঘাতে চোখবঁধা

পশুর মতো পিছনের দিকে চলেছে, পিছনটাকে সামনে ভেবে। মুশকিল হচ্ছে এই যে নাৎসিদের মতবাদকে বুঝতে হলে এই-সব চোখবাঁধা জীবদের সঙ্গে নিতে হবে, সমুখের দিকে না চলে, ইতিহাসের পথে পিছু হাঁটতে হবে।—গোঁড়া ফ্যাসিস্ট আর নাৎসিজমের একান্ত সমর্থক ফ্রান্জ হাইজার হচ্ছেন অস্ট্রিয়ার লোক। রেখে ঢেকে কথা বলা এঁর স্বভাব নয়। সোজাই বলে দিলেন যে জনসাধারণের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। লোক-ঠকানোর জন্তে নাৎসিজম-এর মধ্যে সোশালিজমের যে-সব ধাপ্পা ঢুকিয়ে দেওয়া ছিল হাইজার সেগুলিও বরদাস্ত করতে পারেন নি। হাইজার-এর মতে টিউটনিক জাতিগুলির একত্রীভূত শক্তির একমাত্র কাজ হবে গণতন্ত্রকে ও যত প্রকারের সোশালিস্ট ধারণা আছে সেগুলিকে নিঃশেষে ধ্বংস করা। একমাত্র জার্মান শাসকদের হাতেই থাকবে বিশ্ব-শাসনের দায়িত্ব। আর যুদ্ধ হচ্ছে অত্যন্ত দরকারী এক ব্যবস্থা—কারা প্রভু কারা দাস সেটি নির্ণয় করবার জন্ত।

এবারে অবিচার মায়ায় ঘুমন্ত লোকদের দমবন্ধ করা সঙ্গে ছেড়ে একজন বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে করি। এই লোকটি হচ্ছেন বিখ্যাত ইতিহাস-বিদ্ব অধ্যাপক অস্‌ওয়াল্ড স্পেংগলার। ইনিও জার্মানীয়তার নেশায় বিভোর। স্পেংগলার-এর মতে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত মাত্র তিনটি জাতির উদ্ভব হয়েছে যারা বিশ্বের অধীশ্বর হওয়ার উপযুক্ত—স্প্যানীয়, ইংরেজ আর জার্মান জাতি। এদের মধ্যে জার্মানরাই শ্রেষ্ঠ। প্রশীয়ারা তাদের মিস্টিক সামরিকতাবাদের দ্বারা পশ্চিমের সভ্যতাকে ধ্বংস করতে পারবে। পেশাদার সৈন্যদের দিয়ে প্রশীয় ছাঁদে বিশ্বের সাম্রাজ্য গঠন করতে হবে। ‘পশ্চিম জগতের অবনতি’, ‘প্রশীয় সোশালিজম’ আর ‘মানুষ শিকারী জন্ত’—এই তিনটি বিখ্যাত বই স্পেংগলার-এর লেখা।

স্পেংগলার-এর মতে সত্যিকারের চালক শক্তি হচ্ছে—সবলের ইচ্ছা-শক্তি, আদিম প্রবৃত্তি আর দখল করবার অদম্য অভিলাষ—গ্রায়া, স্মৃথ ও শাস্তি, এ-সব হচ্ছে অসহায়ের স্বপ্নবিলাস। সাম্রাজ্যবাদকেই স্পেংগলার সত্যকার আন্তর্জাতিকতা বললেন। তিনি জানিয়ে দিলেন যে তিনি বিশ্বাসই করেন না যে বিচার বুদ্ধি ও যুক্তিবাদ জীবনকে চালায়।

জীবনই বিচার-বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে। জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই।
রক্তের মধ্য দিয়েই আমাদের চিন্তাগুলি যুক্তিহীনভাবে কাজ করে।

এইভাবে বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তিবাদকে স্পেংগলার উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু
শুধু এতেই শেষ হল না, জার্মানীয়তার আবেগে তিনিও উন্নতির মতো
বললেন যে জার্মান জাতি তার যুক্তিবর্জিত প্রবৃত্তির প্রবল শক্তির
সাহায্যে দুনিয়া দখল করে বিশ্ব-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসবে, কেননা
একমাত্র জার্মান জাতিই পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়ার যোগ্য।

নাৎসি মতবাদ নানা দিক থেকে পুষ্ট হতে লাগল। জাঁদরেল নাৎসি
উইল্‌হেল্ম স্টাপেল্ সকলকে গুনিয়ে দিলেন যে অন্য জাতিরা যে-সব
অধিকার দাবি করে জার্মান জাতির জন্তে সে-সব অধিকার নাৎসিরা আদবেই
দাবি করে না, কেননা অন্য জাতিগুলিকে তারা জার্মান জাতির অধিকারের
তুল্য অধিকার দিতে একেবারে রাজী নয়। জার্মানদের একটা অধিকার
আছে যার সঙ্গে অন্য কারো অধিকারের তুলনাই হতে পারে না। স্টাপেল্
টিউটনিক সাম্রাজ্যের দাবি জানালেন।

জাতির গণ্ডীর বাইরে আর কিছুই নেই যা গ্রহণযোগ্য, বিশ্বমানবের
ঐক্যের ধারণা ভুল, জার্মান জাতি যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এই পৃথিবীতে
সেটা স্বীকার্য, বিশুদ্ধ রক্ত একমাত্র জার্মান জাতির শিরায় শিরায় প্রবাহমান,
মানবজাতির অগ্রগতির জন্তে যুদ্ধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি ব্যবস্থা,
অভিজাত সুস্প্রদায়ের সেবা করাই হচ্ছে জনসাধারণের একমাত্র কাজ,
একমাত্র জার্মান জাতিই সাম্রাজ্য স্থাপন করবার অধিকারী—নাৎসিজমের
এই ধারণাগুলি নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করছিলুম, এখন নাৎসিজমের
অর্থনীতিক ধারণাগুলি নিয়ে আলোচনা করব। নাৎসি নেতা গুট্‌তস্-এর
মতে কারখানা হচ্ছে একটি স্বয়ংক্রিয় জীবকোষ। কারখানার মালিক হচ্ছে
নেতা, আর শ্রমিকরা হচ্ছে এই নেতার অধীন কর্মীদল।

নাৎসিদের সোশালিজমের স্বরূপ এখানে একেবারে ধরা পড়ে গেছে।
পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কারখানার মালিকের গোলাম হয়ে থাকাটাই
হচ্ছে শ্রমিকদের কর্তব্য—এই হচ্ছে নাৎসিজমের বক্তব্য আর নাৎসিদের
মতে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে শ্রমিকদের এই গোলামির সঙ্গে-সোশালিজমের
কোনোই বিরোধ নেই।

মূলার ক্রক একজন নামজাদা নাৎসি। তাঁর মতে যুক্তির ভিত্তি বর্জন করে সোশালিজমকে আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জাতির লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যে বিপদের কারণ দেখা দিয়েছে, এই নতুন ধাঁচের সোশালিজম সেই দিকে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মূলার ক্রকের মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই কঠিন সমস্যার যথাযথ বিচার করেনি মার্কসীয় সোশালিজম, যদি করত তাহলে শ্রেণীসংঘাতের মতবাদকে এত প্রাধান্য না দিয়ে জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধ লাগাবার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তার উপরেই বেশী ঝোঁক দিত। মূলার ক্রক বলেই দিলেন যে জার্মানির জাতীয় সমস্যার সমাধান যতদিন না হচ্ছে ততদিন কোনো সামাজিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই প্রথমে যুদ্ধ বাধিয়ে জার্মানির জাতীয় সমস্যার সমাধান করতে হবে, পরে অন্য সব সমস্যার সমাধানের কথা ভাবা যাবে।

শ্রেণী-সংঘাতকে ধামাচাপা দিয়ে রেখে যুদ্ধের দিকে জার্মানদের ঠেলে নিয়ে যাওয়ার নীতিকেই নাৎসিরা তাদের নব সোশালিজমের প্রধান কর্তব্য বলে জাহির করল।

হিটলারের সবচেয়ে পুরোনো সহকর্মী ফেডার জমিদারদের বিরাট ভূসম্পত্তিগুলি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার সোশালিস্ট নীতির তীব্র বিরুদ্ধতা করে বললেন যে নাৎসিজম ভূসম্পত্তি বেঁটে দেওয়ার নীতির ঘোর বিরোধী। জমিদারদের জমিদারিগুলি অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে আর মজুরেরা কারখানার মালিকদের প্রভুত্ব মেনে নেবে, মালিকদের তা'বেদারী করবে—এই হচ্ছে হিটলারের গ্রাশানাল, সোশালিজমের অংশীভূত সোশালিজমের অর্থ।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে নাৎসিদের এই নব সোশালিজমের উদ্দেশ্য হল ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রামকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা, জাতীয় স্বার্থ পূরণ করবার জন্তে যুদ্ধ করবার মনোভাব সৃষ্টি করবার জন্তে সর্বশক্তি নিয়োগ করা আর জার্মানির জাতীয় অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধ ভিত্তিক অর্থনীতিতে পরিবর্তিত করা।

জার্মানির সুসংগঠিত শ্রমিক-আন্দোলনকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্তে জার্মান জমিদারেরা ও কলওয়ালারা অর্থ ও লোকবল দিয়ে

হিটলাবকে সাহায্য করল। ভেরনরবেস্ট একটি বেশ চট্‌কদার মত প্রকাশ করলেন তাঁর লেখা ‘যুদ্ধ ও আইন’ প্রবন্ধে। তিনি খুব জোব দিয়ে বললেন যে শ্রেণীসংঘাতকে স্বীকার কবতেই হবে—কিন্তু সে শ্রেণীসংঘাত যে নতুন শক্তি উঠছে, শুধু যে সেই শক্তিই চালাবে তা নয়, উপর থেকে প্রভুরাও চালাবে তলার বিদ্রোহী জনসাধারণের বিরুদ্ধে।

বেস্ট-এব এই উক্তির মধ্যে এমন কিছুই নেই যা নেহাৎ মূর্থ ছাড়া আর কাবো কাছে নতুন বলে ঠেকবে। প্রভুরা যে এক তবফা শ্রেণী-সংগ্রাম বহু যুগ থেকে চালিয়ে আসছে সে তো সবাই জানে। শুধু নতুনত্ব হচ্ছে এই উক্তির দাপিত নির্লজ্জতা। হিটলারের লেখা ‘আমাব লডাই’ (মাইন্ কাম্‌ফ্‌) বইটিতে গ্রাশানাল সোশালিস্ট শ্রমিকদের সম্বোধন কবে বলা হয়েছে যে গ্রাশাগ্রাল সোশালিস্ট মজুবদের জানতে হবে যে জাতির উন্নতি তাদের অর্থনৈতিক উন্নতিকে শুধু যে রক্ষা করবে তা নয়, এগিয়েও দেবে। হিটলাব তার এই বইতে দলের লোকদের হুঁশিয়ার কবে দিয়েছিল যে তারা যেন কখনো কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য না হয়, আব যদি আগেব থেকেই তারা ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য থেকে থাকে তাহলে তারা যেন ট্রেড ইউনিয়নটিকে ভিতর থেকে ভেঙে দেবার চেষ্টা করে।

নাৎসিদের ঈশ্বরপ্রসাদ-ধন্য নেতা স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছিলেন দলের লোকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভেঙে দেবাব জন্তে সচেষ্ট হতে। জার্মানির বিরাট বিরাট সব কারখানার মালিকরা যে হিটলারকে তাদের ধনভাণ্ডার উজাড় কবে অর্থসাহায্য করেছিল তাতে আশ্চর্য হবাব কি কোনো কারণ আছে? জার্মানির মূলধনী মালিকরা পরিকাব বুঝেছিল যে উদারনীতিক রাজনীতির চতুর খেলা খেলে জার্মানির বিপ্লবপন্থী শ্রমিক আন্দোলনকে আর বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

ক্যাপিটালিজমকে বাঁচাবার জন্ত যে উদারনীতিক কৌশল বুর্জোয়ারা অবলম্বন করেছিল রাজনীতিতে, তার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। এবার সব শক্তি দিয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলি ভেঙে দিতে হবে, নইলে তাদের অনিবার্য মরণ।

নাৎসিরা ঠিক করে নিল যে জাতীয়তাবাদের মদ খাইয়ে শ্রমিকদের

যুদ্ধবাজ করে তুলতে হবে। মধ্যবিত্তদের বেকার অবস্থার জন্য ইহুদীরা দায়ী—এই জঘন্য মিথ্যে প্রচারের দ্বারা জার্মান মধ্যবিত্তদের তাদের দলে টেনে আনতে হবে। জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠতা, ইহুদীবিরোধ আর যুদ্ধের দ্বারা ছুনিয়া দখল এই সব যুক্তিবিরুদ্ধ ও মানবতা-বিরোধী মতবাদ ছড়িয়ে জার্মানির জনসাধারণের মনে একটি পাশবিক মানসিকতা জাগিয়ে তোলার জন্যে নাৎসিরা প্রাণপণে চেষ্টা করছিল। জার্মান বুর্জোয়ারা বুঝেছিল যে একমাত্র এই উপায়েই জনসাধারণের মনে যে-সব বিপ্লবপন্থী ধারণা আছে সেগুলিকে নষ্ট করে দেওয়া সম্ভব হবে। তারা এটিও বুঝেছিল যে হুগেন-বার্গের গ্যাশানালিস্ট পার্টির সাধ্য ছিল না যে নিছক গ্যাশানালিজমের ঢাক পিটিয়ে শ্রমিকদের ও বেকার মধ্যবিত্তদের দলে টানে। সোশালিজম আমরা মানি ও চাই। এই ধারণা ঠিকমতো না দিতে পারলে শ্রমিকদের ও মধ্যবিত্তদের দলে-টানা কখনো সম্ভব হবে না। আবার শুধু রাজনৈতিক উদারতার খেলা ও সোশালিজমের বুলি আওড়ে জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখা আর চলবে না। জার্মানির সোশাল ডেমোক্র্যাটিক দল অনেক বছর ধরে শ্রমিকদের ও মধ্যবিত্তদের বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে এসেছে বটে, কিন্তু সোশাল ডেমোক্র্যাটরা আর পেরে উঠছে না। জনসাধারণ কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে চলেছে। বিপ্লবপন্থী কমিউনিস্ট আন্দোলন ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তাই এমন রাজনৈতিক মতবাদের রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন যাদের দিয়ে বিপ্লবকে ঠেকানো যাবে। ইতালিতে মুসোলিনী আর জার্মানিতে হিটলার তাদের নিজ নিজ দেশের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিপ্লবের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্যে বুর্জোয়াদের লেঠেলের কাজই করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাও কি সফল হল ?

নাৎসি অর্থনৈতিক মতবাদের অন্যতম অংশ হল অর্থনৈতিক স্বয়ংস্বত্বের নীতি, জার্মান ভাষায় যার নাম—অটার্কি। অটার্কি হচ্ছে সামরিক অর্থনীতি, অর্থনীতিকে জাতীয় শক্তির পরিচায়ক হিসাবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা। নাৎসি নেতা ভরসিং সেটা খোলসা করে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন যে অটার্কি হচ্ছে যুদ্ধকামী রাষ্ট্রের অর্থনীতিক ব্যবস্থা। জার্মানি তার অর্থনীতিক সংগঠনকে বিশ্ব-অর্থনীতিক সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন

করে গুটিয়ে নেবে তার নিজের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে । তারপর মধ্য ও পূর্ব যুরোপের কৃষিপ্রধান দেশগুলির সঙ্গে জোট বেঁধে একটি স্বতন্ত্র অর্থনীতিক এলাকা তৈরি করবে যার চালক হবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল্ জার্মানি । বোঝা যাচ্ছে যে খোলা বাজার ও বিশ্ব অর্থনীতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পেছনে নাৎসিদের যে মতলব লুকিয়ে ছিল সেটি হচ্ছে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের মতলব ।

নাৎসি ফ্রিড্ জানিয়ে দিলেন যে যুরোপের নানা দেশে অগ্নিধারী মানুষেরা অন্য সব জাতিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে আপন আপন গোষ্ঠীর মধ্যে তাদের জাতিগুলিকে সংহত করবার চেষ্টা করছে । এই চেষ্টা মানব-সমাজকে উপজাতীয় আদিম সংগঠনের কাঠামোর মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর অন্য কিছু নয় । ফ্রিডের মতে এই অর্থনীতিক জাতীয়তাবাদ বিচারশক্তিহীন জনসাধারণের মানসিক অবস্থার সঙ্গে খুবই খাপ খায় ।

১৯৩০ সালে অন্যতম নাৎসি নেতা অটোস্ট্রাসার-এর সঙ্গে হিটলারের মতবিরোধ হয় । সেই মতবিরোধ সত্ত্বেও হিটলার স্ট্রাসারকে আক্রমণ করে বলেছিলেন যে তার সোশালিজম হচ্ছে নির্ভেজাল মার্কসীয় সোশালিজম । শ্রমিকরা জাতির অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনায় হাত দেবে—এটি হাস্যকর নিবুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয় । কারখানার পরিচালকরাই তো উৎপাদনের সব দায়িত্ব বহন করে, আর শ্রমিকদের রুটিও যোগায় । তাই সম্পত্তির কোনো অংশেই শ্রমিকদের দাবি থাকতে পারে না । শ্রমিকরা কারখানার যৌথ মালিক হবে—এইটাই হচ্ছে মার্কসীয় মতবাদ । এই অধিকার হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের মানুষদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রের, আর কারো এই অধিকার নেই ।

উচ্চ পর্যায়ের যে মানুষগুলি রাষ্ট্রচালনায় তারা যে কে সেটা বুঝতে অতি বড়ো বুদ্ধিহীনেরও দেরি হওয়া উচিত নয় । আর হিটলার তো বলেই দিয়েছিল যে কারখানার পরিচালকরা শ্রমিকদের যখন অন্ন যোগায় তখন শ্রমিকরা এর চেয়ে বেশি আর কী আশা করতে পারে কিম্বা দাবি করতে পারে ?

একদিকে দেখছি উৎপাদন-যন্ত্রের প্রণালীর অদ্ভুত উন্নতি ঘটছে, নতুন

ধরনের কারখানাও গড়ে উঠছে, আর অগ্নি দিকে জাতীয়তাবাদ, সামরিক-তন্ত্র, যুক্তিহীনতা, গোষ্ঠীনির্ভর মনোভাব বেড়ে চলেছে।

নাৎসি পণ্ডিত হাইজার মানব-জাতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে চান—যারা স্বাধীন, আর যারা পরাধীন। তাঁর মতে জীবতত্ত্বের (Biology) উপর নৈতিক ধারণাগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দাসদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে হবে বটে, কিন্তু তারা যে দাস এ কথা সর্বদা মনে রেখে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। সব মানুষের সমান অধিকার আছে—এই-সব আজগুবি ধারণা একেবারে বাতিল করে দিতে হবে জীবতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নৈতিক বোধের সাহায্যে। প্রবর্তন করতে হবে বাধ্যতামূলক বিবাহব্যবস্থা, বহুবিবাহ, বিকলাঙ্গ শিশুদের ও ইহুদীদের হত্যাব্যবস্থা পরিকল্পনা-অনুযায়ী একটি মহৎ জাতির সৃজন-ব্যবস্থা। নাৎসি বর্বরতার শিখরে পৌঁছে হাইজার বলেছেন যে সর্বসাধারণের জন্তে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন অতি-বড়ো মূর্খামি, কেননা শিক্ষার ফলে দাসরা উন্নত হয়ে উঠবে আর তার ফলে দাসীদের গর্ভে সম্মান-উৎপাদন করার সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে 'স্বাধীন' প্রভুর দল!

এইখানেই শেষ করি নাৎসি মতবাদের আলোচনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যখন অবসান ঘটল তখন যুরোপীয় বুর্জোয়াদের নাভিশ্বাস উঠেছে। রুশীয় বিপ্লবের প্রেরণায় যুরোপীয় শ্রমিক-আন্দোলন রাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক কাঠামো চুরমার করে দিয়ে সোশালিস্ট কাঠামো প্রবর্তন করবার জন্তে প্রবল আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিল। সেই সময়ে গণতন্ত্রকে বাঁচাবার অছিল। করে সোশাল-ডেমোক্র্যাটেরা যদি যুরোপীয় বুর্জোয়াকে সাহায্য করতে এগিয়ে না আসত তাহলে জার্মানিতে ও ইতালীতে সোশালিস্ট রাষ্ট্র নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হত। নব্বৈ প্রভৃতি জার্মান সোশালিস্টরা তখন জার্মান বুর্জোয়াকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। শ্রমিক-অভ্যুত্থান পরাজিত হল, রোজা লুক্সেমবুর্গ কার্ল লিৎথেক্ট্, ও হাজার হাজার জার্মান শ্রমিক বুর্জোয়াদের ঘাতকদের হাতে প্রাণ হারালেন। এই সময়েই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের গর্ভে ফ্যাসিস্ট ক্রণের জন্ম।

মস্কো থেকে বার্লিনে এসে আমি নাৎসিজ্‌মকে ভালো করে বুঝে নেওয়ার জন্ত নাৎসি সাহিত্য জোগাড় করে পড়তে শুরু করেছিলুম।

যে-কোন একটি বিষয়-সম্বন্ধে কিছু না পড়ে, না জেনে বক্তৃতা দিতে আজও আমার সাহসে কুলোয় না। অথচ বিষয়টি না জেনে বক্তৃতা দেওয়াই তো সমকালীন রেওয়াজ। আমি কোনো রেওয়াজের সঙ্গেই ম্লর মিলাতে পারলুম না জীবনভোর। নাৎসি মতবাদটিকে ভালো করে বুঝে নেওয়াটা আমার খুব কাজে লেগেছিল। বার্লিনে বহু সভায় বক্তৃতা দিয়েছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অবিশ্টি ভারতবর্ষের সম্বন্ধেই বক্তৃতা দিতুম, কিন্তু সোশালিজম সম্বন্ধেও বক্তৃতা নেহাৎ কম দিই নি। সোশালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গেলেই নাৎসিজমের কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ত আর তখন নানা দিক থেকে নাৎসিজমের আলোচনা করে জার্মান শ্রোতাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছি অনেকবার।

একবার বার্লিন যুনিভার্সিটির নাৎসি ছাত্ররা আমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের কিছু শোনানোর জন্তে। সেই সম্বন্ধে-বেলার বক্তৃতার আসরটি বেশ জমে উঠেছিল। বক্তৃতা শেষ হলে অনেক প্রশ্ন তারা করল আমাকে, সেগুলির উত্তর দিতে দিতে রাত ঘনিয়ে এল। আমার দু-একটি উত্তর থেকে তারা বুঝতে পেরেছিল আমার রাজনীতির রঙটা কী। তারা সোজাই জিজ্ঞেস করল, ভারতবর্ষে গিয়ে আমি কোন্ ধরনের রাজনীতি শুরু করব। সোজা কথা বলতে আমার বাধে নি কখনো, তাই সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর দিলুম যে ভারতবর্ষে ফিরে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করব। এবারে যে আলোচনা শুরু হল তাতে সোভিয়েট রাশিয়া, কমিউনিজম, নাৎসিজম কিছুই বাদ রইল না। মানব-সমাজের সমকালীন সমস্যাগুলির সমাধানের যে আর-কোনো উপায় নেই কমিউনিজমের মতবাদ ছাড়া—এ কথা তাদের বলেছিলুম সেই রাতে। অবিশ্টি সোভিয়েট রাশিয়ায় যা চলেছে সেটা যে স্টালিনবাদ, কমিউনিজম নয়—সে কথাও বলতে কস্মর করি নি। নাৎসিজম নিয়েও আলোচনা কম হয় নি। কোনো সভ্য জাতিই অবিমিশ্র রক্তের অধিকারী বলে দাবি করতে পারে না—এটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হাশ্বকর নিবুদ্ধিতা। একমাত্র জঙ্গলের বাসিন্দা আদিম উপজাতিগুলিই এই নির্ভেজাল রক্তের অধিকারীদের দাবি করতে পারে। আর আর্য রক্তের দাবি তারা করে কোন্ সাহসে যেখানে আমি উপস্থিত।

এই খাঁটি আর্থ রক্তে যে কত জাতির কত রক্তধারা এসে মিশেছে তা-ও জানালুম তাদের। আর তাদের রক্ত? বেশি বিশ্লেষণ না করাই ভালো। ভ্যাঙাল, গথ প্রভৃতি কত উপজাতির রক্ত যে তাদের শিরায় মিশ্রিত-ভাবে বইছে তার কি শেষ আছে? নাৎসিদের খাঁটি রক্ত ও নর্ডিক জাতি-মাহাত্ম্য—এই দুই মতবাদের গুরু রোজেনবার্গ-এর কথাও তুললুম। সবাই তো তার ধার-করা কথা, ইংরেজ চেম্বারলেন্ আর ফরাসী গোবিনাওর পাগলামির পুনরাবৃত্তি। মানব-ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকি-বহাল থাকলেও এই ধরনের মতবাদ প্রচার করতে রোজেনবার্গ লজ্জা পেতেন। গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা চলল। অনেক প্রশ্ন উঠিয়েছিলুম, অনেক কথা বলেছিলুম, শুধু একজনের কথা তুলতে আমার সাহসে কুলোয় নি—সেটি হচ্ছে হিটলারের কথা। নাৎসিদের কাছে হিটলার ছিল সকল প্রশ্নের অতীত এক অলৌকিক পুরুষ। তার সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই চলতে পারে না। জার্মান-সভায় যে উপজাতীয় মনোভাব স্থপ্ত অবস্থায় ছিল এতদিন, তার আদিম প্রবৃত্তিকে এমনভাবে জাগিয়ে তুলেছিল হিটলার যে হিটলার-সম্বন্ধে কোনো কথাই শোনানো সম্ভব ছিল না সে-সময়ে।

আমার সঙ্গে নাৎসি ছাত্রেরা কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। গভীর রাতে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তারা চলে গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানির সব চেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ছিল সোশাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। প্রশীয়ার গভর্নমেন্ট এদের হাতে তো ছিলই, তা ছাড়া অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন এদের দখলে ছিল। এই দল যদি ডেমোক্রাসির খেলা অত নাটকীয়ভাবে খেলে নাৎসিদের বেড়ে উঠবার সব সুযোগ না দিত, ডেমোক্রাসির মাত্রাটা কিঞ্চিৎ কমিয়ে গণতন্ত্র-বিরোধী নাৎসি দলকে গোড়া থেকেই সায়েন্স্টা করত, তা হলে জার্মানির এই সর্বনাশ কখনো হতে পারত না। কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে কিন্তু সোশাল ডেমোক্র্যাটদের আচরণ আদবেই গণতন্ত্রসম্মত ছিল না। মনে আছে, পয়লা মে-র মিছিল ও জনসভা বন্ধ করে দিল ১৯৩০ সালে বার্লিনের সোশাল ডেমোক্র্যাট পুলিশ কমিশনার। একদিকে তারা কমিউনিস্ট দলন চালান, অন্যদিকে নাৎসিদের প্রতি সোশাল ডেমোক্র্যাটদের অটল গণতান্ত্রিক উদারতা, রাজ-নৈতিক দেউলেপনার ও শঠতার চূড়ান্ত পরিচয় দিল।

উনিশ শো উনত্রিশ সাল শুরু হয়ে গেল। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে—
টি. বি.-তে ভুগছি। রাশিয়ার প্রচণ্ড শীতকে তার যোগ্য মর্যাদা না দেওয়ার
জন্তে দণ্ড পেতে হচ্ছে। শীতের রাতে জনমানবহীন পুষ্কিন বুল্ভার ধরে
মস্কো নদীর ধার পর্যন্ত প্রায়ই ঘুরে ঘুরে আসতুম। বরফে-ঢাকা বুল্ভার
গাছগুলোকেও বরফ সাদা তবক দিয়ে জুড়ে দিয়েছে। রূপকথার
স্বপ্নরাজ্যের দৈত্যদের মতো তারা নিথর। এমন ঘন-নীল আকাশও কখনো
দেখি নি। আর তারাগুলো যেন রূপোলি ফুল। এত বড়ো, এত জলজলে
তারা মস্কোর আকাশে শীতের রাতে! ছোট্ট কাঠের ঘরের মধ্যে লম্বা কোট
আর কান-ঢাকা টুপি পরা পুলিশগুলো আমাকে দেখে কী যে ভাবত কে
জানে! দস্তানা পরি নি কখনো। কেমন করে জানি না ঠাণ্ডা লেগে
গিয়েছিল। রোজই জর হতে লাগল।

বার্লিনে এসে ডাক্তার দেখালুম—প্রফেসর এয়ারমান, বিখ্যাত হার্ট ও
লাংস্ স্পেশালিস্ট। রবীন্দ্রনাথকে তিনি চিকিৎসা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে
আর তাঁর সহকারী ডাক্তার ডিন্কিনের সঙ্গে নলিনী গুপ্তের খুব জানা-
শোনা ছিল। নলিনী আমাকে নিয়ে গেল তাঁর কাছে। খুব ভালো করে
পরীক্ষা করে ডাক্তার এয়ারমান একটু চুপ করে রইলেন। আমার ঠিক
অবস্থাটা কী সেটা জানতে চাইলুম। বললেন, সাবধানে থাকতে হবে,
সেরে যাবে। বুঝলুম সোজা উত্তর দিতে তিনি নারাজ, এড়িয়ে যাচ্ছেন।
প্রথম আলাপ, পেড়াপেড়ি করতে সংকোচ হল।

বার্লিনে এসে বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করলুম।
ফ্রিড্‌রিখ স্ট্রাসে ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লীগের আপিস। মাঝে মাঝে
সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আসতুম। চট্টোপাধ্যায় আমাকে
জার্মান কমিউনিস্ট নেতা উইলি মুনসেন্‌বর্গ-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে
দেন। মুনসেন্‌বর্গের ছিল অসাধারণ সংগঠন শক্তি। কত সংগঠন যে তিনি
গড়ে তুলেছিলেন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে ঘিরে তার শেষ নেই।
বক্তাও ছিলেন ভালো। কয়েকটি জনসভায় মুনসেন্‌বর্গ আমাকে দিয়ে
বক্তৃতা দেওয়ালেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। বক্তৃতা দিচ্ছি, দেশে যে-সব সহকর্মী
ছিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি আর সোভিয়েট রাশিয়ার উপর লেখা

আমার বই দুটির পাণ্ডুলিপি মাঝে মাঝে মেজে ঘষে ঝকঝকে করে তোলবার কাজ করে চলেছি।

একটি ছেলে দেশে ফিরে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে একটি স্টকেশ পাঠিয়ে দিলুম আবদুল হালিমকে। সেই স্টকেশের ডালার ভিতর দিকের কাপড় খুলে ফেলে তার মধ্যে আমার লেখা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের রিপোর্ট রেখে আবার কাপড়টি এঁটে দিলুম। ছেলেটির দেশে ফেরবার অর্থের সাহায্য আমি করেছিলুম, আরো কিছু টাকা আমি তার হাতে দিয়েছিলুম। সে টাকাটা হালিমের হাতে পৌঁছয় নি, শুধু স্টকেশটাই পৌঁছেছিল।

ভারতবর্ষে ফিরে যাব বলে তোড়জোড় করছি এমন সময় কলকাতা থেকে পাঠানো ইংরিজী সংবাদপত্র এসে হাজির হল। মুজফ্ফর আহমদ, শিবনাথ ব্যানার্জি, কিশোরী ঘোষ প্রভৃতিকে গভর্নমেন্ট গ্রেপ্তার করে একটি কন্স্পিরেসি কেস শুরু করবার আয়োজন করছে, তার খবর জানলুম এই কাগজ পড়ে। কলকাতা থেকে চিঠি এলো দেশে ফিরতে মানা করে। মীরট কন্স্পিরেসি কেস শুরু হলে গেল।

কিশোরী ঘোষ ছিলেন আমার বন্ধু। অমৃতবাজার পত্রিকায় তিনি লিখতেন আর শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। দেশ ছাড়বার আগে প্রায়ই তিনি আমার কাছে আসতেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। শাস্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন কিশোরী ঘোষ, মনটি ছিল তাঁর নরম পর্দায় বাঁধা। মস্কো থেকে আমি তাঁকে চিঠি লিখতুম, আমার সঙ্গে তাঁর পত্র বিনিময় হত—এই অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিলো।

কলকাতা থেকে বাংলা ও ইংরিজী দৈনিক আসতে লাগল। বেশ কিছুদিন বাদে যখন কেস শুরু হল, তখন গভর্নমেন্টের তরফের কৌনস্বল লংফোর্ড জেমস্ দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে কেসটি শুরু করলেন। সেই বক্তৃতায় আমাকে তিনি ‘সাংঘাতিক কমুনিষ্ট’ বলে জাহির করলেন আর বললেন যে, মানবেন্দ্রনাথ রায়, আমি—আমরা থার্ড ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ রাখবার কাজ করছি।

দেশে ফেরবার সংকল্প তখনকার মতো ত্যাগ করতে হল। অনিশ্চয়তার ঘোর অন্ধকারে তলিয়ে গেলুম। অসুস্থ শরীর ও অর্থাতাব—এই দুয়ের

তাড়নায় শরীর ও মন তখন ঝিমিয়ে রয়েছে। হঠাৎ একদিন শ্রীমতীর ফোন পেলুম। বার্লিন ইউনিভারসিটিতে পেডাগগি পড়বার জন্য শ্রীমতী বার্লিনে এসেছিল। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে শ্রীমতী কদাচিৎ আসত শান্তিনিকেতন থেকে গানের কিংবা অভিনয়ের দলের সঙ্গে। একবার আমার পিসীমা মীরাদেবী, তার মামা নরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীমতী আর আমি ‘পদ্মা’ বজরা করে বাংলার নদীপথে কয়েক দিন ঘুরেছিলুম। বার্লিনেই আমাদের আলাপ জমল। শ্রীমতীই আমাকে জোর করে জার্মানীর বিখ্যাত ব্ল্যাক ফরেস্টের সেন্ট ব্ল্যাজিয়েন শহরের স্ত্রানিটোরিয়ামে পাঠিয়ে দিলে। স্ত্রানিটোরিয়ামে একমাস চিকিৎসা করে আবার বার্লিনে ফিরে এলুম। আবার কাজ শুরু করলুম। এখানে-ওখানে বক্তৃতা তো চলছেই, তা ছাড়া ‘রেড হিন্দুস্থান’ নাম দিয়ে ইংরিজীতে এক পৃষ্ঠার একটি বুলেটিন বের করে বিতরণ করা শুরু করলুম। ইংলণ্ডেও এই কাগজটি পাঠিয়ে দিতুম। ‘ভারত’ নাম দিয়ে একটি পত্রিকা বের করত ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রেরা। ‘ভারত’ পত্রিকাতেও লেখা পাঠাতে লাগলুম বার্লিন থেকে।

একদিন বার্লিনের ‘হিন্দুস্থান হাউস’-এ বিখ্যাত জার্মান লেখক আর্থার হোলিচার-এর সঙ্গে আলাপ হল। ভারতবর্ষে তিনি এসেছিলেন ও সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বইও লিখেছিলেন। দীর্ঘকায় স্থূল-বপু গুহ্র-কেশ হোলিচার শুনলুম ‘হিন্দুস্থান হাউসে’ মাঝে মাঝে আসতেন আমাদের দেশের মশলা দেওয়া মাংসের কারী, ডাল আর ভাত থাওয়ার জন্যে। ‘হিন্দুস্থান হাউস’ ছিল বার্লিনের ভারতীয়দের মিলন-কেন্দ্র। উলাও স্ট্রাসে একটি বাড়ির একতলার দুটি ঘর নিয়ে এই রেস্টোরঁ শুরু করেছিল নলিনী গুপ্ত। পরে তার সঙ্গে এই রেস্টোরঁ চালাবার কাজে যোগ দেয় শোভান নামে একটি বাঙালী মুসলমান ছেলে। শোভান বার্লিনে ডাক্তারি পড়তে আসে। দেশে ফিরে এসে সে ডাক্তারি শুরু করে, কিন্তু মৃত্যু তাকে তলব করে নিয়ে যায় খুব শীঘ্রিই, বেশি দিন তাকে ডাক্তারি করতে দেয়নি। হিন্দুস্থান হাউসে শুধু রেস্টোরঁ চলত তা নয়, মাঝে মাঝে আমাদের রাজনৈতিক আলোচনার আসরও বসত। হোলিচার আমাকে চায়ের আমন্ত্রণ জানানলেন একদিন। সেদিন বিকেলে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন একা গুড়কিও ও তাঁর স্ত্রী লুসিয়ানার সঙ্গে। হোলিচার-এর সঙ্গে

একই ফ্ল্যাটে তাঁরা থাকতেন। একা ছিলেন, মহা পণ্ডিত লোক, জেরুজালেম-এর স্বপ্নে বিভোর এক পাগল। লুসিয়া বুদ্ধিমতী ও সহৃদয়, পাগল স্বামীটিকে সামলাতে তার বেশির ভাগ সময়ই কেটে যেত। এই জার্মান ইহুদী দম্পতির সঙ্গে গভীর বন্ধনে বাঁধা পড়েছিলুম আমি। কত সন্ধে যে ওদের ওখানে কাটিয়েছি! কমিউনিজ্‌ম, জিওনিজ্‌ম, সোভিয়েট রাশিয়া, ভারতবর্ষ, জার্মানির অবস্থা, নাৎসিজ্‌ম—কিছুই বাদ পড়ত না আমাদের সন্ধের আসরের আলোচনায়। শ্রীমতীকেও আলাপ করিয়ে দিয়েছিলুম এঁদের সঙ্গে। সেও এক-এক দিন সন্ধেবেলা আমাদের সন্ধের বৈঠকে হাজির থাকত। আমার মুখ থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার কথা শুনতে শুনতে একা ও লুসিয়া ঠিক করে ফেলল যে তাঁরা মস্কো ঘুরে আসবে। মস্কো থেকে যখন ওরা ফিরে এল তখন একার মুখ থেকে যা সব শুনতে লাগলুম তাতে সন্দেহ হতে লাগল যে আমি কমিউনিস্ট না একা কমিউনিস্ট! সে কি লালচে কথার ঝরনার ধারা ঝরতে লাগল একার মুখ থেকে! লুসিয়াকে বললুম, হল কী লুসিয়া? তোমার স্বামী যে একেবারে স্টালিনের চেলা বনে গেছে! আমি কমিউনিস্ট, আমার সঙ্গে তো তোমার স্বামীর সাংঘাতিক লড়াই বেধে যাবে? লুসিয়া হেসে আকুল, একা আর তুমি দুটি পাগল নিয়ে আমার প্রাণ অস্থির! ১৯৩১ সালে আমি ইতালী চলে যাই। ১৯৩৩ সালে প্যারিসে একা ও লুসিয়ার সঙ্গে আবার দেখা হল। ওরা বার্লিনের পাট গুটিয়ে চলে এসেছে প্যারিসে। প্যারিস থেকে আমেরিকায় চলে যাবে। লুসিয়ার ভাই ব্যারন ছিলেন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। হিটলারের জেলে আত্মহত্যা করে তিনি নির্ধাতনের হাত থেকে রেহাই পান। বুল্‌ভার রাস্পাই-এর ধারে একটি ছোট্ট কাফেতে লুসিয়া আর আমি বসেছিলুম সেদিন সকালে। লুসিয়া শোনাচ্ছিল জার্মানির সব খবর। অশ্রুসিক্ত তার মুখখানি এতকাল পরে আজও চোখের সামনে ভাসছে। সেই আমাদের শেষ দেখা। তারপর ওদের খবর একবার মাত্র পেয়েছিলুম আমেরিকা থেকে। থাকবার জগ্গে ঘর খুঁজছিলুম। লুসিয়া আমাকে তাদের ফ্ল্যাট থেকে খুবই কাছে তাদেরই রাস্তায় একটি ঘরের সন্ধান দিল। ঘরটি দেখে আমার পছন্দ হল। গৃহকর্তা মিসেস্‌ এল. জে. পার্ল। স্বামী ছিলেন ডাক্তার, অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। বৃদ্ধা আর তাঁর একমাত্র ছেলে রোডি

—এই তাঁর সংসার। মানসিক বিকারগ্রস্ত ছেলেদের স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করত রোডি। অল্প কিছুদিন এখানে থাকার পর আমি ইতালির টিরোল মেরানো শহরে চলে যাই এক স্ত্রীনাটোরিয়ামে চিকিৎসার জন্তে। টিরোলের এই এলাকাটি আগে ছিল অষ্ট্রিয়ার, ইতালি এটা জোর করে দখল করে নেয়। একদিন সন্ধ্যাবেলা স্ত্রীনাটোরিয়ামে এক ভদ্রলোক এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। নাম তাঁর গুমান্। নিজের পরিচয় দিলেন কবি বলে। খুশি হল মনটা, লোকটিকে দেখে আর তার কথাবার্তা শুনে মনে হল যে মনের মতো লোক পেয়েছি। যার মধ্যে ছিটেফোঁটা পাগলামি নেই, এমন মানুষকে দেখলে আকাশ, সূর্য, চাঁদ, তারা, পাহাড়, নদী—সবার মুখ শুকিয়ে যায়, আমি একজন নগণ্য যাত্রী এই পৃথিবীর পথে—আমার তো শুকবেই। গুমান্ তাঁর কবিতা পড়ে শোনালেন। চার লাইনের সব কবিতা, আরো দু লাইনে কমিয়ে আনলে জাপানী কবিতা হয়ে যেতে পারত। তবে জাপানী কবিতা স্বল্প কথা দিয়ে ছবি আঁকে। গুমান্-এর কবিতা ছবির বা রসের ধার ধারে না। কবিতার একটি শব্দের সঙ্গে তার পরবর্তী শব্দের কোনো ভাবগত সম্পর্ক নেই, প্রতিটি শব্দ স্বয়ংসম্পূর্ণ। এমন অভিনব কবিতা এর আগে কখনো শুনি নি। গুমান্ এক-একটি কবিতা পড়েন আর আত্মগরিমায় তাঁর মুখ হাসিতে ভরে ওঠে, চশমার পেছনে তাঁর চোখদুটি জল্জল্ করতে থাকে। সন্ধ্যাবেলাটা বেশ কাটছিল গুমান্কে নিয়ে। একদিন গুমান্ এসে বললেন যে মেরানোতে একটি জার্মান পরিবার—ব্যারন ফেগেসাক ও তাঁর স্ত্রী বাস করেন। সামনের পাহাড়ের উপর তাদের ভিলা। সেখানে কয়েকটি দিন কাটাবার জন্তে তাঁরা আমাকে বিশেষ করে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমার বার্লিনে ফিরে যাবার দিন ঘনিয়ে আসাছিল। তাই ঠিক করলুম, এই জার্মান পরিবারের গুথানে দু-তিন দিন কাটিয়ে গুথান থেকেই সোজা বার্লিনে ফিরে যাব।

দিন দুয়েক পরে একদিন বিকেলে ব্যারন ফেগেসাক তাঁর মোটর নিয়ে হাজির হলেন আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্তে। পাহাড়তলী ছেড়ে মোটর পাহাড়ে ওঠবার রাস্তা ধরল। রাস্তাটি পাহাড়ের গা দিয়ে একটি বিরাট সাপের মতো এঁকেবেঁকে উপরের দিকে উঠে গেছে। শহর থেকে মাইল দেড়েক দূরে পাহাড়ের উপরে ফেগেসাকদের বাড়ি

‘ভিলা রেজিনা’। সুন্দর বাড়িটি। বাড়িটির সামনে খানিকটা খোলা জায়গা। তার পরেই আঙুরের ক্ষেত আর নানা শাকসব্জীর ক্ষেত। পাহাড়ের ঢালু গায়েও এদের চাষের জমি। ব্যারন ফেগেসাক তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ব্যারন ভদ্রলোক হচ্ছেন লিথুয়েজিয়ার জার্মান বাসিন্দে। সেখানেই এঁদের জমিদারি ছিল। ব্যারনেস ছিলেন জার্মান বিখ্যাত মুন্স্‌হাউসন্ পরিবারের মেয়ে। মুন্স্‌হাউসন্ পরিবার জার্মানির অতি বনেদী বংশ। এই বংশের একজন কাহিনী লিখে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। জার্মানিতে ব্যারনেসের মা ছিলেন মার্কিনী মহিলা। তাই তিনি চোস্ত ইংরিজী বলতেন। ব্যারনও মোটামুটি ভালোই ইংরিজী বলতেন। এঁদের দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ড্রইংরুমে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আমাদের মজলিশ জমে উঠল। যে বাড়িতে জন্মেছিলুম সেই বাড়ির মালিকরা ছিলেন গল্লের আর মজলিশের শাহান-শা। তাই আমার রক্তের স্বাভাবিক প্রবণতাই হচ্ছে গল্লের দিকে। ড্রইংরুমের দেয়ালে দেখি মুসোলিনীর ছবি। ফেগেসাকদের ছোট ছেলেটিকে উপহার পাঠিয়েছেন মুসোলিনী। শুমান আমাকে আগেই বলে দিয়েছিলেন যে রাজনীতিতে কোনো অংশ এঁরা কখনো নেন না যদিও, কিন্তু মুসোলিনীর সমর্থন করেন। যখন এঁদের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা হল তখন বুঝলুম যে বেশির ভাগ লোকের মতো এঁরাও ইতালীয় ফ্যাসিজম্ ও মুসোলিনী সম্বন্ধে কিছু না জেনেই ভক্তির পাকে ডুবে গেছেন। জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কহীন ভক্তি যে যথার্থ ভক্তিই হয়, শুধু অজ্ঞানতা আর স্নেহ, তার প্রমাণ সারা জীবন ধরে পেয়ে আসছি।

চায়ের আসরে আর একজন জার্মান ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হল। ইনি গৃহকর্ত্রীর বহুদিনের বন্ধু, নাম ভেরোনিকা ওয়ালটার, সংসারের সব ভার ছিল তাঁর উপরে। পড়াশুনোর সখ ছিল। পরে আমি যখন এই পরিবারেরই একজন হয়ে গেলুম তখন ভেরোনিকা আর আমি ইতালির কবিদের কবিতা পড়তুম অবসরের সময়। আমার সন্তার রঙ গোপন করে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই রাত্রিরেব আহারের পর ড্রইংরুমে যখন এসে বসলুম তখন আমি এঁদের জানিয়ে দিলুম যে আমি কমিউনিস্ট, ফ্যাসিজমের ঘোর বিরোধী। অনেক রাত পর্যন্ত এই নিয়ে আমাদের মধ্যে আলাপ চলল।

কোনো তিক্ততা তো হয়ই নি, বরং আমার সহজ আত্মপরিচয় দান তাঁদের মুগ্ধ করেছিল। আমরা পরস্পরের কাছে সরে এসেছিলুম প্রথম দিনের পরিচয়েই। দিনের বেলায় পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে বেড়াই, ক্ষেতের মধ্যে ঘোরাঘুরি করি, রান্নাঘরে গিয়ে ভেরোনিকার রান্নার তোড়জোড় দেখি আর বুড়ো মাসীর জন্তে মাংস দিয়ে যে পোলেন্টা তৈরি হত তাতেও ভাগ বসাই। সন্ধ্যাবেলা ড্রইংরুম থেকে তাকিয়ে দেখি পাঁচশো ফিট নীচের মেরানো শহরের আলো জোনাকির মতো জ্বলছে। বাড়ির বড়ো ছেলে উইলি, পিয়ানো বাজানোর শখ তার, প্রায়ই ড্রইংরুমে পিয়ানোর টুং টাং ধ্বনি শুনি। আমার আবার পিয়ানো শোনবার ভারি শখ। দেশে থাকতে আমার এক আত্মীয়ের পিয়ানো বাজনা প্রায়ই শুনতুম। তার ফলে যুরোপীয় গৎ-এর সঙ্গে আমার বেশ কিছুটা পরিচয় ছিল। উইলিকে ফরমাস করি শোঁপা, লিটভস্, গ্রীগ—এই-সব সুরকারদের তৈরি গৎ বাজাতে। ও খুশি হলে বাজায় আর আমি আরো খুশি মনে শুনি। ছোটোছেলে গুইতো সারাদিন ঘুর ঘুর করত বাগানে। সুন্দর ছেলেটি অস্থিরতায় ভরা। মেয়ে নীধা—বয়স তখন তার ছ বছর হবে। নীল চোখ মাথায় সোনালি চুল, মুখে দুষ্টুমি মাখানো। আমাকে দেখবার ঔৎসুক্যের অন্ত নেই তার। এই তিনটিকে নিয়ে আমি মনের সুখে তিনটি দিন কাটিয়ে দিলুম ফেগেসাকদের ভিলায়।

ফেগেসাক-দম্পতি তাঁদের মনে ফ্যাসিজমের প্রতি অনুরাগের যে সৌধ রচনা করেছিলেন তার ভিত্তি এই তিন দিনেই আমি অনেকটা ধসিয়ে দিয়েছিলুম। এই তিন দিনেই আমরা এতটা কাছে সরে এসেছিলুম পরস্পরের যে নাম ধরে ডাকাটা আমাদের সহজেই এসে গিয়েছিল। বার্লিনে ফিরে যাবার দিন রোডি আর এ্যান্ট আমার কাছ থেকে ওদের ওখানে আবার আসব এই কথা নিয়ে ছাড়ল।

বার্লিনে ফিরে এসে মিসেস পার্লের ওখানে গেলুম, যে ঘরটিতে ছিলুম সেটি পাওয়া যায় কিনা খোঁজ নেবার জন্তে। শুনলুম ঘরটি ভাড়া হয়ে গেছে। গ্রেটে তাদের ফ্ল্যাটের কাছে একটি ঘর ঠিক করে দিল আমার জন্তে। বৈচিত্র্যহীন ধূসর দিনগুলো কেটে যেতে লাগল ঘোলাটে জলস্রোতের মতো। দেশে ফেরবার জন্তে মনটা খাঁচার পাখির মতো অস্থির হয়ে

আছে। দেশে ফিরে গিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলব এই স্বপ্নে মন ভরপুর।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের মোড়লদের প্রচুর বিরাগ অর্জন করেছিলুম তাঁদের হুকুমবরদার হতে রাজী না হয়ে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের যে নীতি সেটি সঠিক বলে মানতে আমি রাজী হই নি। তা ছাড়া যে পদ্ধতিতে তাঁরা ভারতবর্ষে কাজ চালাবেন স্থির করেছিলেন সেটিও যে ঠিক নয় সে কথাও আমি জানিয়ে দিয়েছিলুম তাঁদের। মস্কোয় থাকাকালীন স্টালিনবাদের যে রূপটি আমি দেখেছিলুম সেটিকে কমিউনিজম বলে আমি আদবেই গ্রহণ করতে পারি নি। এটিও আমার রুশীয় বন্ধুদের অজানা ছিল না। তা ছাড়া ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সব ভার ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির হাতে সঁপে দিয়েছিল কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল। এটিকেও আমি মারাত্মক ভুল বলে মনে করতুম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষকে তার গোলাম করে রেখেছে বলে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির হুকুমবরদারি করবে, এটা খুবই বেখাপ্পা ঠেকেছিলো আমার কাছে। আমার এই মনোভাবের মধ্যে গ্রাশনালিস্ট সংকীর্ণতার কোনো ঠাঁই ছিল না। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠতে পারবে না এ-বিষয়ে আমি নিঃসংশয় ছিলাম। কেতাহুরস্ত কমিউনিস্ট বুকনি আওড়ালেও ব্রিটিশ কমিউনিস্টদের কত কর্মক্ষমতা ও রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা তা ইংলণ্ডে এই দলের অবস্থা যার একটুও জানা ছিল সেই জানত মারফি পেজ আরনট্ গ্যালাজার রথেরোজ প্রভৃতি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির যে-সব নেতাদের সঙ্গে মস্কোয় আলাপ হয়েছিল তাঁদের বুদ্ধির তারিফ করবার কোনো কারণ খুঁজে পাই নি। অবিশ্রি স্টালিনের বিশ্বস্ত গোলাম হিসেবে তাঁদের যথেষ্ট নামডাক ছিল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এঁদের কতটুকু জানা ছিল, ভারতবাসীর মানসিক গঠনের সঙ্গে তার বিশেষ মানসিকতার সঙ্গে এঁদের কি পরিচিতি ছিল, যে এঁরা সেখানে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলবেন?

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের হুকুমগুলি ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের কাছে পৌঁছে দেবেন, শুধু এই ডাক পিয়নের কাজ ছাড়া তাঁদের দিয়ে আর কী কাজ করানো সম্ভব ছিল ভারতবর্ষে?

মস্কো থেকে বার্লিনে এসে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কর্মধারা সম্বন্ধে যতই ওয়াকিবহাল হতে লাগলুম ততই এই পার্টির স্টালিনপন্থী নেতাদের আকাট মূখ্যমির নমুনা দেখে তাজ্জব হয়ে গেলুম। হয়তো বা ভুল জেনেও তাঁরা এই পথ ধরে চলেছিলেন স্টালিনের মনস্ত্বষ্টি করবার জন্যে। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি টেল্‌মান্ মাঝারি বুদ্ধির মানুষ ছিলেন। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির দুজন বুদ্ধিমান নেতা—ব্রাউনার আর টাল্‌হাইমার—এঁরা পার্টির সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করায় এঁদের সরিয়ে দিয়ে মস্কোর প্রভুরা তাঁদের অতি অনুগত টেল্‌মানকে পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি-পদে বসিয়ে দিলেন। হান্স্‌ নয়মান্, রেমেল্‌, মুনসেন্‌বর্গ প্রভৃতি মস্কোর আজ্ঞাবাহীদের দিয়ে দলের সেন্ট্রাল কমিটি তৈরি হল। হান্স্‌ নয়মান্ অতি বুদ্ধিমান লোক, কিন্তু বুদ্ধি থাকলে হবে কি?—বিপ্লবীর চরিত্রের কোন গুণই তার মধ্যে ছিল না। চব্বিশ প্রহরব্যাপী স্টালিনের নামকীর্তন করেও শেষ পর্যন্ত তিনি রেহাই পান নি। হিটলার ক্ষমতায় আসার পর অন্য নেতাদের মতো নয়মান্‌ও জার্মানি ছেড়ে প্যারিস চলে যান। তখন স্টালিনের নীতিসম্বন্ধে তাঁর কোনো মোহ ছিল না। মন তখন তাঁর ভেঙে গেছে। স্টালিনের নীতির সমালোচনা করতে শুরু করেন। তাঁকে মস্কোয় আসতে তলব করা হয়। সেখানেই স্টালিনের অন্ধ ভক্ত স্টালিনের জল্পাদের হাতেই প্রাণ হারান।

জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির উপর মস্কোর নির্দেশ আসে যে সোশাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মেম্বরদের ফুস্‌লে বের করে নিয়ে আসতে হবে কমিউনিস্ট পার্টিতে। এর জন্যে যে প্লোগান তখন নির্ধারিত হল সেটি ছিল ‘তলা থেকে যুক্তফ্রন্ট’ গড়ে তোলবার নির্দেশ। তলা থেকে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলবার অর্থ হল যে সোশাল ডেমোক্র্যাটিক দলের সঙ্গে কমিউনিস্ট দলের কোনো যুক্তফ্রন্ট না করে, দলের সভ্যদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করা অর্থাৎ তাদের ফুস্‌লে বের করে আনবার চেষ্টা করা।

সেখানে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা আদবেই নেই কিম্বা খুবই অল্প আছে আর সংগঠনের প্রতি আনুগত্য-বোধ একেবারেই জাগে নি মনে, কিম্বা খুব কমই জেগেছে—সেখানে এই ফুসলোনের কৌশল কাজে আসতে পারে, যেমন ভারতবর্ষের রাজনীতিক জীবনে প্রায়ই এই

খেলা দেখা যায়—কিন্তু জার্মানির মতো দেশে যেখানে বহু বছর ধরে রাজনৈতিক দল ও শ্রেণী-সংগঠন গড়ে উঠেছে সেখানে এই ধরনের চেষ্টা ব্যর্থ তো হবেই উপরন্তু যে ফলের আশা করা হয়েছিল, ঠিক তার উল্টো ফল ফলবে। হলও তাই, সোশাল ডেমোক্র্যাটিক দলের নেতারা তাঁদের দলের লোকদের সাবধান করে দিলেন কমিউনিস্টদের এই দল ভাঙানোর চেষ্টা সম্বন্ধে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে কোনো রকম যুক্তফ্রন্ট করার সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব পূর্বের চেয়ে কঠোর ও অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল আর সোশাল ডেমোক্র্যাটিক দলের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সভ্যেরা কমিউনিস্টরা তাদের দল ভেঙে দেবার চেষ্টা করছে এই যথার্থ ধারণা করে আগের চেয়েও আরো অনেক বেশি কমিউনিস্ট-বিরোধী হয়ে দাঁড়াল।

‘ইউনাইটেড ফ্রন্ট ফ্রম বিলো’ অর্থাৎ একটি দলের সভ্যদের দল থেকে ভাঙিয়ে নেওয়ার নীতি অবলম্বন করে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি সোশাল ডেমোক্র্যাটিক দলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের যুক্তফ্রন্টের সব সম্ভাবনা নষ্ট করে দিল। অথচ নাৎসিজমকে ঠেকাবার জন্যে সে সময়ে এই যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি ছিল। এই যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে শুধু জার্মানির নয়, পৃথিবীর রাজনীতি অন্য রূপ নিত। স্টালিনের নীতির ফলে জার্মানিতে নাৎসিজম্ স্বযোগ পেল বিশেষ কোনো বাধা না পেয়ে এগিয়ে যাওয়ার।

মস্কোর হুকুমে আরো একটি মারাত্মক নীতি গ্রহণ করল এই সময়ে জার্মান কমিউনিস্টরা। নাৎসিজমের বেনো জলের হুকুর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল জার্মানির রাজনীতির গাঙে। হাইল্ হিটলার-এর বীভৎস ধ্বনিতে শহরের পথগুলি কম্পিত। হিটলারের ঝটিকা বাহিনীর গুণ্ডামি বেপরোয়া চলছে তখন। জার্মান পার্লামেন্ট রাইসটাগ্‌এ নাৎসি প্রতিনিধিদের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এই-রকম শোচনীয় যখন জার্মানির অবস্থা তখন জার্মানিকে বাঁচাতে হলে সোশাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি আর কমিউনিস্ট পার্টি—এই দুই দলের যুক্তফ্রন্ট ছাড়া আর অন্য কোনো উপায়ই ছিল না। জার্মানির শ্রমিক আন্দোলনের ও সোশালিস্ট বিপ্লবের এই ঘোর সংকটকালে মস্কো থেকে এক পরম বিশ্বয়কর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিকে মানতে বাধ্য করা হল। সেই সিদ্ধান্ত অমুখ্যায়ী সোশাল ডেমোক্র্যাটিকরাই হচ্ছে সোশালিজমের প্রধান শত্রু।

তাই রাইস টাগ্‌এ নাৎসি সদস্যদের সঙ্গে কমিউনিস্ট সদস্যরা একজোট হয়ে সোশাল ডেমোক্রেটদের হারিয়ে শেষ করে দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করবে।

শ্রমিক আন্দোলন ও সোশালিস্ট বিপ্লব—এই দুটিকেই মৃত্যুবাণ হানল স্টালিনের এই নির্দেশ। সোশালিস্টদের ও কমিউনিস্টদের মধ্যে বিরোধ চরম সীমায় পৌঁছল, নাৎসিদের রুখবার সব শক্তি হারিয়ে ফেলল জার্মান শ্রমিকদের সোশালিস্ট আন্দোলন। পরবর্তী কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হিটলারের সঙ্গে স্টালিনের হাত মেলানোর যে বীভৎস লীলা সারা পৃথিবীর জনসাধারণ দেখল তার রিহার্সাল আগেই হয়ে গিয়েছিল জার্মানিতে।

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিল নাৎসিরা। টিউটনিক জাতিগুলি, বিশেষ করে জার্মান জাতি পৃথিবী শাসন করবে এইটাই তো ইতিহাস-বিধাতার নির্দেশ! ভারতবর্ষে অশিক্ষিত অল্পসংখ্য লোকেরা স্বাধীন হলে তো পৃথিবীর অমঙ্গলই ঘটবে! তাই তাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রচেষ্টার প্রতি নাৎসিদের কোনো সহানুভূতি থাকতেই পারে না। তার পরিচয় শীঘ্রই পেয়ে গেলুম। একদিন বীরেন চট্টোপাধ্যায় ফোন করে জানালেন যে সেদিন সন্ধ্যাবেলা র‍্যাম্‌জে ম্যাকডোনাল্ডের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি রেনে স্মিথ্‌ বার্লিন যুনিভার্সিটিতে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন। আমাকে সেখানে যেতে হবে রেনে স্মিথকে প্রশ্ন করবার জন্তে। সন্ধ্যাবেলা বীরেন চট্টোপাধ্যায় আর আমি বক্তৃতা সভায় গিয়ে হাজির হলুম। হল ভর্তি লোক। ইংরিজী সাহিত্যের বিখ্যাত পণ্ডিত প্রফেসর ডোব্লার সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন। রেনে স্মিথ্‌ বক্তৃতা দিতে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে আমি দাঁড়িয়ে উঠে সভার সভাপতি মহাশয়কে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলুম যে বক্তার বক্তৃতা শেষ হলে আমি তাঁকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই, এই সুযোগ তিনি আমাকে দেবেন কিনা? প্রফেসর ডোব্লার বললেন যে সে সুযোগ নিশ্চয়ই দেওয়া হবে, আমি যেন অনর্থক বাধা না দিই বক্তাকে তাঁর বক্তৃতার সময়। সে-রকম কোনো অসৎ অভিপ্রায় আমার নেই সেটা তাঁকে জানিয়ে দিয়ে বসে পড়লুম।

রেনে স্মিথের বক্তৃতা শুরু হল। ভারতবাসীদের যে কতো মঙ্গলসাধন করেছে ব্রিটিশ শাসন তার লম্বা ফিরিস্তি তিনি দিয়ে চললেন অনেকক্ষণ

ধরে। তারপর আশ্বাস দিয়ে বললেন যে ভারতের কল্যাণ সাধনের আরো কিছু কাজ বাকী আছে করবার। সেগুলো শেষ করে ধীরে ধীরে শাসনের গুরু দায়িত্বের ভার সহিয়ে সহিয়ে ভারতবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে—তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে থেকেই ভারতবর্ষকে এই গুরুভার বহন করতে হবে। তা না হলে ভারতবর্ষের পক্ষে একান্তভাবে তার নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাওয়া কোনো মতেই সম্ভব হবে না। তা ছাড়া ইংরেজরা সরে গেলে, অন্য শক্তি এসে ভারতবর্ষকে গ্রাস করে বসবে।

এই অসহ্য বক্তৃতা চট্টোপাধ্যায় আর আমি চুপটি করে শুনছিলুম। বক্তৃতা শেষ হল। প্রফেসর ডোব্লার উঠে রেনে স্মিথকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাভঙ্গ করে দিলেন। আমি আর চট্টোপাধ্যায় একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। এরকম ব্যবহার যে একজন বিখ্যাত বিদগ্ধ পুরুষ করতে পারেন তা স্বপ্নতেও ভাবি নি। আমি দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করে বললুম, আমাকে প্রশ্ন করতে দেবেন আপনি কথা দিয়েছিলেন। কোনো উত্তর না দিয়েই ডোব্লার রেনে স্মিথকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আমি বক্তৃতা শুরু করলুম। ছাত্রেরা আমাকে ঘিরে ফেলল। যুনিভার্সিটির কর্মচারীরা এসে আমাকে বক্তৃতা বন্ধ করতে বললেন। বললুম, আপনারা একজন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীকে ভারতের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যে প্রচার করবার সব সুযোগ দেন আর একজন ভারতবাসীকে তার প্রতিবাদ করবার সুযোগ দেবেন না কেন? আপনাদের সভার প্রেসিডেন্ট মহাশয় তো আমাকে কথাই দিয়েছিলেন যে বক্তার বক্তৃতার পরে আমাকে প্রশ্ন করতে দেবেন। কে শোনে আমার কথা? অতিথির যে নিয়ম মেনে চলা উচিত সে নিয়মের মর্যাদা আমি ক্ষুণ্ণ করেছি—এই অদ্ভুত কথা আমাকে শুনিয়ে ছাত্রেরা আর কর্মচারীরা মিলে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিল। বুঝলুম নাৎসিজমের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রতি জার্মানদের অমুরাগে ও সহানুভূতিতে ভাঁটা পড়েছে।

রেনে স্মিথ-সৌম্যেন্দ্রনাথ সংবাদ কিন্তু এখানেই শেষ হয় নি। যুনিভার্সিটির বক্তৃতার পরে সেই সন্ধ্যাতেই রেনে স্মিথ-এর আর-একটি

বক্তৃতা ছিল ‘মানবীয় অধিকার রক্ষণের লীগ’-কর্তৃক আহূত সভায়। সেই সভায় গিয়ে হাজির হলুম আমি আর বীরেন চট্টোপাধ্যায়। এই লীগের পরিচালকদের সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। রেনে স্মিথের বক্তৃতার পরে আমাদের বলতে দিতে তাঁরা সহজেই রাজী হলেন। মাঝারি আয়তনের ঘরটি ভরে উঠলো জার্মান ও ভারতীয় শ্রোতায়। মিসেস গ্রাবিস্ দেখি এসে উপস্থিত হয়েছেন সেই সভায়। এই বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থক। তিনি ছিলেন আইরিশ, বিয়ে করেছিলেন একজন জার্মানকে। ডক্টর গ্রাবিস্ও দেখলুম এসেছেন।

ঘরে ঢুকে প্রথম সারিতে আমাকে দেখে রেনে স্মিথের মুখটি যে একেবারেই রঙ বদল করে নি তা সত্যের খাতিরে বলতে পারি নে। রেনে স্মিথ্ বক্তৃতার প্রথমেই অকারণে একটু কৈফিয়ৎ দিয়ে নিলেন—তিনি ব্রিটিশ অতএব ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনী কেটে বললুম—ব্রিটিশ হলেই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সব নোংরামির সাফাই গাইতে হবে এমন কোনো কথা আছে নাকি? বক্তৃতা কিছুক্ষণ চলেছে কিন্তু বক্তৃতা আর জমছে না কোনোমতেই। রেনে স্মিথের বক্তৃতা মিয়নো মুড়ির মতো বিস্বাদ হয়ে গেছে। হঠাৎ ঘরের মধ্যে থেকে মিসেস গ্রাবিসের কণ্ঠ শোনা গেল—ওহে যুবক, তুমি ব্রিটিশ করদাতাদের টাকার অপব্যয় করছ, ইংলণ্ডে ফিরে যাও। এর পরে যেটুকু লক্ষ্যবস্তুর করেছিলেন ভদ্রলোক, তাও শেষ হয়ে গেলো। আর কিছুক্ষণ কোনোমতে চালিয়ে বসে পড়লেন। সভাপতি মহাশয় আমাকে আহ্বান করলেন বক্তৃতা দেবার জন্তে। রেনে স্মিথ্ উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেন আমার সঙ্গে করমর্দন করবার জন্তে। তাঁর হাতে হাত না দিয়ে, মাথা হেলিয়ে তাঁর অভিবাদনকে স্বীকার করে নিয়ে বক্তৃতামঞ্চে উঠে গেলুম। রেনে স্মিথ্কে সম্বোধন করে বললুম যে, তাঁর কাছে আমার ব্যবহারের জন্য কৈফিয়ৎ দেবার আছে। তিনি যে হাত বাড়িয়েছিলেন সে হাতকে আমি স্বাগত করতে পারি নি আমার হাত দিয়ে, তার কারণ তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক, তাঁর হাতের মুঠোয় রয়েছে আমার দেশকে যে শিকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়েছে সেই শিকলের চাবি, যে বীভৎস অর্থনীতিক শোষণ চলছে ভারতবর্ষে তার

চালনার মূল ব্যবস্থা তাঁর হাত শত শত স্বাধীনতাকামীদের বুকের রক্তে রাঙা। তাই আপনার হাতে আমি হাত দিতে পারি নি।

মাথা নীচু করে রেনে স্থিথ বসে রইলেন। ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষের কী অবস্থা হয়েছে তার বর্ণনা করলুম আমার বক্তৃতায়। আমার বক্তৃতার পরে সরোজিনী নাইডুর ছেলে আমার পরলোকগত বন্ধু ডাক্তার জয়স্বরীয়া বক্তৃতা দিলেন। এমনি করেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। বুকের ভিতরটায় বিপ্লবের ধারণা ও ভাব মোঁমাছির মতো গুঞ্জনরত সেই গুঞ্জনকে রূপ দিলুম কতকগুলি কবিতায়। হাতে লিখে সেগুলি স্টেন্সিল করে ‘বিপ্লব-বৈশাখী’ নাম দিয়ে কবিতার বই বের করলুম এই সময়ে। লণ্ডনের বাঙালী ছাত্রদের কাছে পাঠিয়ে দিলুম। আমার বন্ধু নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের কাছ থেকে শুনোছি যে, তাঁরা অনেক সভায় এই কবিতাগুলি আবৃত্তি করেছেন লণ্ডনে। দেশে পৌঁছানোমাত্র গভর্নমেন্ট ‘সি কাষ্টমস্ অ্যাক্ট’ প্রয়োগ করে বইটিকে বাজেয়াপ্ত করল।

এই সময়ে ‘ইনটারন্যাশনাল’ গানটির মূল সুর এতটুকুও বদল না করে সেটি বাঙলায় অনুবাদ করেছিলুম। দু-একটি রুশীয় বিপ্লবের গান ও একটি জার্মান গান—এগুলিও তাদের মূল সুর বজায় রেখে অনুবাদ করেছিলুম। ‘ইনটারন্যাশনাল’ গানটির এই প্রথম বাঙলা অনুবাদ। এই গানটি ও জার্মান গানটি আমার দেশে ফিরে আসবার পরে কলকাতার বহু সভায় গাওয়া হয়েছে। আমি নিজেও এই সময়ে কতকগুলি গান রচনা করি বিপ্লবের ধারণার ও ভাবের উপর ভিত্তি করে। সেগুলিকে স্টেন্সিল করে ‘লাল নিশান’ নাম দিয়ে বের করেছিলুম বার্লিনে থাকার সময়। সেই গানের বইটিও ভারত গভর্নমেন্ট বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণা করে।

